ইসলাম পরিচয়

ডঃ মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ

ইসলাম পরিচয়

মূল

ড. মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ

অনুবাদ

মুহাম্মদ লুতফুল হক

আধুনিক প্রকাশনী

ঢাকা

প্রকাশনায়
এ. বি. এম. এ. খালেক মজুমদার
পরিচালক
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রকাশনী
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৭১৭৫১৮৪

আঃ প্রঃ ৩৪৫

২য় প্রকাশ (আধুঃ ১ম)

জিলকদ	১৪২৬
অগ্রহায়ণ	১৪১২
ডিসেম্বর	২০০৫

নির্ধারিত মূল্য ঃ ১০০.০০ টাকা

মুদ্রণে
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রেস
২৫ শিরিশদাস লেন,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ISLAM PARICHOY (Introduction To Islam) written by Dr. Muhammad Hamidullah in English. Translated by Muhammad Lutful Haque. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Fixed Price : Taka 100.00 Only.

মহা পরিচালকের কথা

ইসলাম বিশ্বমানবের জন্য মহান আল্লাহ তাআলার এক অপার আশীষ-অনন্ত করুণাধারা। বস্তুত কল্যাণময়, বরকতস্নিগ্ধ ইসলামের স্বর্ণ স্পর্শেই মানুষ লাভ করতে পারে সত্য-সঠিক পথের দিশা। পূর্ণতা ও সফলতার নির্ভুল দিক-নির্দেশনা। ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনের সুবিশাল পটভূমিকায় বিস্তৃত যে মানবজীবন, সে জীবনের প্রকৃত তাৎপর্য এবং মাহাত্ম ব্যঞ্জিত হয় মূলত পারস্পরিক অবিচ্ছিন্নতা ও ধারাবাহিকতার মধ্য দিয়েই এ কারণেই জীবন-উপলব্ধিতে একজন মুমিন ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনের সুষম সমন্বয়কেই উপলব্ধি করে থাকেন। বিশ্ব-মানবের পথনির্দেশনা হিসেবেই ইসলামের আগমন ঘটেছে। মানব-জীবনকে পূর্ণ সফল করে তুলে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে মানুষের করণীয় বা বর্জনীয় সম্পর্কে পুংখানুপুংখ বিধান দিয়েছে মানবধর্ম ইসলাম। এ পরিপূর্ণতা অর্জনের তাগিদ ও প্রয়োজনেই ইসলাম মানুষের আধ্যাত্মিক, বৈষয়িক তথা ইহলৌকিক-পারলৌকিক সকল বিষয়ের ওপরই আলোকসম্পাত করেছে। এ কারণেই ইসলাম এক পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান।

ইসলামের শাশ্বত আদর্শ, মর্মবাণী ও শিক্ষা প্রাঞ্জল ভাষায় বিধৃত হয়েছে বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ গবেষক ইসলামিক কালচারাল সেন্টার প্যারিস-এর ডঃ মুহাম্মাদ হামিদুল্লাহ রচিত Introduction to Islam গ্রন্থে। পৃথিবীর বেশ ক'টি ভাষায় অনূদিত এ মূল্যবান গ্রন্থটি 'ইসলাম পরিচয়' শিরোনামে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছেন জনাব মুহাম্মাদ লুতফুল হক। আশা রাখি, অনূদিত এ গ্রন্থে ইসলামের কল্যাণময় আদর্শের প্রচার-প্রসারে তাৎপর্যময় ভূমিকা পালন করে সত্যভ্রষ্ট মানুষকে আলোকোদ্ভাসিত করবে। এ গ্রন্থ পাঠে দ্বিধাগ্রস্ত মানুষ সবল সুদৃঢ় ঈমানের অধিকারী হতে শক্তি সঞ্চয় করবে। শুধু তাই নয়, যথার্থ মুমিনকেও তাঁর লক্ষে অবিচল থেকে পরম সাফল্যের পথে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণাকে বেগবান করবে।

আল্লাহ আমাদের এ প্রচেষ্টা কবুল করুন। আমীন।

প্রকাশকের কথা

ইসলাম বিশ্বমানবের জন্য আল্লাহর তরফ থেকে একমাত্র দীন এবং পরম কল্যাণময় পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। ইসলামের সুশীতল পরশে জ্ঞানান্ধ, পথভ্রষ্ট, সত্যবঞ্চিত মানব সমাজ পেয়েছে সত্যপথের দিশা। ভালোমন্দ, আলো অন্ধকার এবং সত্যাসত্যের পার্থক্যকারী এক আসমানী প্রজ্ঞা— কুরআন। তার চোখের সামনে থেকে ভ্রান্তির মোহজাল ছিন্ন হলো। এক অপার্থিব রৌশনীতে উদ্ভাসিত হলো তার অন্তর।

জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রকে সাফল্যের রশ্মিতে উদ্ভাসিত করেছে ইসলাম। ইহলৌকিক ও পারলৌকিক এ উভয় জীবনকে কামিয়াবীর মহিমায় উজ্জ্বল করতে আমরা সদা তৎপর থাকবো। আল্লাহর রহমতের স্রোতধারায় লীন হয়ে যাবো, এটাই ইসলামের শিক্ষা। শুধুমাত্র পারলৌকিক বিষয়ে ধর্মানুশীলন নয়, তার সাথে সফলতাপূর্ণ ও কল্যাণময় ইহলৌকিক জীবনকে সুসমন্বিত করতে পারলেই পূর্ণাঙ্গ ইসলামী জীবন নিশ্চিত হয়, আর এর মধ্য দিয়েই ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান কথাটির পরিপূর্ণ তাৎপর্য উদ্ভাসিত হয়।

বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, পণ্ডিত মুহাম্মাদ হামিদুল্লাহ উপরিউক্ত দৃষ্টিভঙ্গিতে রচনা করেছেন, Introduction to Islam বইটি। এ মূল্যবান বইটি ‘ইসলাম পরিচয়’ নাম দিয়ে বাংলা ভাষায় তরজমা করেছেন মুহাম্মাদ লুতফুল হক। মূল ইংরেজী গ্রন্থের সহজ-সরল ভাষাভঙ্গি ও প্রাঞ্জল উপস্থাপনা অনুবাদে অক্ষুণ্ন থাকার কারণে ‘ইসলাম পরিচয়’ সকল শ্রেণীর পাঠককে আকৃষ্ট করবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

আল্লাহ আমাদের এ নেক প্রচেষ্টা কবুল করুন। আমীন।

অনুবাদকের কথা

এটা আনন্দের কথা যে, ইসলাম সম্পর্কে লেখা প্রচুর বই এখন বাজারে পাওয়া যাচ্ছে। কতগুলো পুস্তক একান্তই বিষয়ভিত্তিক। এগুলোর মধ্যে রয়েছে কুরআন, হাদীস, ইতিহাস, খিলাফত, অর্থনীতি, জিহাদ, জীবনী। কোনো কোনো পুস্তকে আবার অনেকগুলো বিষয়কে একসাথে তুলে ধরা হয়েছে। কিন্তু যারা ইসলাম সম্পর্কে মোটামুটি একটি প্রাথমিক ধারণা পেতে চান, অথবা একটি পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা হিসেবে ইসলামকে সামগ্রিকভাবে বুঝতে চান, তাদের জন্য কোনো বই তেমন নজরে পড়ে না। বিদেশী ভাষায় অবশ্য কিছু পুস্তক রচিত হয়েছে। ইতোমধ্যে তা বাংলায়ও অনূদিত হয়েছে। কিন্তু সেগুলোতেও সামগ্রিকভাবে ইসলামকে তুলে ধরা হয়নি। এদিক থেকে ডঃ মুহাম্মাদ হামিদুল্লাহর লেখা "Introduction to Islam" গ্রন্থটিকে ব্যতিক্রম বলে মনে হয়েছে। এখানে ইসলামকে তুলে ধরা হয়েছে একটি সামগ্রিক জীবনব্যবস্থা হিসেবে। রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, বিচার ব্যবস্থা, ইসলামী সমাজে নারী, অমুসলিমদের অবস্থান, ঈমান-আকীদা, দৈনন্দিন জীবনের আচার-আচরণ প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয় বর্ণিত হয়েছে খুবই সুচারুরূপে। ইসলাম সম্পর্কে প্রাথমিক অথচ পরিপূর্ণ একটি ধারণা লাভের জন্য বইটি উপযোগী বলে মনে করি।

গ্রন্থটির অনুবাদ কাজে উৎসাহ যুগিয়েছেন অধ্যাপক ডঃ মোহাম্মদ এসহাক এবং অধ্যাপক আবদুল গফুর। পাণ্ডুলিপি সম্পাদনা করেছেন অধ্যাপক হাসান আবদুল কাইয়ুম। পাণ্ডুলিপি প্রণয়নে বিভিন্ন পর্যায়ে সহযোগিতা দিয়েছেন আমার সহকর্মী মাওলানা আবদুস সামাদ ও আবদুর রাজ্জাক। আমি তাঁদের কাছে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

এমন একটি গ্রন্থের অনুবাদ কাজে হাত দিতে পেরে আমি সত্যিকার অর্থেই আনন্দিত ও তৃপ্তিবোধ করছি। আমি এ গ্রন্থের রয়্যালিটির এক-পঞ্চমাংশ "খাদীজাতুল কুবরা সোসাইটি'তে ওয়াক্‌ফ করে দেয়ার মনস্থ করেছি। আল্লাহ পাক আমাদের এ শ্রমকে ইবাদাত হিসেবে কবুল করুন। আখিরাতের নাযাতের উসীলা হিসেবে গ্রহণ করুন—এ মোনাজাত করি ।

আমীন।

ভূমিকা

'ইসলাম পরিচয়' পুস্তকটি ইসলামিক কালচারাল সেন্টার (প্যারিস, ফ্রান্স)-এর উদ্যোগে রচিত ও প্রকাশিত। এটা খুবই আনন্দের কথা যে, দিনে দিনে বইটি বিভিন্ন মহলে বিশেষ আগ্রহ সৃষ্টি করেছে। ইতোমধ্যে এ সংস্থা থেকে ইংরেজী ভাষ্যে তিনটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। আমরা একথাও জানতে পেরেছি যে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে পুস্তকটির আরো চার পাঁচটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। তাছাড়া বিভিন্ন ভাষায় বইটির অনুবাদের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। আমাদের জানামতে কতগুলো অনুবাদ ইতোমধ্যে গ্রন্থের আকারে প্রকাশিত হয়েছে, বেশ কিছু অনুবাদ মুদ্রণের অপেক্ষায় আছে। পুস্তকটির বহুল প্রচারের জন্য আল্লাহ পাকের দরবারে হাজার শুকরিয়া জানাই।

আমাদের জন্য এটা খুবই আনন্দ ও গৌরবের কথা যে, বেশ কয়েকটি দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পুস্তকটি পাঠ্য বই হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

বইয়ের সংশোধন ও পরিমার্জনের জন্য সকল রকমের সমালোচনা এবং পরামর্শকে আমরা স্বাগত জানাই। যাঁরা এ ব্যাপারে সামান্যতম অবদান রাখবেন, আল্লাহ পাক তাঁদেরকে পূর্ণ বিনিময় দিন।—এ মুনাজাত করি।

প্যারিস ১৩৯৩ হি. /১৯৭৩

সম্পাদনা পরিষদের পক্ষে
মুহাম্মাদ হামিদুল্লাহ
সেন্টার কালচার ইসলামিক
৫৯, রু ক্লডি বারনার্ড,
এফ, ৭৫০০৫-প্যারিস, ফ্রান্স

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়
প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-১৭

দ্বিতীয় অধ্যায়
ইসলামের মৌলিক শিক্ষার সংরক্ষণ ব্যবস্থা-৪০

তৃতীয় অধ্যায়
ইসলামের দৃষ্টিতে মানব জীবন-৬৮

চতুর্থ অধ্যায়
ঈমান ও বিশ্বাস-৮৪

পঞ্চম অধ্যায়
অনুরক্ত জীবন ও অনুশীলন ঃ নামায রোযা-হজ্জ-যাকাত-১০৩

ষষ্ঠ অধ্যায়

আধ্যাত্মিক জীবন ঃ ইলমে তাসাউফ-১২৫

সপ্তম অধ্যায়

নৈতিকতা-১৪১

অষ্টম অধ্যায়

ইসলামে রাষ্ট্রনীতি-১৫৯

নবম অধ্যায়

বিচার ব্যবস্থা-১৭৮

দশম অধ্যায়

অর্থনৈতিক ব্যবস্থা-১৯৭

একাদশ অধ্যায়

মুসলিম নারী-২১২

দ্বাদশ অধ্যায়

ইসলামে অমুসলিমের মর্যাদা-২২৬

ত্রয়োদশ অধ্যায়

বিজ্ঞান ও শিল্পকলায় মুসলিমদের অবদান-২৩৯

চতুর্দশ অধ্যায়

ইসলামের সাধারণ ইতিহাস-২৬২

পঞ্চদশ অধ্যায়

একজন মুসলমানের দৈনন্দিন জীবন-২৮০

প্রথম অধ্যায়

প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ (স)

মানব জাতির ইতিহাসে যুগে যুগে এমন সব ক্ষণজন্মা ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটেছে যাঁরা অকাতরে নিজেদেরকে নিজ নিজ জনগণের সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কারে আত্মনিয়োগ করেছেন। আমরা তাঁদের দেখতে পাই প্রতিটি যুগে সব জনপদে। উদাহরণ হিসেবে ভারতের গৌতম বুদ্ধ, চীনের কনফুসিয়াস, ইরানের জরদস্তর নাম বলা যেতে পারে। তবে মানব ইতিহাসের সর্বাধিক খ্যাতিমান সংস্কারকগণের আবির্ভাব ঘটে ব্যাবিলন অঞ্চলে। তাঁদের মধ্যে হযরত ইবরাহীম (আ) অন্যতম। অন্যান্যদের মধ্যে রয়েছেন হযরত ইউনুস (আ), হযরত ইউসুফ (আ), নূহ (আ)। এরা সবাই ছিলেন আল্লাহর নবী ও রাসূল তবে বর্তমানে তাঁদের জীবন ও কর্ম সম্পর্কে খুব কমই জানা যায়। অনুরূপভাবে বনী ইসরাঈলে আবির্ভাব ঘটেছে বহু সংখ্যক নবী-রাসূল বা সংস্কারকের। এঁদের মধ্যে রয়েছেন হযরত মূসা (আ), হযরত দাউদ (আ), হযরত সুলাইমান (আ), হযরত ঈসা (আ) প্রমুখ। বনী ইসরাঈলের জন্য এঁরা যথার্থভাবেই গৌরবের ছিলেন।

এ প্রসঙ্গে দুটি বিষয় বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য ঃ

প্রথমত, এ সংস্কারকগণের প্রত্যেকেই সাধারণভাবে নিজেদেরকে আসমানী প্রেরণার বাহক দাবি করেছেন। তাঁরা স্বজাতির জন্য এক একটি পবিত্র গ্রন্থ বা আসমানী কিতাব রেখে গেছেন। সুন্দর সুখী জীবন পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা রয়েছে এ সমস্ত গ্রন্থে।

দ্বিতীয়ত, ধর্মপুরুষের তিরোধানের পরপরই সে অঞ্চলের জনগণ আত্মঘাতি সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে। কখনো বা সংঘটিত হয়েছে নির্মম গণহত্যা ও ধ্বংসকাণ্ড। ফলে সে সমস্ত বাণী কম-বেশি একেবারেই বিনষ্ট হয়ে গেছে। উদাহরণ হিসেবে হযরত ইবরাহীম (আ) প্রচারিত আসমানী কিতাবের উল্লেখ করা যেতে পারে। সে কিতাবের নাম জানা গেলেও তার বিষয়বস্তু সম্পর্কে এখন আর কিছু জানা যায় না। অনুরূপভাবে মূসা (আ)-এর উপর নাযিলকৃত কিতাবকে যে বার বার কেমন করে বিনষ্ট করা

হয় ইতিহাস তার সাক্ষ্য প্রদান করে। এ সমস্ত কিতাবের মূল পাঠ বহু পূর্বেই খোয়া গেছে। বর্তমানে যেটুকু মওজুদ রয়েছে তা ছিলো মূল কিতাবের অংশ বিশেষ মাত্র।

আল্লাহ সম্পর্কে ধারণা

কেউ যদি অতীতের পুরা নিদর্শনাদি বিচার-বিশ্লেষণ করে তাহলে তা থেকে তার সামনে এক মহা অদৃশ্য শক্তির ধারণা সমুজ্জল হয়ে উঠবে। মানুষ আদিকাল থেকে এক পরম সত্তা সম্পর্কে সচেতন। সে পরম সত্তা সমগ্র বিশ্বজগতের মালিক এবং খালিক, প্রভু ও সৃষ্টিকর্তা। সর্বকালের মানুষই মহান আল্লাহ বা স্রষ্টার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করেছে। অবশ্য পার্থক্য রয়েছে তাদের আনুগত্য প্রকাশের পদ্ধতি ও প্রকৃতিতে। আদিকাল থেকে মানুষ এ বিশ্বাসও পোষণ করেছে যে, সর্বশক্তিমান আল্লাহকে দেখা যায় না। কিন্তু তিনি সদা সর্বত্র বিরাজমান। তাঁর সাথে মানুষের সংযোগ স্থাপন করাও সম্ভব। অবশ্য যারতার পক্ষে এটা সম্ভব নয়। মানুষের মধ্যে যারা মহান ও আধ্যাত্মিক সাধনায় বলীয়ান কেবল মাত্র তাদের পক্ষে এটা সম্ভব। এ ধরনের লোকের সংখ্যাও কম। মানুষকে সঠিক পথ দেখানোই তাঁদের মূল উদ্দেশ্য। প্রধানত আসমানী প্রত্যাদেশ লাভের মাধ্যমে মহান স্রষ্টার সাথে এ সংযোগ স্থাপিত হয়। কখনো আবার আধ্যাত্মিক সাধনা বলে উন্নতির একটি স্তরে উপনীত হওয়ার মাধ্যমে এ সংযোগ স্থাপন করা যায়। তবে একথা সত্য যে, মত ও পথ যাই হোক না কেন, সকল জীবনাদর্শ ও পথনির্দেশনা সমপর্যায়ের নয়। সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনায় কোনো কোনো জীবনাদর্শকে অন্যান্য জীবন ব্যবস্থা অপেক্ষা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ও সফলকাম বলে প্রতীয়মান হবে।

প্রতিটি দার্শনিক মতবাদ তথা ধর্মবিশ্বাসের নিজস্ব কতকগুলো পরিভাষা রয়েছে। পরিভাষা হিসেবে শব্দগুলো কালক্রমে এমন তাৎপর্যপূর্ণ ও অর্থবহ হয়ে ওঠে যে, মূল শব্দের আক্ষরিক অর্থ থেকে তা বুঝা যায় না অথবা এ সমস্ত পরিভাষার অনুবাদও সম্ভব নয়। তবু একথা সত্য যে, কোনো ধর্ম বা মতাবলম্বীদেরকে অন্য ধর্ম সম্পর্কে ধারণা দেয়ার জন্য এ পরিভাষা অধ্যয়ন ছাড়া অন্য কোনো পথ নেই।

পঞ্চম শতাব্দীর শেষের দিকে হযরত ঈসা (আ)-এর জন্মের পর থেকে মানুষ বিভিন্ন অংগনে ব্যাপক অগ্রগতি সাধন করেছে। তৎকালীন সমাজেও এমন কতকগুলো ধর্ম ছিলো যেগুলোকে কেবলমাত্র বিশেষ কোনো জনগোষ্ঠী বা গোত্রের জন্য নির্ধারিত ছিলো। এ সমস্ত ধর্ম মতবাদের মধ্যে

বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সমস্যা সমাধানের কোনো ব্যবস্থাও ছিলো না। অবশ্য কিছু কিছু ধর্মকে সার্বজনীন বলে দাবি করা হতো। কিন্তু তাদের মূল কথা এই ছিলো যে, দুনিয়ার প্রতি মানুষের অনাসক্তি প্রদর্শন ও সকল প্রকার বন্ধন ছিন্ন করার মধ্যে রয়েছে মানুষের মুক্তি বা শান্তি। কিছু কিছু ছিলো কেবলমাত্র অভিজাত শ্রেণীর জন্য। এ সমস্ত ধর্মের অনুসারীর সংখ্যা ছিলো খুবই সামান্য।

বলাবাহুল্য যে, কোনো কোনো অঞ্চলে আদৌ কোনো ধর্ম ছিলো না, কোথাও নাস্তিক্যবাদ ও বস্তুবাদের প্রাধান্য ছিলো, কোথাও অন্যদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন না করে অথবা অন্যের অধিকার উপেক্ষা করে নিজের চিন্তা সম্পূর্ণভাবে অন্যের উপর চাপিয়ে দিয়ে নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করার নীতি চালু ছিলো—তা আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়।

আরব ভূমি

বিশ্বের মানচিত্রের দিকে তাকালে দেখা যাবে যে, এশিয়া, আফ্রিকা এবং ইউরোপ মহাদেশের সংযোগ স্থলে আরব উপদ্বীপ অবস্থিত। অধিকাংশ মরু অঞ্চল সমন্বয়ে গঠিত এই বিশাল আরব উপমহাদেশের বিভিন্ন স্থানে জনগণ স্থায়ীভাবে বসবাস করত। আবার অনেকেই ছিলো যাযাবর। ক্ষেত্র বিশেষে এমনো দেখা গেছে যে, একই গোত্রের একটি দল যখন স্থায়ীভাবে আবাসভূমি গড়ে তুলেছে, অন্যদলটি তখন বেছে নিয়েছে যাযাবর জীবন। তাদের জীবন প্রণালী ছিলো দ্বিমুখী। তবু তারা পারস্পরিক সম্পর্ক অতি যত্নের সাথে সংরক্ষণ করতো। মরুপ্রধান আরব অঞ্চলে জীবন ধারণ উপযোগী সম্পদের পরিমাণ ছিলো খুবই কম। মরু অঞ্চলের প্রাকৃতিক সীমাবদ্ধতার কারণেই এখানে কৃষি অথবা শিল্প কোনো গুরুত্ব পায়নি। বরং ব্যবসা বাণিজ্য ছিলো তাদের জীবিকার প্রধান অবলম্বন এবং অনিবার্য কারণেই তাদেরকে প্রচুর সফর করতে হতো। আরব উপদ্বীপের সীমানা ছাড়িয়ে তাদের ছুটে যেতে হতো সিরিয়া, মিসর, ইথিওপিয়া, ইরাক, সিন্ধু, ভারত এবং অন্যান্য দেশ দেশান্তরে।

মধ্য আরবের লিহ্য়ানীদের সম্পর্কে তেমন কোনো কিছু জানা যায় না তবে ইয়ামনকে যথার্থই বলা হতো আরবের ভাগ্য (Arabia Felix)। ইয়ামন প্রাচীন শেবা এবং মায়ন সভ্যতার লালন কেন্দ্র ছিলো আর তা ছিলো রোম নগরীর ভিত্তি স্থাপনের বহু পূর্বে।

মক্কা-তায়েফ এবং মদীনা মধ্য আরবে অবস্থিত। দেখতে একটা ত্রিভূজের মত। এ আল্লাহর এক অপূর্ব কুদরতী নিদর্শন। মানবেতিহাসে এ অঞ্চলটি

বিশেষ গুরুত্বের সাথে বিবেচনার দাবি রাখে। প্রকৃতিগতভাবে মক্কা মরুময় শুষ্ক অঞ্চলে অবস্থিত। এলাকাটি চাষাবাদের জন্য সম্পূর্ণরূপে অনুপযোগী। এদিক থেকে মক্কার সাথে মিল রয়েছে আফ্রিকা ও মরু সাহারার। মক্কা থেকে বড়জোর ৫০ মাইল দূরে অবস্থিত তায়েফের ভূ-প্রকৃতি ও আবহাওয়া ইউরোপের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। মক্কার উত্তরে মদীনা। এখানকার মাটি বেশ উর্বর। এশিয়া মহাদেশের উর্বর ভূমি হিসেবে খ্যাত সিরিয়ার সাথে এর তুলনা চলে। অন্য কথায় বলা যেতে পারে গোটা বিশ্বের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যাবলী অতি চমৎকারভাবে প্রতিফলিত হয়েছে ত্রিভুজাকৃতির এ ক্ষুদ্র অঞ্চলের মধ্যে। পৃথিবীতে এরূপ অঞ্চল দ্বিতীয়টি খুঁজে পাওয়া যাবে না।

মানব চরিত্র গঠনেও এমনি একটি ভূ-প্রকৃতি এবং আবহাওয়ার গুরুত্ব অপরিসীম। হযরত ইবরাহীম (আ)-এর উত্তরসূরি এবং দীন ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর জন্ম এ মক্কা নগরীতে এবং মদীনা ও তায়েফের অধিবাসীদের সাথে ছিলো তাঁর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার সম্পর্ক।

ধর্ম

আরবের বেশির ভাগ লোক ছিলো পৌত্তলিক। ইয়াহুদী, খৃস্টান, অগ্নি-উপাসক ইত্যাদি ধর্মমতে বিশ্বাসী অতি নগণ্য সংখ্যক লোক ছিলো। মক্কার লোকেরা পুতুল পূজারী হলেও তারা এক আল্লাহর ধারণা পোষণ করতো। তারা বিশ্বাস করতো যে, পুতুলের এমন ক্ষমতা আছে যার মাধ্যমে সে আল্লাহর সাথে বান্দার মধ্যস্থকারী হিসেবে কাজ করতে পারে। পুনরুত্থান দিবসে বা আখিরাতের উপর তাদের বিন্দুমাত্র আস্থা ছিলো না।

আল্লাহর হুকুমে হযরত ইবরাহীম (আ) কা'বা কেন্দ্রিক যে হজ্জ বিধান প্রবর্তন করেন তা থেকে তারা সরে এসে তাকে শির্‌ক-এর বেড়াজালে আবদ্ধ করে। আর এ অবস্থায় থাকে প্রায় দুই হাজার বছর। এখানে অনুষ্ঠিত হতে থাকে বাণিজ্যিক মেলা প্রদর্শনী আর উন্মত্ত পৌত্তলিকতার অনুষ্ঠান যা তাদের জন্য বয়ে আনেনি কোনো কল্যাণ বরং সামাজিক ও আধ্যাত্মিক উভয় ক্ষেত্রে তাদের জীবনে নেমে এসেছে ঘোর অমানিশা ও ধ্বংস।

সামাজিক অবস্থা

প্রাকৃতিক সম্পদের অভাব থাকা সত্ত্বেও মক্কা তায়েফ ও মদীনার চেয়ে অধিকতর উন্নত ছিলো। কেবলমাত্র মক্কাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিলো

নগর রাষ্ট্র যা শাসিত হতো ১০ জন শায়খ সমন্বয় গঠিত একটি পরিষদ দ্বারা। প্রত্যেকের দায়-দায়িত্ব ছিলো সুনির্দিষ্ট। পরিষদের সদস্যপদগুলোর মধ্যে ছিলো আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক মন্ত্রী, কা'বাঘরের তত্ত্বাবধায়ক, দৈববাণী বিষয়ক মন্ত্রী, পূজা অর্চনা বিষয়ক মন্ত্রী, বিচার-আচার ও ক্ষয়ক্ষতি নির্ধারণ বিষয়ক মন্ত্রী এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয় বা বিভাগের সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন বিষয়ক মন্ত্রী। আরেকজন মন্ত্রী যুদ্ধ ও সামরিক বিষয়াদি দেখাশুনা করতেন। যুদ্ধে নেতৃত্ব দেয়া এবং পতাকার হিফাজত করা ছিলো তার দায়িত্ব।

কাফেলা পরিচালনার ব্যাপারে মক্কাবাসী যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিলো। ফলে অনায়াসেই তারা রোমান, পারস্য, ইথিওপিয়া এবং পার্শ্ববর্তী অন্যান্য সাম্রাজ্যগুলোর সাথে বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন করতে সমর্থ হয়। চুক্তিভুক্ত দেশগুলোর সাথে আমদানী ও রফতানী চলতেন পুরোদমে। বাণিজ্য পথের আশেপাশের গোত্রগুলোর সাথে তারা সুসম্পর্কও গড়ে তোলে। এমন কি মক্কা অথবা তাদের মিত্র বলে পরিচিত গোত্রসমূহের মধ্য দিয়ে যখন কোনো বিদেশী কাফেলা যাতায়াত করতো তখন মক্কাবাসীরাই তাদের পাহারা ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতো।

সাধারণভাবে মক্কার লোকদের লেখাপড়ার প্রতি তেমন আগ্রহ ছিলো না। এমন কি তারা তাদের চিন্তাভাবনা, ধ্যান-ধারণা বা জরুরী তথ্যগুলো লিখে রাখত না। কিন্তু তাদের মধ্যে সাহিত্য, কবিতা, বক্তৃতা, গল্পবলা ও রচনার ব্যাপক প্রচলন ছিলো। বিধবা মহিলাদের দ্বিতীয় বিবাহের রেওয়াজ ছিলো। কন্যা সন্তানদের জীবন্ত কবরস্থ করার প্রথা প্রচলন ছিলো।

নবী করীম (স)-এর আবির্ভাব

এমনই একটি পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে ৫৭০ খৃস্টাব্দে হযরত মুহাম্মাদ (স) মক্কা নগরীতে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর জন্মের সপ্তাহ কয়েক পূর্বে পিতা আবদুল্লাহ ইন্তিকাল করেন। দাদা আবদুল মুত্তালিব তাঁর অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেন। তৎকালীন আরবের প্রচলিত প্রথা অনুসারে বেদুঈন দুধমাতা হালিমার উপর তাঁর লালন পালনের দায়িত্বভার ন্যস্ত করা হয়। মরুভূমিতে মা হালিমার গৃহে তিনি বেশ কয়েক বছর অতিবাহিত করেন। সকল জীবনী লেখকগণ উল্লেখ করেছেন যে, শিশু হযরত মুহাম্মাদ (স) মা হালিমার একটি মাত্র স্তন পান করতেন। অন্যটি রেখে দিতেন দুধ ভাইয়ের জন্য। হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর নানার বাড়ী ছিলো মদীনায়। পিতা আবদুল্লাহর কবরও ছিলো সেখানে। দুধ মাতা

হালিমার গৃহ থেকে নিজের বাড়ী মক্কায় ফিরে আসার কিছু দিন পর মা আমিনা তাঁকে নিয়ে মদীনায় যান। মদীনা থেকে ফিরতি পথে হঠাৎ করেই মা আমিনা ইন্তেকাল করেন। মক্কায় তখন তাঁর জন্য আরো একটি বিয়োগ বেদনা অপেক্ষা করছিলো। এ সময়ে প্রিয় দাদা আবদুল মুত্তালিবও ইয়াতীম মুহাম্মাদ (স)-কে ছেড়ে চির বিদায় নিলেন। অথচ এ সময়ে তাঁর বয়স ছিলো মাত্র আট বছর। চাচা আবু তালিব তখন তাঁর লালন-পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। স্বভাবগতভাবে আবু তালিব ছিলেন খুবই নম্র ও অমায়িক। কিন্তু আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে তাঁর পরিবারকে কষ্টের মধ্যে দিন গুজরান করতে হত।

কৈশোরেই প্রিয় নবী (স)-কে জীবিকার অন্বেষণে সচেষ্ট হতে হয়। শুরুতে তিনি প্রতিবেশীদের মেষ পালক হিসেবে কাজ করেন। অতপর মাত্র ১০বছর বয়সে চাচা আবু তালিবের সাথে সিরিয়া সফর করেন। এ সময়ে তিনি নিজেই একটি কাফেলা পরিচালনা করেন। বাণিজ্য উপলক্ষে আবু তালিব অন্য কোথাও সফর করেছেন কিনা তা জানা যায় না। তবে ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, মক্কায় তার একটি দোকান ছিলো। এটা খুবই স্বাভাবিক যে, হযরত মুহাম্মাদ (স) তাঁর চাচাকে বাণিজ্য পরিচালনায় সক্রিয়ভাবে সাহায্য করতেন।

হযরত মুহাম্মাদ (স) ২৫ বছর বয়সে উপনীত হয়েছেন। ইতিমধ্যে তিনি লেনদেন, নিষ্ঠা এবং সততার জন্য মক্কা নগরীতে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। তাঁর সততা ও নিষ্ঠায় মুগ্ধ হয়ে খাদীজা নাম্নী একজন বিধবা মহিলা তাঁর ব্যবসা দেখাশুনার কাজে মুহাম্মাদ (স)-কে নিয়োজিত করেন এবং পণ্য সামগ্রী বিক্রয়ের জন্য সিরিয়ায় পাঠান। ব্যবসায় প্রচুর মুনাফা অর্জিত হলো। তাঁর ব্যক্তিগত আচরণ ও স্বভাব চরিত্র দেখে খাদীজা বিমোহিত হলেন। অবশেষে তিনি তাঁর সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। অধিকাংশ ইতিহাসবেত্তার অভিমত অনুসারে এ সময়ে খাদীজার বয়স ছিলো ৪০ বছর। বলাবাহুল্য তাঁদের দাম্পত্য জীবন খুবই সুখের হয়েছিলো।

বাণিজ্য উপলক্ষে তিনি অনেক দেশ সফর করেন। এর মধ্যে রয়েছে ইয়ামন ও ওমান। ওমানের দাবামেলা ছিলো বিশাল। ইবনুল কাল্বি প্রদত্ত তথ্যে জানা যায়, পরবর্তীকালে তাঁকে কখনো দেখা যায় হুবাশা মেলায় (ইয়েমেন) আবার ইবনে হাম্বল (র) প্রদত্ত তথ্য অনুসারে একবার তাঁকে দেখা যায় আবদুল কায়স (বাহরায়ন-ওমান) দেশে। চীন, হিন্দুস্থান,

সিন্দু, পারস্য পূর্বসহ ও পশ্চিমাঞ্চলের অসংখ্য ব্যবসায়ী প্রতি বছর এখানে আসত। তারা আসত সমুদ্র পথে ও স্থল পথে। মক্কায় সাঈদ নামে তাঁর একজন ব্যবসায়ী অংশীদার ছিলো বলে জানা যায়। তিনি হযরত মুহাম্মাদ (স) সম্পর্কে বলেছেন যে, আমরা একে অপরকে খুবই বিশ্বাস করতাম। মুহাম্মাদ (স) যদি বাণিজ্য কাফেলা নিয়ে বিদেশ যেতেন তাহলে তিনি মক্কায় ফিরে এসে প্রথমে আমার সাথে হিসেব নিকেশ চূড়ান্ত করতেন। হিসেব ফায়সালা না করা অবধি তিনি নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন করতেন না। আবার আমি যদি বাণিজ্য কাফেলা নিয়ে বাইরে যেতাম, তাহলে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি আমার ভালো মন্দের খোঁজ খবর নিতেন। অথচ বাণিজ্যের হাল অবস্থা সম্পর্কে একটি কথাও আমাকে জিজ্ঞেস করতেন না।

হিলফুল ফুযুল

বিদেশী বণিকরা প্রায়ই বাণিজ্য সামগ্রী বেচাকেনার উদ্দেশ্যে মক্কায় আসত। একবার ইয়ামনের একটি কাফেলা ব্যবসার উদ্দেশ্যে মক্কায় আসে। তারা ছিলো যাবিদ গোত্রের লোক। তারা মক্কাবাসীদের নিকট বেশ কিছু মাল-সামানা বিক্রয় করে। যে কারণেই হোক পরবর্তীতে কিছু সংখ্যক মক্কাবাসী মূল্য পরিশোধ করতে অস্বীকৃতি জানায়। ব্যবসায়ীরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেও মূল্য আদায় করতে ব্যর্থ হয়। অনেক মক্কাবাসী আবার ব্যাপারটা জানতে পারলেও পাওনা আদায় করতে ব্যবসায়ীদের সাহায্য করলো না। কেউ কেউ আবার ব্যবসায়ীদের পক্ষে কথা বললেও কার্যত তাদের চেষ্টা বিফলে গেলো। অবশেষে বিরক্ত হয়ে ইয়ামনী ব্যবসায়ীরা মক্কাবাসীদের বিরুদ্ধে একটি অপমানসূচক কবিতা রচনা করে। প্রিয় নবী (স)-এর একজন চাচার নাম যুবায়ের। তিনি আযার গোত্রেরও প্রধান। বিদ্রূপাত্মক কবিতাটি শুনে তিনিও ভীষণ অনুতপ্ত হন। তৎক্ষণাৎ তিনি মক্কার অন্যান্য গোত্র প্রধানগণকে নিয়ে সভা ডাকলেন। অরাজক পরিস্থিতির মুকাবিলায় সবাই মিলে গঠন করলেন হিলফুল ফুযুল নামের একটি সংগঠন। যারা নির্যাতিত হবে তাদের সাহায্য করাই ছিলো এ সংগঠনের উদ্দেশ্য। কিশোর মুহাম্মাদ (স)-ও ছিলেন এ সংগঠনের একজন সক্রিয় সদস্য। পরিণত বয়সে তিনি এ প্রসঙ্গে বলতেন যে, আমি এ উদ্যোগে সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছি। একপাল উটের বিনিময়েও আমি এ সুযোগ পরিত্যাগ করতে প্রস্তুত নই। এমন কি আজো যদি অনুরূপ অংগীকারের জন্য আমাকে আহবান করা হয়, আমি তাতে নিশ্চয়ই হাজির হবো।

ধর্মীয় চেতনার উন্মেষ

৩৫ বছর বয়স পর্যন্ত নবী করীম (স)-এর ধর্মীয় আচার আচরণ সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। তবে এটা নিশ্চিত যে, তিনি জীবনে কোনো দিন পুতুল পূজায় অংশ নেননি। মুহাম্মাদ (স)-এর জীবনী লেখকগণের প্রত্যেকেই এ ব্যাপারে অভিন্ন মত ব্যক্ত করেছেন। প্রসংগক্রমে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, তৎকালীন সময়ে এমন কিছু লোক ছিলেন যাঁরা পুতুল পূজার বিরোধিতা করতেন। তাঁরা আল্লাহর ঘর কা'বার প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রদর্শন করতেন। তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে, ইবরাহীম (আ) কর্তৃক নির্মিত এই ঘর কেবলমাত্র আল্লাহরই উদ্দেশ্য নিবেদিত।

৬০৫ খৃস্টাব্দের কোনো এক সময়ে কা'বা ঘরে কিভাবে যেন আগুন লাগে। এর ফলে কা'বা ঘরের দেয়ালের প্রচুর ক্ষতি হয়। মুষলধারে বৃষ্টি নামলে সমস্যা প্রকট হয়ে দেখা দেয়। ফলে কা'বা ঘরের মেরামতের কাজে হাত দিতে হয়। সংস্কার কাজের জন্য প্রতিটি নাগরিক সাধ্যমত অর্থ যোগান দেয়। তাছাড়া হালাল উপায়ে অর্জিত সম্পদ থেকে অনুদান গ্রহণ করা হয়। মক্কার প্রতিটি লোক মেরামত কাজে অংশ নেন। নবী করীম (স)-ও কা'বাঘরের মেরামত কাজে শরীক হন এবং একবার পাথর বহন করতে গিয়ে কাঁধে আঘাত পান। কোন্ স্থান থেকে কা'বাঘর তাওয়াফ শুরু করতে হবে তা চিহ্নিত করে কা'বা ঘরের দেয়ালের কোণায় একটি কালো পাথর—যা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর যামানা থেকেই বসানো ছিলো।

কা'বা ঘর মেরামতের সময় কালো পাথরটি অন্যত্র সরিয়ে রাখা হয়। কা'বা ঘর মেরামতের কাজ শেষ হলে কালো পাথরটি যথাস্থানে পুনঃস্থাপনের পালা আসে। এ কাজটি ছিলো খুবই সম্মানের। মক্কার কোনো গোত্র এমন দুর্লভ সম্মান পরিত্যাগ করতে রাজী ছিলো না। এ নিয়ে শুরু হলো তুমুল বিবাদ। ক্রমান্বয়ে এ বিবাদ রক্তপাতের পর্যায়ে চলে যায়। অবশেষে এক ব্যক্তি এ ব্যাপারে ফায়সালার ভার তকদীরের উপর ছেড়ে দেয়ার পরামর্শ দিলেন। স্থির হলো, আগামীকাল প্রত্যুষে যে ব্যক্তি প্রথমে সেখানে পৌছবে সে পাথর পুনস্থাপনের ব্যাপারে যে ফায়সালা দেবে সবাই তা অকপটে মেনে নেবে। ঘটনাক্রমে নিত্যদিনের মত সেদিনও মুহাম্মাদ (স) কর্ম উপলক্ষে সেখানে পৌছেন। তাঁকে সবাই আল-আমীন (বিশ্বস্ত) নামে ডাকতো এবং এ নামেই তিনি মশহুর ছিলেন। সবাই তাঁর ফায়সালাকে মেনে নিলো। হযরত মুহাম্মাদ (স) একটি চাদর যমীনের উপর বিছালেন। পাথরটিকে অতি যত্নের সাথে চাদরের উপর রাখলেন অতপর মক্কার সমস্ত গোত্র প্রধানদেরকে চাদরটি ধরে যথাস্থানে নিয়ে

রাখতে বললেন। তাই করা হলো। নবী করীম (স) তখন চাদরের উপর থেকে পাথরটি নিজ হাতে তুলে নিয়ে দেয়ালের গায়ে যথাস্থানে স্থাপন করলেন। নবী করীম (স)-এর এ ব্যবস্থায় সবাই পরিতৃপ্ত হলো। এভাবেই রক্তক্ষয়ী বিবাদের মীমাংসা হলো।

এ ঘটনার পর থেকে মুহাম্মাদ (স) আধ্যাত্মিক সাধনায় অধিক পরিমাণে মনোযোগী হয়ে ওঠেন। রমযান মাসে তিনি চলে যেতেন জাবালুন নূরের একটি গুহায়। গুহাটির নাম গারে হেরা। গারে হেরা শব্দটির অর্থ গবেষণা গুহা। এখানে বসেই তিনি আল্লাহর দরবারে মুনাজাত করতেন এবং তাঁর ধ্যানে মগ্ন থাকতেন।

ওহী লাভ

এমনি ধ্যানমগ্নতার মধ্য দিয়ে চারটি বছর অতিবাহিত হলো। ৫ম বছরের রমযান মাসে তিনি হেরাগুহায় গভীর ধ্যানে মগ্ন। ফেরেশতা জিবরাঈল (আ) সেখানে উপস্থিত হলেন। ঘোষণা দিলেন যে, হে মুহাম্মাদ! আল্লাহ্ পাক আপনাকে রাসূল হিসেবে মনোনীত করেছেন। মানবজাতির প্রতি আপনি হবেন তাঁর বার্তাবাহক। অতপর ফেরেশতা তাকে অযু করার নিয়ম-কানুন শিখিয়ে দিলেন। মুহাম্মাদ (স)-কে আরো শিখিয়ে দিলেন আল্লাহর ইবাদাত বন্দেগী করার পদ্ধতি ও কলাকৌশল। তাঁর কাছে পৌঁছে দিলেন নিম্নবর্ণিত আল্লাহর কালাম ঃ

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝ اِقْرَاْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ ۝ الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ ۝

"পাঠ করো [হে নবী] তোমার রব-এর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট বাঁধা রক্তের এক পিণ্ড থেকে। পাঠ করো, আর তোমার রব মহামহিমান্বিত। যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন, মানুষকে এমন জ্ঞান দিয়েছেন যা সে জানতো না।"–সূরা আল আলাক ঃ ১-৫

হেরাগুহার এ ঘটনায় হযরত মুহাম্মাদ (স) ভীষণভাবে অভিভূত হলেন। তৎক্ষণাত তিনি বাড়ীতে ফিরে এলেন। বিবি খাদীজা (রা)-কে সমস্ত ঘটনা বললেন। বিবি খাদীজা (রা)-কে তিনি আরো বললেন, আমার ভয় হচ্ছে বুঝি এ কঠিন আঘাতে আমি শেষ হয়ে যাবো? বিবি খাদীজা (রা) এই বলে তাঁকে সান্ত্বনা দেন যে, "তিনি মানুষের সাথে সবসময় বিনয় ব্যবহার করেন। তিনি অসহায় দরিদ্র ইয়াতীম ও অভাবীদের

সাহায্য করেন। সুতরাং আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে সমস্ত মন্দ থেকে রক্ষা করবেন।"

পরবর্তী তিন বছর কোনো ওহী এলো না। এ দীর্ঘ বিরতির জন্য নবী করীম (স) দারুণ চিন্তা ও উদ্বেগের মধ্য দিয়ে দিন কাটাতে লাগলেন। ধীরে ধীরে তাঁর উদ্বেগের উপশম ঘটে। দীর্ঘ দিনের অপেক্ষা তাঁর আগ্রহকে তীব্রতর করে তোলে। ওহী লাভের জন্য তিনি অস্থির হয়ে পড়েন।

ইতিমধ্যে হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর উপর ওহী নাযিল হওয়ার খবর মক্কা নগরে ছড়িয়ে পড়ে। দীর্ঘদিন যাবত ওহী নাযিল না হওয়ার বিষয়েও তারা জানতে পারে। অমনি শহরের সন্দেহবাদী লোকেরা এ নিয়ে কানাঘুষা করতে থাকে। অনেকে তামাশা করতে থাকে। কেউ কেউ আবার খুবই নগ্নভাবে টিপ্পুনী কাটে। তারা এমন কথাও বলতে শুরু করে যে, আল্লাহ্ ওকে পরিত্যাগ করেছে।

এ সময়ে নবী করীম (স) আরো বেশি পরিমাণ ইবাদাত বন্দেগীতে মশগুল থাকেন। মুরাকাবায় কাটিয়ে দেন তিনটি বছর।

তিন বছর বিরতির পর হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর নিকট আবার ওহী আসতে শুরু করে। আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে এ ব্যাপারে নিশ্চিত করেন যে,

مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰى ○ وَلَلْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْاُوْلٰى ○ وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى ○ - الضحى : ٣-٥

"তোমার রব তোমাকে পরিত্যাগ করেননি এবং তোমার প্রতি বিরূপও হননি। তোমার জন্য পরবর্তী সময় পূর্ববর্তী সময় অপেক্ষা শ্রেয়। অচিরেই তোমার রব তোমাকে অনুগ্রহ দান করবেন আর তুমি সন্তুষ্ট হবে।"—সূরা আদ-দোহা ঃ ৩-৫

বস্তুতপক্ষে এ আয়াত নাযিল হয়েছিলো কাজ শুরু করার জন্য একটি নির্দেশ হিসেবে। অন্য এক ওহীর মাধ্যমে আল্লাহ্ তাআলা অনিষ্টকর কাজের ব্যাপারে মানুষকে সতর্ক করে দেয়ার নির্দেশ দেন। আল্লাহ্ এরশাদ করেন ঃ

قُمْ فَاَنْذِرْ ○ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ○ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ○ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ○ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ ○ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ○ - المدثر : ٢-٧

"উঠ, সতর্কবাণী প্রচার করো এবং তোমার রব-এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করো। তোমার পরিচ্ছদ পবিত্র রাখো, অবিপত্রতা হতে দূরে থাকো। অধিক পাওয়ার প্রত্যাশায় দান করো না এবং তোমার রব-এর উদ্দেশ্যে ধৈর্যধারণ করো।"–সূরা মুদ্দাস্‌সির ঃ ২-৭

আরেক ওহীর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা আত্মীয় স্বজন ও আপনজনদের সতর্ক করে দেয়ার জন্য হুকুম দেন এবং তাঁর উপর নির্দেশ আসে ঃ

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ ○ ـ الحجر : ٩٤

"অতএব তুমি যে বিষয়ে আদিষ্ট হয়েছো তা প্রকাশ্যে প্রচার করো এবং মুশরিকদের উপেক্ষা করো।"–সূরা আল হিজর ঃ ৯৪

ইসলাম প্রচার

নবী করীম (স) প্রথমে অতি সংগোপনে ঘনিষ্ঠদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছাতে থাকেন। এরপর তিনি নিজ গোত্রের আপনজনদের সত্যের পথের দাওয়াত দিতে থাকেন। শহর এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের জনসাধারণকে সবার শেষে ইসলামের পথে প্রকাশ্যে দাওয়াত দেন। তিনি এক অদ্বিতীয় আল্লাহ, আখিরাত এবং পুনরুত্থানের উপর বিশ্বাস আনার জন্য বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি পরোপকার ও বদান্যতার প্রতি সকলকে আহবান করেন।

গোটা কুরআন শরীফ এক সাথে নাযিল হয়নি। বিভিন্ন ঘটনায় প্রয়োজনে অল্প অল্প করে নাযিল হয়েছে। প্রিয়নবী (স) যখন যে অংশটুকু নাযিল হতো সে অংশটুকু সংরক্ষণের জন্য সাথে সাথে তা লিখে রাখার ব্যবস্থা করেন। একই সাথে তিনি সাহাবীদেরকে তা মুখস্থ করারও নির্দেশ দেন। আল্লাহর কালাম সংরক্ষণের ব্যাপারে এটা ছিলো একটা নিয়মিত ব্যবস্থা।

দিনে দিনে নবী করীম (স)-এর অনুসারীর সংখ্যা বাড়তে থাকে। বাড়তে থাকে ইসলামের বিরুদ্ধে বিরোধিতাও। বিশেষ করে পৌত্তলিকতার ভিত্তিমূলে আঘাত হানার সাথে সাথে এ বিরোধ তীব্রতর হতে থাকে। যারা বাপ-দাদার পৌত্তলিকতায় দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসী ছিলো তারা চরমভাবে ইসলামের বিরুদ্ধাচরণ করে। তারা মুসলমানদের ওপর নানা যুলুম নির্যাতন চালায় যা শারীরিক নির্যাতনে রূপ নেয়। তারা তপ্ত বালুরাশির ওপর মুসলমানদের শুইয়ে রাখে। হাতে, পায়ে, গায়ে গরম লোহার সেঁক দেয়। পায়ে শিকল পরিয়ে বন্দী করে রাখে। কাফির-মুশরিকদের

অমানুষিক নির্যাতনের ফলে কেউ কেউ শহীদ হন, তবু তাঁরা দীন ইসলাম ত্যাগ করেননি।

মুসলমানদের ওপর কাফির-মুশরিকদের নির্যাতনের তীব্রতা বৃদ্ধি পাওয়ার প্রেক্ষিতে প্রিয়নবী (স) সাহাবায়ে কেরামকে স্বদেশ ছেড়ে আবিসিনিয়ায় যাওয়ার পরামর্শ দেন। তিনি সবাইকে জানিয়ে দেন যে, আবিসিনিয়ার বাদশাহ খুবই ন্যায়পরায়ণ। সেখানে অন্যায়ভাবে কাউকে নির্যাতন করা হয় না। প্রিয়নবী (স)-এর অনুমতি নিয়ে বেশ কিছু মুসলিম অতি সংগোপনে আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। অনেকেই আবার তীব্র নির্যাতনের মধ্যেও প্রিয়নবী (স)-এর সাথে মক্কায় থেকে যান। মুসলমানদের দেশত্যাগের খবর শুনে কাফির-মুশরিকরা আরো মারমুখী হয়ে ওঠে। যে সমস্ত মুসলমান মক্কায় অবস্থান করছিলেন তাদের ওপর নির্যাতনের মাত্রা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে।

নবী করীম (স) ইসলামের দাওয়াত দেন। ইসলাম অর্থ আল্লাহর ইচ্ছার নিকট আত্মসমর্পণ। ইসলামের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো ঃ (ক) এখানে জাগতিক, আধ্যাত্মিক তথা দেহ ও আত্মার মধ্যে একটি সুন্দর সামঞ্জস্য বিধান করতে হয়। মানুষের কল্যাণের জন্য আল্লাহ তাআলা যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তা পুরোপুরিভাবে উপভোগ করা যায়। একই সময়ে প্রতিটি মানুষকে আল্লাহ তাআলার প্রতি তাঁর দায়িত্ব পালন করতে হয় যথাযথভাবে। এ দায়িত্বের মধ্যে রয়েছে সালাত কায়েম করা, যাকাত আদায় করা, সিয়াম পালন করা ইত্যাদি। ইসলাম সর্বসাধারণের জন্য আল্লাহ কর্তৃক মনোনীত একমাত্র জীবনব্যবস্থা। ইসলাম মুষ্টিমেয় লোকের জন্য নির্ধারিত নয়।

(খ) ইসলামের আহবান সার্বজনিন। ইসলামে সব মু'মিন মিলে একটি ভ্রাতৃ সমাজ। এখানে সবাই সমান। গোত্র, বংশ, বর্ণ অথবা ভাষাগত কারণে একজনের সাথে আরেকজনের কোনো তারতম্য বা ভেদাভেদ করা চলে না। ইসলামের দৃষ্টিতে যাঁর মধ্যে আল্লাহ ভীতি (তাকওয়া) যত বেশি, যিনি যত বেশি পরোপকারী, দানশীল, তাঁর মর্যাদাও তত বেশি। তিনি তত বেশি শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করতে পারেন।

সামাজিক অবরোধ

ইতিমধ্যে বেশ কিছু মুসলমান আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। এমনি এক সময়ে মুশরিক নেতারা নবীজীর গোত্র প্রধানের কাছে একটি আলটিমেটাম পাঠায়। আলটিমেটামে তারা দাবি করে যে—(ক)

মুহাম্মাদকে সমাজচ্যুত করতে হবে। (খ) সে সমাজের কোনো বিধান বা আইন কানুনের আশ্রয় নিতে পারবে না। (গ) মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার জন্য মুহাম্মাদকে মক্কায় শাসন পরিষদের কাছে হস্তান্তর করতে হবে কিন্তু নবী বংশের প্রতিটি লোক মুশরিকদের এ আলটিমেটামকে প্রত্যাখ্যান করল। এমন কি এ ব্যাপারে মুসলমান এবং নবী বংশের অমুসলমানরাও এক হয়ে গেলো। এ অবস্থার প্রেক্ষিতে মক্কার শাসন পরিষদ নবী বংশকে সম্পূর্ণরূপে বয়কট করার সিদ্ধান্ত নিলো। নারী-পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধ, অসুস্থ-রুগ্ন, দুঃস্থ-দুর্বল কাউকেই তারা রেহাই দিলো না। তারা স্থির করলো যে—(ক) মক্কার কোনো লোক নবী বংশের কারো সাথে কোনো কথা বলবে না। (খ) তাদের সাথে কোনো ব্যবসা বাণিজ্য বা বেচাকেনা করবে না। (গ) তাদের সাথে কেউ কোনো রকম বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করতে পারবে না।

মক্কার পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহে আরো কতোকগুলো গোত্র বসবাস করত। তাদের বলা হতো 'আহাবিশ'। বস্তুতপক্ষে তারা ছিলো মক্কাবাসীদের মিত্র। তারাও নবী বংশকে সামাজিকভাবে বয়কট করার ব্যাপারে সক্রিয়-ভাবে অংশ নিলো এবং শেবে আবু তালেব গিরিগুহায় অবরুদ্ধ করে রাখে।

কাফির-মুশরিকদের বয়কট প্রচেষ্টা সফল হলো। অল্প সময়ের মধ্যেই তাদের দুর্যোগ চরমে পৌঁছলো। অনেকে মারা গেলো। তবুও একটি লোকও প্রিয়নবী (স)-কে কাফির ও মুশরিকদের হাতে তুলে দিতে সম্মত হলো না। একমাত্র ব্যতিক্রম ঘটলো নবীজীর চাচা আবু লাহাবের ক্ষেত্রে। সে নবী বংশের সাথে সম্পর্ক ছেদ করে কাফের-মুশরিকদের সাথে যোগ দেয় এবং বয়কট কর্মসূচিতে সক্রিয়ভাবে অংশ নেয়। এমনি দুর্যোগের মধ্য দিয়ে তিনটি বছর অতিবাহিত হলো। অবশেষে মক্কার বিভিন্ন গোত্রের চার-পাঁচজন অমুসলিম যুবক নবী বংশকে এভাবে বয়কটের সমালোচনা করতে শুরু করে। তারা এ বয়কটকে অন্যায় অযৌক্তিক বলে প্রকাশ্যে ঘোষণা দেয়। একই সময়ে মক্কায় একটি বিস্ময়কর ঘটনা ঘটে। নবী বংশকে বয়কট করার ব্যাপারে মক্কায় বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে একটি চুক্তিপত্র তৈরী করা হয়েছিলো। চুক্তিপত্রটি রাখা হয়েছিলো কা'বা ঘরের দেয়ালে। হঠাৎ করেই দেখা গেলো যে, চুক্তিপত্রটি উঁইপোকায় খেয়ে ফেলেছে। কিন্তু চুক্তিপত্রের যে স্থানে মুহাম্মাদ এবং আল্লাহ লেখা আছে তা অক্ষত অবস্থায় রয়ে গেছে। যা হোক এরপর কাফির-মুশরিকরা বয়কট আদেশ প্রত্যাহার করে নেয়। নবী বংশের সবাই তখন মক্কায় প্রত্যাবর্তন করেন।

প্রিয়নবী (স)-এর দুর্যোগ তবু শেষ হয় না। এর অনতিকালের মধ্যেই তাঁর স্ত্রী খাদীজা এবং চাচা আবু তালিব ইন্তিকাল করেন। আবু তালিবের ইন্তিকালের পর চাচা আবু লাহাব গোত্রের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। এ আবু লাহাব ছিলো ইসলামের ঘোর শত্রু।

মি'রাজ

নবী করীম (স)-এর মি'রাজ এবং আল্লাহ জাল্লাশানুহুর সাথে তাঁর সাক্ষাতের কথা জানার পর হতেই মক্কার কাফির -মুশরিকরা ভীষণ রকমের মারমুখী হয়ে ওঠে। অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে, অন্যত্র নিরাপদ আশ্রয়ের প্রত্যাশায় তিনি স্বদেশ ছাড়তে বাধ্য হন। তায়েফবাসীদের সাথে তাঁর আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিলো। তিনি চলে গেলেন তায়েফে। কিন্তু তায়েফের লোকেরা তাঁর কথাতো শুনলোই না বরং নরপিশাচেরা তাঁকে পাথর মেরে মেরে রক্তাক্ত করলো। অসংখ্য প্রস্তরাঘাত পবিত্র দেহে ধারণ করে তিনি আবার ফিরে এলেন মক্কায়।

হিজরত

প্রতি বছর হজ্জ মৌসুমে আরবের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মক্কায় প্রচুর লোকের সমাগম হতো। নবী করীম (স) ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন গোত্রের লোকদের সাথে দেখা করেন। তিনি নিরাপদ আশ্রয় প্রদানের জন্য এবং ইসলামের দাওয়াত কাজে সহায়তার জন্য তাদেরকে রাজী করতে চেষ্টা করেন। তিনি এক নাগাড়ে ৯৫টি গোত্রের লোকদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করেন। কিন্তু প্রত্যেকে অত্যন্ত নিষ্ঠুরতার সাথে তাঁকে প্রত্যাখ্যান করে। তবু তিনি হতাশ হননি। অবশেষে মদীনার জন ছয়েক লোকের একটি দলের সাথে তাঁর কথা হলো। ইহুদী ও খৃস্টানদের নিকট প্রতিবেশী হওয়ায় নবী-রাসূল ও আল্লাহর ওহী সম্পর্কে তাদের মোটামুটি একটা ধারণা ছিলো। তারা এটাও জানতো যে, আহলে কিতাব (ইয়াহুদী ও খৃস্টান) আরেকজন নবীর আগমনের অপেক্ষায় আছে এবং তিনি হবেন সর্বশেষ রাসূল। মদীনাবাসীরা অন্যান্যদের ওপর প্রাধান্য লাভের ক্ষেত্রে এটাকে একটা চমৎকার সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করলেন। তাঁরা এ সুযোগ হাতছাড়া না করার ব্যাপারে ওয়াদা করলেন। পরের বছর আরো ১২জন মদীনাবাসী মক্কায় আসেন এবং নবীজীর আনুগত্য মেনে নেন। তাঁরা একজন ধর্মীয় শিক্ষককে মদীনায় প্রেরণের জন্য আবেদন জানালেন। নবীজী দা'য়ী হিসেবে মুসআব (রা)-কে পাঠিয়ে দিলেন মদীনায়।

মুসআব (রা)-এর প্রচেষ্টা সফল হলো। পরের বছর তিনি ৮৩জন নওমুসলিম নিয়ে মক্কায় আসেন। তাঁরা নবীজীকে মদীনায় দাওয়াত দেন এবং মক্কার মুসলমানগণকে মদীনায় হিজরত করার জন্য অনুরোধ করেন। তাঁরা এমন ওয়াদাও করেন যে, তাঁরা প্রিয়নবী (স) ও মক্কার মুসলমানগণের সাথে আপনজনের মতো ব্যবহার করবেন এবং তাঁদের নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা নেবেন।

এরপর থেকে মক্কার মুসলমানগণ ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে অতি সংগোপনে মদীনায় হিজরত করতে শুরু করেন। এ খবর জানতে পেরে মক্কার কাফির-মুশরিকরা তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলো। হিজরতকারীদের স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত সম্পদ বাজেয়াপ্ত করলো। এমন কি এক পর্যায়ে তারা নবীজীকে হত্যা করার নীল-নকশাও তৈরী করল। এমতাবস্থায় প্রিয়নবী (স)-এর নিজ গৃহে অবস্থান করাটাও অসম্ভব হয়ে পড়লো।

এখানে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, প্রিয়নবী (স) প্রচারিত দীন ইসলামের প্রতি কাফির-মুশরিকদের প্রচণ্ড রকমের শত্রুভাবাপন্ন হলেও তাঁর সততার প্রতি তাদের অবিচল আস্থা ছিলো। তাদের অনেকে মূল্যবান জিনিসপত্র প্রিয় নবী (স)-এর কাছে আমানত রাখতো। নিজ গৃহে অবস্থান করাটা ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় নবী করীম (স) সমস্ত গচ্ছিত আমানত হযরত আলী (রা)-এর নিকট হস্তান্তর করেন এবং যথাসময়ে প্রকৃত মালিকের নিকট গচ্ছিত আমানত ফেরত দেয়ার জন্য তাঁকে নির্দেশ দিলেন। অতপর তিনি বিশ্বস্ত সাহাবী হযরত আবু বকর (রা)-কে সাথে নিয়ে অতি সংগোপনে মদীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। অবশেষে তিনি নিরাপদে মদীনায় পৌছলেন। এটা ছিলো ৬২২ খৃস্টাব্দে এবং এ বছর থেকে হিসেব করেই হিজরী সন শুরু হয়।

সমাজ পুনর্গঠন ব্যবস্থা

স্বদেশত্যাগী মুহাজিরদের পুনর্বাসনের সুবিধার্থে নবী করীম (স) মুহাজিরদের সাথে মদীনায় সচ্ছল ব্যক্তিদের একটি ভ্রাতৃ সম্পর্ক গড়ে তোলেন। ভ্রাতৃবন্ধনে আবদ্ধ সাহাবায়ে কেরাম জীবিকার অন্বেষণে মিলেমিশে কাজ করেন। দৈনন্দিন জীবনে একজন অপরজনকে সাধ্যমত সাহায্য করেন।

নবী করীম (স) আরো অনুভব করলেন যে, মানুষের সামগ্রিক উন্নতির জন্য রাজনীতির সাথে ধর্মীয় আচার-আচরণ ও বিধি-বিধানসমূহের নিগূঢ়

সংযোগ থাকা আবশ্যক। এ উদ্দেশ্যে তিনি মদীনায় বসবাসরত জনসাধারণকে নিয়ে একটি সভা আহবান করেন। এ আহবানে মুসলমান, ইহুদী, খৃস্টান এবং অন্যান্য গোত্রের ধর্মের লোকেরা সাড়া দেয়। সভায় মদীনায় একটি নগর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সকলের সম্মতিক্রমে নগর রাষ্ট্রের জন্য একটি সংবিধান প্রণয়ন করা হয়। এটাই পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম লিখিত সংবিধান। সংবিধানে জনগণ ও রাষ্ট্রপ্রধানের অধিকার ও কর্তব্যকে সুস্পষ্টভাবে নির্ধারণ করা হলো। হযরত মুহাম্মাদ (স)-কে সবাই রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে গ্রহণ করলো। ব্যক্তি বিশেষের তত্ত্বাবধানে বিচার-আচার আয়োজনের যে প্রথা প্রচলিত ছিলো তা বিলোপ করা হলো। বিচার ব্যবস্থাকে স্থানান্তর করা হলো কেন্দ্রীয় প্রশাসনের অধীন। দেশের পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা নীতি কি হবে সংবিধানে তারও উল্লেখ করা হলো। সামাজিক নিরাপত্তার বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত করা হলো। যাদের দায়-দায়িত্ব ও পিছু টান বেশি তাদের জন্য এটা প্রযোজ্য ছিলো।

সংবিধান অনুসারেই নবী করীম (স)-কে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ক্ষমতা প্রদান করা হয়। কোনো বিষয়ে কোনো মতবিরোধ দেখা দিলে রাষ্ট্রপ্রধানের রায়কে চূড়ান্ত বলে ধরে নেয়া হয়। পার্থিবজগতের সকল ক্ষেত্রে মুসলমানদের সাথে ইহুদী-খৃস্টান ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের সমান সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হয়। পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রদান করা হয়।

হযরত মুহাম্মাদ (স) পার্শ্ববর্তী গোত্রসমূহের সাথে মৈত্রী ও পারস্পরিক সহযোগিতা চুক্তি সম্পাদন করার লক্ষে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন এলাকা সফর করেন। মক্কার কাফির-মুশরিকরা তখনো মুসলমানদের ওপর নির্যাতন চালাচ্ছিলো। বাজেয়াপ্ত করছিলো হিজরত করে মক্কা থেকে মদীনায় চলে আসা মুসলমানদের সমস্ত বিষয় সম্পদ। নবী করীম (স) অন্যান্য গোত্রের সহযোগিতায় কাফির-মুশরিকদের দ্বারা মদীনার আশেপাশে নাশকাতমূলক কাজ প্রতিরোধের ব্যবস্থা নেন। এর ফলে মক্কায় কাফির-মুশরিকরা মুসলমানদের ওপর আরো ক্ষেপে যায় এবং রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের সূত্রপাত ঘটে।

স্মরণ রাখতে হবে যে, মুসলমানদের বৈষয়িক পরিকল্পনা এবং কর্মব্যস্ততার কারণে তাদের ইবাদাত বন্দেগী ও আধ্যাত্মিক বিন্দুমাত্র ভাটা পড়েনি। বরং মদীনায় হিজরত করার বছর খানেকের মধ্যে আধ্যাত্মিক সাধনায় একটি কঠোর বিধান জারী করা হয়। প্রত্যেক বয়স্ক নর-নারীর জন্য রমযান মাসে রোযা রাখা ফরয ঘোষিত হয়।

অসহিষ্ণুতা ও অবিশ্বাসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম

মক্কার কাফির-মুশরিকরা মুসলমানদের দেশ ছাড়া করেই ক্ষান্ত হলো না। তারা মদীনাবাসীদেরকে কড়া হুমকী প্রদান করলো। তারা বলে পাঠালো যে, মুহাম্মাদ এবং তাঁর সংগী সাথীদেরকে আমাদের হাতে সোপর্দ কর। যদি তা না কর তাহলে অন্তত মদীনা থেকে উৎখাত কর। কিন্তু তাদের সমস্ত প্রচেষ্টা বিফলে গেলো।

মক্কার কাফির-মুশরিকরা এবার তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলো। মুসলমানদের নির্মূল করার লক্ষে তারা হিজরী দ্বিতীয় সনে একটি শক্তিশালী বাহিনী প্রেরণ করলো। নবী করীম (স) ৩১৩ জন বীর মুজাহিদ নিয়ে বদরের প্রান্তরে তাদের বাধা দিলেন। প্রায় তিনগুণ শক্তি নিয়েও তারা মুসলমানদের সামনে টিকতে পারলো না। পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে তারা স্বদেশে প্রত্যবর্তন করলো।

বদর যুদ্ধের পরাজয়ের গ্লানি তাদের অন্তরে দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে। উপযুক্ত প্রতিশোধ নেয়ার আশায় তারা বছর খানেক ব্যাপক প্রস্তুতি নেয়। অবশেষে হিজরী তৃতীয় সনে তারা মদীনা অবরোধ করে। এ সময়ে তাদের সৈন্যসংখ্যা ছিলো মুসলমানদের চারগুণ। উহুদের প্রান্তরে উভয় বাহিনী রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। কিন্তু মুশরিক বাহিনী যুদ্ধে বেশি ঝুঁকি নিতে অথবা তাদের অবস্থানকে বিপদ সংকুল করতে চাইলো না। তারা যুদ্ধের ময়দান থেকে সরে দাঁড়ালো। যুদ্ধটি সিদ্ধান্তহীন অবস্থায় শেষ হলো।

ইতিমধ্যে মদীনার ইয়াহুদী সম্প্রদায় মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে শুরু করে। তারা কাফির-মুশরিকদের সাধ্যমত উস্কানী দেয়। বদর যুদ্ধে মুসলমানদের ঐতিহাসিক বিজয়ের সময় কা'ব ইবনে আশরাফ নামে এক ইয়াহুদী সর্দার মক্কা যায়। বদর যুদ্ধের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য সে কাফির-মুশরিকদের উত্তেজিত করে এবং এ ব্যাপারে তার তরফ থেকে সবরকম সহযোগিতা প্রদানের নিশ্চয়তা দেয়। উহুদের যুদ্ধের পর কা'ব ইবনে আশরাফ এবং তার সম্প্রদায় হযরত মুহাম্মাদ (স)-কে হত্যা করার নীল নকশা তৈরি করে। তারা মাত্র দু'তিন জন সংগী-সাথীসহ নবীজীকে তাদের মহল্লায় যাওয়ার জন্য অনুরোধ করে। বলে দেয় যে, সেখানে তাদের ধর্মনেতা রাবীদের সাথে কতকগুলো বিষয়ে আলোচনা হবে। যদি রাবীদের বশে আনা যায় তাহলে গোত্রের সবাই ইসলাম গ্রহণ করবে।

কা'ব ইবনে আশরাফ গোত্রে একজন আরব মহিলা বাস করত। ঘটনাক্রমে সেও এ ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পারে। অমনি সে হত্যার নীল-নকশার কথা অতি সংগোপনে নবীজীকে জানিয়ে দেয়। এভাবেই ইয়াহূদী সম্প্রদায়ের ষড়যন্ত্র বিফলে যায়।

এতবড় ষড়যন্ত্র করা সত্ত্বেও নবী করীম (স) তাদেরকে বড় রকমের কোনো শাস্তি না দিয়ে সদল বলে মদীনা ছেড়ে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। তাদেরকে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়, মুসলমানদেরকে পাওনা ঋণ আদায় এবং সাধ্যমত অস্থাবর সম্পত্তি সাথে নেয়ার অনুমতি দিলেন। অবশেষে অন্যত্র গিয়ে তারা নতুন বসতি স্থাপন করলো। কিন্তু যে প্রত্যাশায় নবী করীম (স) ইহুদীদের প্রতি এতখানি সহৃদয় আচরণ দেখিয়েছিলেন বাস্তবে তার ফল দাঁড়ায় সম্পূর্ণ উল্টো। নতুন উদ্যোমে তারা মক্কাবাসীদের সাথে যোগাযোগ করলো। সংযোগ স্থাপন করলো মদীনার উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলের অমুসলিম গোত্রগুলোর সাথে। শুরু হলো সামরিক তৎপরতা। উহুদের ময়দানে কাফির-মুশরিকরা যে শক্তি নিয়ে এসেছিলো, তার চেয়ে চারগুণ বেশি শক্তি নিয়ে তারা মদীনা অবরোধের জন্য ছুটে এলো। মুসলমানদের বিরুদ্ধে এটা ছিলো কাফির-মুশরিকদের একটি চরম আঘাত। মুসলমানরাও অবরোধের মুকাবিলায় তৈরী হলেন। মদীনার চারপাশে খনন করলেন একটি বিশাল পরিখা। অথচ তখনো মদীনায় অনেক স্বপক্ষত্যাগী ইয়াহূদী বসবাস করত। শত্রুপক্ষের অমুসলিম গোত্রগুলো একে একে মৈত্রিচুক্তি থেকে নিজেদের প্রত্যাহার করে নিলো।

এ সময়ে মদপান, জুয়া এবং লটারী মুসলমানদের জন্য হারাম ঘোষিত হয়।

মহাবিজয়

নবী করীম (স) আবারো মক্কার কাফির মুশরিকদের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার উদ্যোগ নিলেন এবং পবিত্র হজ্জ উপলক্ষে মক্কার দিকে রওনা হলেন। মক্কার অদূরে হুদাইবিয়া নামক স্থানে কাফির-মুশরিকরা প্রিয়নবী (স)-কে বাধা দেয়। উভয়পক্ষে এখানেই একটি শান্তিচুক্তি সম্পাদিত করে। ইতিপূর্বে মদীনার উত্তরে বাণিজ্য পথে বাধা সৃষ্টি করার কারণে কুরাইশদের ব্যবসা-বাণিজ্য প্রায় বন্ধ হয়ে যায় এবং তাদের অর্থনীতি একদম ভেঙে পড়ে। তদ্‌সত্ত্বেও নবী করীম (স) তাদেরকে বাণিজ্য পথে চলাচলের নিরাপত্তা, মক্কা থেকে কোনো লোক পালিয়ে গেলে তাকে মক্কাবাসীদের নিকট ফেরত পাঠানো, পবিত্র হজ্জকে স্থগিত রেখে মদীনায়

প্রত্যাবর্তনসহ তাদের অন্যান্য দাবি-দাওয়া মেনে নিলেন। তাছাড়া উভয় পক্ষে শান্তি বজায় রাখার ব্যাপারে ওয়াদা করলেন। এমনকি তৃতীয় কোনো পক্ষের সাথে তাদের কারো বিবাদ বাঁধলে অন্যপক্ষ নিরপেক্ষ থাকার ব্যাপারে নিশ্চয়তা দিলেন।

নবী করীম (স) এ শান্তিচুক্তির পুরোপুরি সদ্ব্যবহার করলেন। তিনি ইসলাম প্রচারের জন্য এক ব্যাপক কর্মসূচি হাতে নিলেন। রোম, পারস্য, আবিসিনিয়া এবং অন্যান্য রাজা-বাদশাহর কাছে দাওয়াত পত্র পাঠালেন। স্বৈরাচারী রোম সম্রাটের ধর্মযাজক দুগাতুর প্রিয়নবী করীম (স)-এর এ আহবানে সাড়া দিয়ে ইসলাম গ্রহণ করলেন। কিন্তু উচ্ছৃংখল খৃস্টানরা বিনা বিচারে তাকে হত্যা করলো। অনুরূপ দুর্যোগে নিপতিত হলেন প্যালেস্টাইনের ধর্মযাজক। সম্রাটের নির্দেশে তাকে শূলে চড়ান হলো। ইসলামের দাওয়াত নিয়ে হারুন বিন উমাইয়া আযাদী (রা)-কে পাঠান হলো আরব সীমান্তে। খৃস্টান শাসনকর্তা শুরাহবিল তাঁকে হত্যা করলো। তৎকালীন নিয়ম অনুসারে এভাবে দূত হত্যা ছিলো একটি অমার্জনীয় অপরাধ। সম্রাট হিরাক্লিয়াস তবু তাকে কোনো রকম শাস্তি দিলেন না। বরং নবী করীম (স) শুরাহবিলের বিরুদ্ধে যে বাহিনী প্রেরণ করেন, হিরাক্লিয়াস তার মুকাবিলা করার জন্য তৈরী হয় এবং এক বিশাল বাহিনী নিয়ে ছুটে আসে মূতার প্রান্তরে।

মুসলমানদের দুর্যোগে থেকে মক্কার কাফির-মুশরিকরা ফায়দা লুটার পাঁয়তারা চালায় এবং হুদায়বিয়ার প্রান্তরে যে চুক্তি হয়েছিলো তার শর্তাবলী ভংগ করতে শুরু করে। তারই প্রেক্ষিতে নবী করীম (স) দশ হাজার মুজাহিদ নিয়ে নিজে মক্কায় অভিযান চালান এবং বিনা রক্তপাতে পবিত্র মক্কা নগরী হস্তগত করেন।

একজন সদাশয় বিজয়ী সেনাপতি হিসেবে তিনি বিজিত বাহিনীকে এক জায়গায় সমবেত করলেন। কাফির-মুশরিকরা মুসলমানদের ওপর দীর্ঘ ২০ বছর ব্যাপী যে অন্যায় আচরণ করেছে, যে যুলুম নির্যাতন চালিয়েছে, অন্যায়ভাবে তাদের বিষয় সম্পদ বাজয়াপ্ত করেছে, অহেতুক বিবাদে লিপ্ত রয়েছে—সে ব্যাপারে স্মরণ করিয়ে দেন। অতপর তিনি তাদের জিজ্ঞেস করেন যে, তোমরা এখন আমার কাছে কেমন ব্যবহার আশা কর ? কাফির-মুশরিকরা লজ্জায় অবনত মস্তকে দাঁড়িয়ে থাকে। নবীজী তাদেরকে লক্ষ করে ঘোষণা দিলেন যে, "আল্লাহ তোমাদের মাফ করুন। তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। আজ তোমাদের ওপর কোনো

দায়-দায়িত্ব চাপান হবে না। তোমরা স্বাধীন ও মুক্ত।" অমনি কাফির-মুশরিকরা মুসলমানদের যে সম্পদ বাজেয়াপ্ত করেছিলো তার ওপর থেকে সকল প্রকার দাবি প্রত্যাহার করে নেয়। নবীজীর এ ঘোষণা শোনার সাথে সাথে তাদের অন্তরে তুমুল তোলপাড় শুরু হয়। মনজগতে আমূল পরিবর্তন ঘটে—কয়েক ঘণ্টার মধ্যে মক্কাবাসীরা ইসলাম গ্রহণ করে।

সাধারণ ক্ষমার কথা শুনে একজন কুরাইশ নেতা এতখানি উৎফুল্ল হন যে, তিনি প্রিয়নবী (স)-এর হাতে হাত রেখে ইসলাম গ্রহণ করেন। নবী করীম (স) তাঁকে বললেন যে, বিনিময়ে আমি তোমাকে মক্কার গভর্নর পদে নিয়োগ করলাম। অতপর তিনি মদীনায় ফিরে আসেন অথচ তখন তিনি বিজিত নগরী মক্কা পাহারা দেয়ার জন্য একজন সৈন্যকেও রেখে আসেননি।

মক্কা বিজয়ের খবর শুনে তায়েফবাসীরা তৎপর হয়ে ওঠে। তারা হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর সাথে যুদ্ধ করার জন্য তৈরি হয়। তিনি প্রথমে বাধা পেলেন হুনাইনের প্রান্তরে। শুরুতে মুসলিম বাহিনী খানিকটা দুর্যোগে পড়লেও পরবর্তীতে শত্রুসেনাদের ছত্রভংগ করতে সমর্থ হয়। অতপর তায়েফ অবরোধ করেন এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে তায়েফবাসীদের প্রতিরোধ ভাঙার চেষ্টা করেন। অবশেষে নবী করীম (স) অবরোধ প্রত্যাহার করে নেন এবং মদীনায় ফিরে আসেন। এরপর মাত্র বছর খানেকের মধ্যে তায়েফের একটি প্রতিনিধিদল মদীনায় এসে নবীজীর কাছে আত্মসমর্পণ করে এবং ইসলাম গ্রহণ করে। কিন্তু তারা সালাত, যাকাত এবং সামরিক বিভাগে যোগদান থেকে অব্যহতি লাভের জন্য আবেদন জানায়। তাছাড়া তারা পূর্বের মত ব্যভিচার, ছেলেমেয়েদের অবাধ মেলামেশায় এবং মদ্যপান করার সুযোগ দেয়ার জন্য অনুরোধ করে। লাত ছিলো তৎকালীন পুতুল পূজারীদের একটি প্রধান দেবতা। লাতের মন্দিরটি ছিলো তায়েফে। তারা এ মন্দিরটিকেও অক্ষত রাখার জন্য নবী করীম (স)-এর নিকট দাবি পেশ করে। নবী করীম (স) তাদের আবেদনের প্রেক্ষিতে সমর বিভাগে যোগ দেয়া থেকে তাদের অব্যাহতি দিলেন। লাত মন্দির সম্পর্কে বললেন —লাত দেবতা ও মন্দির সম্পর্কে তোমাদের অনেক কুসংস্কার থাকতে পারে। হয়তো সে কারণেই তোমরা ভীত। মন্দিরটি তোমাদের নিজ হাতে ভাঙার দরকার নেই। আমরাই এখান থেকে লোক পাঠাবো। তারাই মন্দিরটি ভেংগে ফেলবে। কোনো রকম দুর্যোগ আসলে তারাই তা ভোগ করবে।

বস্তুতপক্ষে একজন নওমুসলিমের যে কতটুকু এবং কি পরিমাণ ছাড় দেয়া যাবে তা এ ঘটনা থেকেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

যাহোক অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তায়েফবাসীরা সদলবলে ইসলাম গ্রহণ করে। এমনকি এ ব্যাপারে তারা এতখানি আন্তরিক ও নিষ্ঠাবান হয়ে ওঠে যে, পূর্বের দেয়া ছাড়গুলোর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠে এবং এগুলো থেকে কোনোরকম সুযোগ গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকে। এর ফলে মুসলিম শাসনাধীন অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় তায়েফেও একজন যাকাত সংগ্রহকারী নিয়োগ করতে হয়।

দীর্ঘ ১০টি বছর যুদ্ধ বিগ্রহের মধ্যে দিয়ে অতিবাহিত হলো। এ সময়ে বিভিন্ন যুদ্ধ ময়দানে প্রায় ২৫০ জন মুশরিক নিহত হয়। মুসলমানদের পক্ষে শহীদ হয় তার চেয়েও কম সংখ্যক সাহাবী। বিনিময়ে সমগ্র আরব অঞ্চল থেকে অরাজকতা এবং অনৈতিকতা দূরীভূত হয়। আরব উপদ্বীপ, ইরাক ও প্যালেস্টাইনের বিপুল সংখ্যক জনতা স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করে। খৃস্টান ও পারসিকরা তাদের ধর্মমতে দৃঢ় থাকে। তাদেরকে বিবেকের স্বাধীনতার পাশাপাশি বিচার ও বিচার সম্পর্কিত বিষয়ে স্বাধীনতা প্রদান করা হয়।

নবী করীম (স) দশম হিজরীতে হজ্জ উপলক্ষে মক্কায় যান। এ সময়ে আরবের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রায় ১,৪০,০০০ লোক হজ্জ করার জন্য মক্কায় সমবেত হয়। তিনি তাদের উদ্দেশে ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। তাঁর ভাষণের মধ্য দিয়েই ইসলামের মূল কথাগুলো স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে ঃ

(ক) প্রতিটি মানুষ এক আল্লাহর ওপর বিশ্বাস রাখতে হবে। তিনি নিরাকার ও অদ্বিতীয়। (খ) প্রতিটি মুসলমান পরস্পরের সমান। তাদের মধ্যে বংশ বা বর্ণভেদে কোনো তারতম্য নেই। ইবাদাত-বন্দেগীতে যিনি যত উত্তম, মানুষ হিসেবেও তিনি তত মর্যাদাবান । (গ) সুদ ও বংশগত বিরোধকে চিরদিনের জন্য নিষিদ্ধ করা হলো। (ঘ) নারীজাতির সাথে উত্তম আচরণ ও ভদ্র ব্যবহার করতে হবে। (ঙ) মৃত ব্যক্তির বিষয় সম্পদের ওপর উত্তরাধিকার সূত্রে নিকটআত্মীয় ও আত্মীয়দের অধিকার নিশ্চত করতে হবে। (ফলে মুষ্টিমেয় লোকের হাতে সম্পদ পুঞ্জিভূত হবার সম্ভাবনা বন্ধ হয়ে যায়।) (চ) কুরআন ও হাদীস হবে সমস্ত আইন প্রণয়ন এবং সুষ্ঠ ও সুন্দর জীবনের মৌলিক ভিত্তি

পবিত্র হজ্জ সমাপনান্তে মদীনায় ফিরে আসার পরপরই প্রিয় নবী (স) অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং সপ্তাহ খানেকের মধ্যে ইন্তিকাল করেন। (ইন্না

লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।) নবী করীম (স)-এর জীবনের সবচেয়ে বড় সাফল্য ও তৃপ্তি এই যে, তাঁর ওপর আল্লাহ্ তাআলা যে পবিত্র দায়িত্ব ন্যস্ত করেছিলেন তিনি তা যথাযথভাবে সম্পাদন করেছেন, বিশ্ববাসীর কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দিয়েছেন।

নবী করীম (স) ভবিষ্যত বংশধরদের জন্য এমন একটি দীন তথা জীবনব্যবস্থা রেখে যান, যা সম্পূর্ণরূপে এক অদ্বিতীয় আল্লাহ্‌র ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত।

তিনি বিশৃংখলা ও নৈরাজ্য পরিপূর্ণ সমাজকে সুসংহত ও সুশৃংখল রাষ্ট্রে পরিণত করেন। হিংসাবিদ্বেষ ও খুনাখুনির পরিবর্তে সেখানে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন শান্তি ও সহমর্মিতা।

তিনি আধ্যাত্মিক ও জাগতিক তথা মসজিদ ও কিল্লার সাথে এক চমৎকার সামঞ্জস্য স্থাপন করেন।

তিনি এমন একটি আইন ব্যবস্থা রেখে যান যেখানে নিরপেক্ষ ও ন্যায়সংগত বিচারকে নিশ্চিত করা হয়েছে। এ আইন ব্যবস্থা অনুসারে রাষ্ট্রপ্রধান ও একজন সাধারণ নাগরিক একই কাতারে নেমে এসেছে ইসলামে ধর্মীয় সহিষ্ণুতার ওপর এত বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে যে, মুসলিম রাষ্ট্রে বসবাস করেও একজন অমুসলিম বিচার, বিচারক এবং সাংস্কৃতিক অংগনে পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে।

সরকারের রাজস্ব ব্যয়ের ব্যাপারেও কুরআন মজীদে একটি নীতিমালা নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। এখানে অন্যান্যদের চেয়ে গরিবদের ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

এখানে আরো ঘোষণা দেয়া হয়েছে যে, সরকারী কোষাগারের অর্থ কখনো রাষ্ট্রপ্রধানের সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে না।

সর্বপরি নবী করীম (স) মানবজাতির জন্য উত্তম আদর্শ। তিনি যা বলতেন, অন্যান্যদের যা শিখাতেন, নিজের জীবনে তা আমল করতেন পুরোপুরিভাবে।

রাসূলে করীম (স) বলেছেন, প্রকৃতপক্ষে নেতা হলেন মানুষের সেবক। তাঁর জীবনাচরণ থেকেই একথার সত্যতা ও তাঁর নির্মোহ মনোভাবের স্বাক্ষর মেলে। তিনি ঘোষণা দিয়েছেন যে, মুসলমানরা যাকাত হিসেবে যে অর্থ রাজকোষে জমা দেবে তা নবী করীম (স) এবং নবী পরিবারের জন্য

সম্পূর্ণ অবৈধ। অথচ তিনি ছিলেন রাষ্ট্রের প্রধান ও জনগণের আধ্যাত্মিক জগতের নেতা। এটা একটা বাস্তব সত্য যে, রাষ্ট্র বা সরকার প্রধান যদি নিয়ম নীতির অপব্যবহার না করেন, নীতিগর্হিত কাজ থেকে বিরত থাকেন তাহলে তার অধীনস্তরা দায়িত্ব পালনে কখনো কাণ্ডজ্ঞানহীন ও খামখেয়ালী হতে পারে না।

❐

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইসলামের মৌলিক শিক্ষার সংরক্ষণ ব্যবস্থা

একজন নিরপেক্ষ ও বিবেকবান মানুষের পক্ষে কোনো বিশেষ শিক্ষার যথার্থতা ও গ্রহণযোগ্যতা বিবেচনা করে দেখা কোনো সমস্যা নয়। অবশ্য ধর্মমতের ক্ষেত্রে প্রায়ই এমনটি হয়ে থাকে যে, প্রথমে প্রচারকের আখলাক যাচাই করা হয়। পরে যাচাই করা হয় তার কর্মবিধিকে। যদি প্রচারককে বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয় তাহলে সে তাঁর শিক্ষাকে পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করে না। বরং তাঁর শিক্ষাকে বুঝতে ও উপলব্ধি করতে না পারলে সেটাকে নিজের অক্ষমতা বলে স্বীকার করে নেয়ার জন্য তৈরী থাকে। এ সমস্ত ক্ষেত্রে ধর্ম প্রচারকের শিক্ষা ও বক্তব্য যে কতটা বস্তুনিষ্ঠ ও নির্ভরযোগ্যতার সাথে বর্ণিত হয়েছে সে বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে ধর্ম প্রচারকের ইন্তিকালের পর এ বিষয়টি সর্বাধিক গুরুত্ব লাভ করে।

পৃথিবীতে প্রধান ধর্মগুলোর নিজস্ব পবিত্র গ্রন্থ রয়েছে। এগুলোর মধ্যে কিছু আসমানী কিতাব হিসেবে পরিচিত। নানাবিধ দুর্যোগের কারণে আসমানী কিতাবের মূল বিষয়বস্তু হারিয়ে গেছে বা বিনষ্ট হয়েছে এবং এটা সত্যিকার অর্থে খুবই দুঃখজনক। বিকল্প হিসেবে যে গ্রন্থ আমাদের কাছে পৌছে তা কখনো হারিয়ে বা খোয়া যাওয়া অংশের সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারে না। ইহুদী-খৃস্টান বা অন্য কোনো ধর্মের মৌলিক শিক্ষার সংরক্ষণ পদ্ধতির সাথে ইসলামের সংরক্ষণ পদ্ধতির তুলনা করা যেতে পারে। আসমানী কিতাবগুলো কে লিপিবদ্ধ করেছে ? বংশানুক্রমে কে এ শিক্ষাকে মানুষের নিকট পৌছে দিয়েছে ? যা কিছু পৌছে দেয়া হয়েছে তা কি আদি গ্রন্থের মৌলিক ভাষায় না তার অনুবাদ মাত্র ? শিক্ষার বিষয়বস্তুর মধ্যে কি পরস্পর বিরোধিতা নেই ? অন্যত্র যে বিবরণ পাওয়া যায় তার সাথে কি এ শিক্ষার বিষয়বস্তুর অসংগতি বা তারতম্য নেই? সত্যসন্ধানী যে কোনো মানুষের অন্তরে স্বাভাবিকভাবেই এ প্রশ্নগুলোর উদয় হবে এবং তারা সন্তোষজনক জবাবের প্রত্যাশা করবে।

ওহী সংরক্ষণ ব্যবস্থা

মানব জাতির মধ্যে বিভিন্ন সময়ে ধর্মের উদ্ভব ঘটেছে। ধর্মীয় শিক্ষার সংরক্ষণের জন্য মানুষ কেবলমাত্র স্মরণশক্তির ওপর নির্ভর করেনি। বরং

তার চিন্তাচেতনাকে ধরে রাখার জন্য সে আবিষ্কার করেছে লিখন পদ্ধতি। তাছাড়া মানুষের আয়ুষ্কালের একটা সীমা রয়েছে। সে দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করলে স্মরণশক্তি অপেক্ষা লিখিত দলীলের স্থায়িত্ব অনেক বেশি।

কিন্তু স্মরণশক্তি ও লিখন পদ্ধতিকে আলাদা আলাদাভাবে বিবেচনা করলে এর কোনোটির ফলাফলই অভ্রান্ত বা পর্যাপ্ত হতে পারে না। দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে, কেউ কিছু লেখার পর সে যখন তা পুনঃপরীক্ষা করে তখন তার মতামতের পরিবর্তন, দৃষ্টিভংগী, লেখার স্টাইল, যুক্তি, এমন কি বিষয়বস্তুও সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিতে পারে। কখনো আবার গোটা দলীলটিই নতুন করে রচনা জরুরী হয়ে পড়ে। এগুলোকে বাদ দিলেও তার রচনার মধ্যে অনিচ্ছাকৃত কিছু ত্রুটি ক্ষেত্র বিশেষে অক্ষর এমনকি শব্দের বিচ্যুতি দেখা যাবে। কখনো আবার বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি, অপ্রয়োজনীয় কতগুলো শব্দের ব্যবহার, ভাষা অথবা ব্যাকরণগত ভ্রান্তি অবশ্যই নজরে পড়বে।

মানুষের স্মরণশক্তির বেলায়ও একথা প্রযোজ্য। কোনো কিছু মুখস্থ করে পুনরায় তা আবৃত্তি করা যাদের দায়িত্ব বা অভ্যাস, তারা জানে যে, মুখস্থ বিষয় আবৃত্তির সময় তারা কখনো কখনো অনেক কিছু স্মরণ করতে পারে না। কখনো কখনো কিছু বিষয়বস্তু বাদ পড়ে যায়। এক অংশের সাথে অপর অংশ মিলিয়ে ফেলে অথবা বিষয়বস্তুর ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়। আবার কখনো কখনো এমন হয় যে, মূল বিষয়বস্তু তাদের অবচেতন মনে থাকে। এগুলো তারা স্মরণ করতে পারে পরবর্তী সময়ে অথবা অন্য কেউ সূত্রটি ধরিয়ে দিলে। কখনো আবার লিখিত দলীলের বিষয়বস্তু দেখে।

প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর স্মরণশক্তি ছিলো খুবই প্রখর। এটা ছিলো আল্লাহর বিশেষ দান। তিনি তাঁর শিক্ষাকে সংরক্ষণের জন্য লিখন ও স্মরণশক্তি এ দুটো পদ্ধতিকে একই সময়ে ব্যবহার করেন। দুটি মাধ্যমকে তিনি প্রয়োগ করেন পরস্পরের সহায়ক শক্তি হিসেবে। এতে করে একদিকের বিষয়বস্তুর যথার্থতা সংরক্ষিত হয়। অপরদিকে সামান্যতম ভুলভ্রান্তির সম্ভাবনাও লোপ পায়।

ইসলাম শিক্ষা

ইসলামের শিক্ষা মূলত কুরআন ও হাদীসের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে এবং এ দুটোর ভিত্তি হলো ওহী বা প্রত্যাদেশ। কুরআন মজীদ সম্পর্কে বলা

যায় যে, সুদীর্ঘ ২৩ বছরে রাসূলে করীম (স) নিজেই কুরআনের ছোট ছোট অংশকে লিপিবদ্ধ করার ব্যবস্থা করেছিলেন। নবী করীম (স) বলেন, কুরআন আল্লাহর কালাম। ফেরেশতা জিবরাঈল (আ)-এর মাধ্যমে তা আমার নিকট অবতীর্ণ হয়েছে। অপরদিকে রাসূলে করীম (স) যা বলেছেন ও করেছেন তার যথার্থ বিবরণই হলো হাদীস। কিন্তু তিনি তাঁর কথাগুলোকে কুরআনের অর্ন্তভূক্ত করতে বলেননি। তাঁর কথা ও কর্মের বিবরণ লিপিবদ্ধ করার দায়িত্ব গ্রহণ করেন তাঁর সাহাবীগণ। অবশ্য তাঁরা এ কাজটি করেন তাঁদের ব্যক্তিগত উদ্যোগে সামর্থ অনুসারে। কখনো যদি এমন হতো যে, বিশেষ কোনো সময়ে তাঁর ওপর কোনো ওহী নাযিল হচ্ছে না, তখন তিনি সাহাবায়ে কেরামের সাথে আলাপ আলোচনা ও পরামর্শ করতেন। এখানেই রয়েছে ব্যক্তি হিসেবে হযরত মুহাম্মাদ (স) এবং আল্লাহর বাণী বাহক হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর মধ্যকার পার্থক্য। এ পার্থক্য সম্পর্কে প্রত্যেকেরই স্পষ্ট ধারণা থাকা আবশ্যক।

কুরআনের ইতিহাস

কুরআনের শাব্দিক অর্থ হলো পাঠ বা আবৃত্তি। রাসূলে করীম (স) যখন সাহাবায়ে কেরামকে দিয়ে কুরআনের আয়াতগুলো লিখিয়ে নিতেন তখন তিনি এ ব্যাপারে তাঁদের নিশ্চিত করতেন যে, এটা তাঁর ওপর নাযিলকৃত ওহী। গোটা কুরআন শরীফ একই সময়ে লিপিবদ্ধ হয়নি। কারণ, কুরআন খণ্ড খণ্ডভাবে বিভিন্ন সময়ে নাযিল হয়েছে। তাঁর ওপর একটি অংশ নাযিল হওয়ার সাথে সাথে তিনি তা সাহাবীগণের নিকট ব্যক্ত করতেন। নামাযের সময়ে পাঠ করার সুবিধার্থে তিনি সাহাবায়ে কেরামকে কেবলমাত্র নাযিলকৃত অংশটুকু মুখস্থ করারই নির্দেশ দিতেন না, বরং তা যথাযথভাবে লিখে রাখার এবং বহু সংখ্যক কপি করারও নির্দেশ দিতেন। উপরন্তু সে সময় পর্যন্ত কুরআনের যতটুকু অংশ নাযিল হয়েছে তার কোনো স্থানে নতুন আয়াতটুকু সংযোজিত হবে। প্রতিবারেই অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে তা নির্দেশ করে দিতেন। এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, কুরআনুল করীম সময়ানুক্রমিক কোনো বিবরণ নয়। কুরআনুল করীমের একটি অংশ নাযিল হওয়ার সাথে সাথে তিনি লিপিকার বা কাতিবকে দিয়ে তা লিখিয়ে নিতেন। লেখা শেষে তিনি তা পুনরায় পাঠ করতে বলতেন। লেখার মধ্যে কোনো রকম ভুলত্রুটি থাকলে তা সংশোধন করাই ছিলো এর উদ্দেশ্য। তৎকালীন আরবের সাংস্কৃতিক পরিস্থিতির আলোকে বিচার করলে নির্ভুল-ভাবে ওহীর সংরক্ষণ ক্ষেত্রে এটা ছিলো সর্বোত্তম ব্যবস্থা ও সতর্কতা।

এটা অযৌক্তিক নয় যে, প্রাথমিক পর্যায়ে যে সমস্ত আয়াত নাযিল হয়েছে সাথে সাথে তা লিখে রাখা হতো না। কারণ আয়াতগুলো লিখে রাখার জন্য তখন তাঁর সাথে কোনো সাহাবী বা অনুচর ছিলেন না। অবশ্য এ সময়কার আয়াতগুলো ছিলো ছোট ছোট এবং সংখ্যায়ও কম। ফলে তাঁর স্মৃতি থেকে এগুলো মুছে যাবার কোনো আশংকা ছিলো না। তাছাড়া নিয়মিত নামায আদায় এবং ইসলাম প্রচারের কাজে বার বার তাঁকে এ আয়াতগুলো পাঠ করতে হতো। ফলে লিপিবদ্ধ করা না হলেও এ সময় আয়াতে ভুল-ভ্রান্তির বিন্দুমাত্র সুযোগ ছিলো না।

ঐতিহাসিক ঘটনাবলী থেকে এ সম্পর্কে একটি বাস্তব ধারণা পাওয়া যেতে পারে। জানা যায়, ইসলাম গ্রহণকারীগণের মধ্যে হযরত উমর (রা) ছিলেন ৪০তম ব্যক্তি। এটা ছিলো নবুওয়াতের ৫ম বছরের ঘটনা। সে সময়েও কুরআন করীমের আয়াতসমূহ লিখিত অবস্থায় ছিলো। ইবনে হিশাম উল্লেখ করেছেন যে, এ ধরনের একটি লিখিত আয়াত পাঠ করার পর হযরত উমর (রা)-এর অন্তরে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়, তারপরই তিনি ইসলাম কবুল করেন। ঠিক কোন্ সময় থেকে কুরআনুল করীমের লিপিবদ্ধ করণের কাজ শুরু হয় সে কথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। তবে এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে, নবী জীবনের পরবর্তী ১৮ বছরের দিনে দিনে মুসলমানগণের সংখ্যা যেমন বৃদ্ধি পেতে থাকে তেমনি বাড়তে থাকে কুরআনুল করীমের লিখিত কপি সংখ্যা।

প্রিয়নবী (স) ওহীপ্রাপ্ত হয়েছেন খণ্ড খণ্ড অংশে। এটা খুবই স্বাভাবিক যে, বহু আয়াতই নাযিল হয়েছে যা যুগ-সমস্যা সমাধানের দিকনির্দেশনা দেয়। হয়তো এমন হয়েছে যে, নবী করীম (স)-এর একজন সাহাবী ইন্তেকাল করলেন তখন এ ঘটনার প্রেক্ষিতে নাযিল হলো মীরাছ বা উত্তরাধিকার আইন সংক্রান্ত আয়াতসমূহ। আবার চুরি, হত্যা বা মদপানের কারণে দণ্ডবিধি সম্পর্কিত আয়াত বা বিধান নাযিল হয় সংশ্লিষ্ট কোনো ঘটনার প্রেক্ষিতে।

হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর নবুওয়াত জীবনের গোটা ২৩ বছর ব্যাপী কুরআনুল করীম নাযিল হতে থাকে। (২৩ বছরের মধ্যে ১৩ বছর কাটে মক্কায় এবং অবশিষ্ট ১০ বছর অতিবাহিত হয় মদীনায়।) কখনো কখনো ছোট বা বড় একটি পূর্ণ সূরা হিসেবে অবতীর্ণ হতো। কখনো আবার নাযিল হতো গোটা কয়েক আয়াত হিসেবে ।

ওহী নাযিলের ধারাটাই এমন ছিলো যে, রাসূলে করীম (স)-কে সাহাবীগণের কাছে অবিরত কুরআনের আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করতে হতো। আয়াতসমূহের ধারাবাহিকতা এবং বিষয়বস্তুর বিশুদ্ধতা নিয়মিত পরীক্ষা করে দেখা হতো। নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা যায় যে, রাসূলে করীম (স) প্রতি বছর রমযান মাসে সে সময় পর্যন্ত নাযিলকৃত কুরআনুল করীমের সমুদয় অংশ পাঠ করতেন। ফেরেশতা জিবরাঈল (আ)-ও তখন সেখানে উপস্থিত থাকতেন এবং তাঁর জীবনের শেষ বছর জিবরাঈল (আ) তাঁকে গোটা কুরআন শরীফ দু'বার পাঠ করার জন্য অনুরোধ জানান। এ ঘটনা থেকেই নবী করীম (স) নিশ্চিত বুঝতে পারেন যে, তাঁর ইন্তেকালের সময় অতি সন্নিকটে। ফেরেশতার সহযোগিতার অন্তর্নিহিত অর্থ যাই থাক প্রিয়নবী (স) যখন তেলাওয়াত করতেন তখন সাহাবায়ে কেরাম সে তেলাওয়াত মাহফিলে শরীক হতেন এবং দরকার হলে তাঁদের ব্যক্তিগত সংরক্ষণে সংরক্ষিত কপিগুলো সংশোধন করে নিতেন। প্রিয়নবী (স)-এর এ ধরনের নিয়মিত তেলাওয়াতকে 'আরদাহ' এবং শেষ তেলাওয়াতকে বলা হয় 'আরদাহ আখিরা'।

রাসূলে করীম (স) প্রতি বছর রমযান মাসে কুরআন তেলাওয়াত করতেন এবং আয়াত ও সূরাগুলোকে যথাযথভাবে ধারাবাহিকতায় বিন্যস্ত করতেন। বস্তুতপক্ষে নিরবচ্ছিন্নভাবে নতুন নতুন আয়াত নাযিল হতো বলে এভাবে তিলাওয়াত করা জরুরী ছিলো। কখনো কখনো একটি গোটা সূরা এক সাথে নাযিল হতো। কখনো আবার সূরার আয়াতগুলো নাযিল হতো খণ্ড খণ্ডভাবে। ক্ষেত্র বিশেষে এমন হতো যে, অনেকগুলো সূরার আয়াত একই সময়ে খণ্ড খণ্ডভাবে নাযিল হতো। এ ক্ষেত্রে আয়াতগুলোকে সুবিধাজনক কোনো কিছুর ওপরে পৃথক পৃথকভাবে লিখে রাখা হতো। লেখার জন্য সাধারণত হাড়, তাল বা খেজুর পাতা, পাথর, চামড়া প্রভৃতি সামগ্রী ব্যবহৃত হতো। একটি অধ্যায়ের সমুদয় আয়াত নাযিল হওয়ার সাথে সাথে দায়িত্বপ্রাপ্ত সাহাবীগণ লেখাগুলোকে আগে পিছে সাজিয়ে একটি চূড়ান্ত কপি তৈরী করতেন। সাহাবায়ে কেরাম এ কাজটি করতেন প্রিয়নবী (স)-এর তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশ অনুসারে।

(তিরমিযী—ইবনে হাম্বল, ইবনে কাসীর)

নির্ভরযোগ্য সূত্রে একথাও জানা যায় যে, রাসূল করীম (স) রমযান মাসের প্রতি রাতে অতিরিক্ত নামায পড়তেন। কখনো তিনি এ নামায জামায়াতের সাথে আদায় করতেন। নামাযের সময় তিনি কুরআন শরীফের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত গোটা অংশ তেলাওয়াত করতেন। এ

নামাযকে বলে তারাবীহ । অদ্যাবধি মুসলমানগণ মাহে রমযানে তারাবীহ নামায অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে আদায় করে থাকেন।

প্রিয়নবী (স)-এর ওফাতের পর কোনো কোনো অঞ্চলে বিদ্রোহ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। বিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে অনেক কুরআনে হাফিয শহীদ হন, তা দেখে খলীফা আবু বকর (রা) কুরআন শরীফ সংকলন করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। প্রিয়নবী (স)-এর ওফাতের কয়েক মাস পরেই এ কাজটি সম্পন্ন হয়।

প্রিয়নবী (স) জীবনের শেষ দিকে যায়েদ ইবনে সাবিত (রা)-কে নতুন অবতীর্ণ ওহীগুলো সংকলন করার জন্য প্রধান কাতিব হিসেবে নিয়োগ করেন। হযরত আবু বকর (রা) হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রা)-কে ওহীসমূহের একটি বিশুদ্ধ সংকলন পুস্তক আকারে গ্রন্থিত করার দায়িত্ব দেন। মদীনায় অনেক হাফিয ছিলেন। সমগ্র কুরআন ছিলো তাদের মুখস্থ। হযরত যায়েদ (রা) ছিলেন হাফিয। তাছাড়া তিনি 'আরদাহ আখিরা' মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। খলীফা তাঁকে এ মর্মে নির্দেশ দিলেন যে, প্রথমে সমগ্র কুরআন মজীদের দু'খানা লিখিত কপি সংগ্রহ করতে হবে। কপি দুটি এমন হতে হবে যা নাকি রাসূল করীম (স)-এর তেলাওয়াতের সাথে মিলানো হয়েছে।

মদীনার মুসলমানগণের নিকট কুরআনুল করীমের বিভিন্ন আয়াতের অনেক কপি ছিলো। খলীফার নির্দেশে হযরত যায়েদ ইবনে সাবিতের কাছে তাঁদের সমস্ত কপি এনে একত্রিত করা হলো। নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা যায়, যায়েদ ইবনে সাবিত (রা)-এর নিকট যে সমস্ত কপি পেশ করা হয়েছিলো তন্মধ্যে কেবল মাত্র দুটি আয়াতের বেলায় একটি করে লিখিত কপি পাওয়া যায়। কিন্তু অন্যান্য আয়াতের ক্ষেত্রে একই ধরনের অসংখ্য কপি পাওয়া যায়।

অবশেষে যাঁয়েদ ইবনে সাবিত (রা) একটি কপি চূড়ান্ত করেন। এ কপিকে বলা হতো 'মাসহাফ'। 'মাসহাফ' অর্থ বাঁধাই পুস্তক। কপিটি খলীফা হযরত আবু বকর (রা) নিজ হিফাযতে রেখেছিলেন। তাঁর ইন্তিকালের পর কপিটি চলে যায় খলীফা উমর (রা)-এর ব্যক্তিগত যিম্মায়। ইতিমধ্যে মুসলিম সাম্রাজ্যের সর্বত্র কুরআন তিলাওয়াত ও চর্চাকে ভীষণ রকম উৎসাহিত করা হয়। কুরআন তেলাওয়াতের ক্ষেত্রে সকল প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিহার করার লক্ষে খলীফা উমর (রা) প্রাদেশিক কেন্দ্রসমূহে নির্ভরযোগ্য কপি প্রেরণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব

করেন। কিন্তু তাঁর পক্ষে একাজটি সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি। পরবর্তীতে এ দায়িত্ব পালন করেন তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান (রা)।

ইতিমধ্যে খলীফা হযরত উসমান (রা)-এর একজন প্রতিনিধি সুদূর আর্মেনিয়া থেকে খলীফার দরবারে এলেন। তিনি জানান যে, সেখানে তিনি কুরআনুল করীমের পরস্পর বিরোধী কিছু কপি প্রত্যক্ষ করেছেন। এমন কি মাঝে মধ্যে এ নিয়ে কুরআন শিক্ষকগণের মধ্যে বিবাদের সূত্রপাত ঘটে। হযরত উসমান (রা) তৎক্ষণাত একটি কমিশন গঠন করেন। হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রা)-কে নিয়োগ করেন কমিশনের প্রধান হিসেবে। হযরত আবু বকর (রা) যে কপিটি চূড়ান্ত করেছিলেন তারই ভিত্তিতে ৭টি কপি তৈরি করা ছিলো কমিশনের প্রধান কাজ। তা ছাড়া প্রয়োজনবোধে পুরনো বানানগুলো সংশোধন করার ইখতিয়ারও তাদের দেয়া হয়েছিলো। কপি তৈরীর কাজ সম্পন্ন হলো তখন তিনি প্রকাশ্য গণজমায়েতে কুরআনুল করীমের নতুন সংস্করণ তেলাওয়াত করার ব্যবস্থা নিলেন। রাসূলের সাহাবীগণের মধ্যে এ বিষয়ে যাঁদের বিশেষ দক্ষতা ও জ্ঞান ছিলো এবং যাঁরা রাজধানীতে অবস্থান করছিলেন তাঁরাও উপস্থিত ছিলেন। বিশাল মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন কেন্দ্রে এর অনুলিপি পাঠিয়ে দেন। নির্দেশ দেন যে, এখন থেকে কুরআনুল করীমের সমস্ত কপি নির্ভরযোগ্য এ সংস্করণের অনুরূপ হতে হবে। সরকারীভাবে যে কপি চূড়ান্ত করা হয়েছে তার সাথে অন্য কোনো কপির কোনো রকম বিচ্যুতি লক্ষ করা গেলে সেগুলোকে বিনষ্ট করে ফেলতে হবে।

এটা সহজেই অনুমান করা যায় যে, প্রাথমিক যামানার মুসলমানগণের ব্যাপক সামরিক বিজয়ের কারণে মুনাফিক শ্রেণীর অনেক লোক ইসলাম গ্রহণ করে। বস্তুতপক্ষে তাদের এই ইসলাম গ্রহণ ছিলো একান্তই লোক দেখান। মূল উদ্দেশ্য ছিলো বৈষয়িক ফায়দা হাসিল করা। কিন্তু ভিতরে অতি সংগোপনে তারা ইসলাম তথা মুসলমানদের ক্ষতি করার প্রয়াস চালায়। তারা ক্ষেত্র বিশেষে কুরআন মজীদে জাল আয়াত সংযোগ করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। খলীফা হযরত উসমান (রা) কুরআন শরীফের অপ্রমাণিত বা নির্ভরযোগ্য নয় এমন কপিগুলো বিনষ্ট করার নির্দেশ দিলে অনেকেই কুম্ভীরাশ্রু বর্ষণ করে। মেতে ওঠে মেকী কান্নায়। বস্তুতপক্ষে এরা ছিলো সেই মুনাফিকদের দলভুক্ত জনগোষ্ঠী।

জানা যায়, প্রিয়নবী (স)-এর নিকট কখনো এমন আয়াত নাযিল হতো যা পরবর্তীতে হয়তো অন্য আয়াতের দ্বারা মানসূখ হয়ে গেছে। কিন্তু

পূর্ববর্তী আয়াত হয়তো কোনো সাহাবী সংরক্ষণ করেছেন কিন্তু উক্ত আয়াত মানসূখ হওয়া সম্পর্কিত পরবর্তী আয়াত তিনি পাননি। এটাও ছিলো কুরআন সম্পর্কিত ভুল বুঝাবুঝির একটা কারণ।

পূর্বেই বলা হয়েছে, কুরআনুল করীমের আয়াত নাযিল হওয়ার সাথে সাথে তা কোথায়, কোন্ স্থানে, কোন্ আয়াতের পরে অথবা পূর্বে বসবে নবী করীম (স) তা নির্ধারণ করে দিতেন। সাহাবীগণকে তা জানিয়ে দেয়া হতো। বস্তুতপক্ষে এটা ছিলো কুরআনুল করীমের আয়াতসমূহ ধারাবাহিক ভাবে সাজানোর একটি অব্যাহত ধারা। কিন্তু কখনো কখনো এমন হয়েছে পূর্বে নাযিলকৃত কোনো আয়াতকে পরবর্তীতে নাযিলকৃত আয়াতের মাঝে স্থান দেয়া হয়েছে। কখনো আবার পূর্বে সাজানো হয়েছে এমন একটি আয়াতকে স্থানান্তর করে সবেমাত্র নাযিলকৃত আয়াতকে সেখানে বসান হয়েছে। এমন অনেক সাহাবী ছিলেন যাঁরা কেবলমাত্র প্রথমে আয়াত-গুলোকে যে ধারাবাহিকতায় সাজান হয়েছিলো সে সম্পর্কে জানতেন। কিন্তু পরবর্তীতে যে এর সংস্করণ করা হয়েছে সে সম্পর্কে ছিলেন অনবহিত। প্রধানত দুটি কারণে এমনটি হয়েছে। মৃতজনিত কারণে তারা পরবর্তী পরিমার্জন বা সংস্করণ সম্পর্কে জানতে পারেননি। ফলে যে ধারাবাহিকতায় তাঁরা আয়াতসমূহকে সাজিয়ে ছিলেন তা পুনর্বিন্যাসের সুযোগ পাননি। দ্বিতীয়ত, অনেকে মদীনার বাইরে বসবাস করতেন। ফলে বিভিন্ন সময়ে আয়াতসমূহকে সাজানোর ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন করা হয়েছে অথবা নতুন আয়াত নাযিল হয়েছে সে সম্পর্কে জানতেন না।

উপরন্তু সে আমলে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের ভাষা এবং উচ্চারণ রীতি ছিলো। রাসূল (স) মুসলমানদেরকে আঞ্চলিক ভাষায় কুরআন তেলাওয়াতের অনুমতি দিয়েছিলেন। এটা ছিলো একটি জরুরী ব্যবস্থা মাত্র। নেহায়েত অনুকম্পা এবং সহানুভূতি হিসেবে রাসূল (স) এ সুযোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু খলীফা হযরত উসমান (রা)-এর শাসনামলের মধ্যে মুসলিম সাম্রাজ্যে গণশিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটে। খলীফা তীব্রভাবে অনুভব করেন যে, কুরআন তেলাওয়াতের ব্যাপারে মুসলমানদেরকে আর আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহারের সুযোগ দেয়া উচিত নয়। আঞ্চলিক ভাষার সুযোগ দিলে হয়তো আল্লাহর কালাম বিকৃত হতে পারে এবং কালক্রমে এর বিকৃত পদ্ধতি হয়তো স্থায়ীরূপ নিতে পারে এটাও তিনি অনুভব করেছিলেন।

খলীফা হযরত উসমান (রা) প্রাদেশিক কেন্দ্রগুলোতে কুরআন শরীফের যে অনুলিপিসমূহ প্রেরণ করেছিলেন, পরবর্তী শতাব্দীগুলোতে তার

অধিকাংশই একে একে বিলীন হয়ে গেলেও তার একখানি কপি অবশ্য এখনো ইস্তাম্বুলে তোপকাপি যাদুঘরে সযত্নে সংরক্ষিত আছে। আরেকখানির অংশ বিশেষ রয়েছে তাসখন্দে। রাশিয়ার জার সরকার সম্পূর্ণ কুরআন শরীফখানা পুনমুদ্রণ করেছিলেন। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য হযরত উসমান (রা) যে বিশুদ্ধ সংকলন করেছিলেন বর্তমান দুনিয়ায় সেটাই চালু রয়েছে।

০ রাসূলে করীম (স)-এর আমল থেকেই মুসলমানদের মধ্যে গোটা কুরআন শরীফ মুখস্থ করার রেওয়াজ চালু ছিলো। খলীফা এবং মুসলিম রাষ্ট্র প্রধানগণ কুরআন শরীফ মুখস্থ করার এ ধারাকে সবসময় উৎসাহিত করতেন। এভাবেই কুরআনের বিশুদ্ধতা সংরক্ষণের বিষয়টি আরো নিশ্চিত হয়।

বস্তুতপক্ষে গোড়া থেকেই মুসলমানগণ মূল লিপিকারের কাছেই কোনো কিছু পড়তে অভ্যস্থ ছিলেন। মূল লিপিকার না পেলে অন্তত তাঁর কাছ থেকে অনুমোদনপ্রাপ্ত কোনো ছাত্র বা শাগরীদের কাছে পড়তেন। এমন কি নিয়মিত অধ্যয়ন এবং তুলনামূলক বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে তারা যে বিষয়টি শিখতেন এবং সংশোধন করে নিতেন, সে বিষয়টি আরো প্রচারের ব্যাপারে শিক্ষকের কাছ থেকে ছাড়পত্র নিতেন। যাঁরা কুরআন শরীফ মুখস্থ করতেন বা কেবলমাত্র নযরানা পড়তেন তাঁরাও এ রেওয়াজটি পুরোপুরিভাবে মেনে চলতেন। শিক্ষার এ ধারাটি আমাদের সময়কাল পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে। তাদের শিক্ষার আরো একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিলো এই যে, শিক্ষকের তরফ থেকে ছাত্রকে দেয়া সনদপত্রে কেবল মাত্র ছাত্রের সফলতার কথাই উল্লেখ থাকতো না, সনদপত্রে একথাও উল্লেখ থাকতো যে, তিনি তাঁর শিক্ষকের নিকট থেকে যা শিখেছেন সে শিক্ষক তাঁর শিক্ষকের নিকট থেকে আবার সেই শিক্ষক তাঁর শিক্ষকের নিকট থেকে যা শিখেছেন বর্তমান ছাত্রের শিক্ষাও তাঁর সাথে হুবহু সংগতিপূর্ণ। অর্থাৎ এভাবেই শিক্ষক এবং শিক্ষার একটি নিরবচ্ছিন্ন ধারা ক্রমান্বয়ে রাসূলে করীম (স)-এর সময়কাল পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছে।

বর্তমান পুস্তকের লেখক ডঃ হামিদুল্লাহ মদীনা শরীফের শেখ আল কুর্‌রা হাসান আস-সায়ির-এর নিকট কুরআন চর্চা করেন। সাফল্যের সাথে অধ্যয়ন শেষে তিনি যে সনদপত্র লাভ করেন, তাতে অন্যান্য বিষয়ের সাথে ধারাবাহিকভাবে শিক্ষকের শিক্ষকগণের নামের তালিকাও লিপিবদ্ধ ছিলো। প্রথম শিক্ষক যে কিভাবে একই সময়ে উসমান (রা),

আলী (রা), ইবনে মাসুদ (রা). উবাই ইবনে কা'ব (রা) এবং যায়িদ ইবনে সাবেত (রা)-এর নিকট কুরআন অধ্যয়ন করেন তাও লিখা রয়েছে এ সনদপত্রে। এমনকি তাঁদের প্রত্যেকের যে অভিন্ন বিষয়বস্তু সম্পর্কে শিক্ষা দিয়েছেন সে কথাটিও এখানে লিপিবদ্ধ রয়েছে। বর্তমান বিশ্বে হাজার হাজার হাফেয রয়েছেন। কুরআন এর কপি রয়েছে অগণিত। হাফেযগণ যা মুখস্থ করেছেন এবং কুরআন মজীদে যা লেখা আছে তার মধ্যে বিন্দু-বিসর্গ পার্থক্য নেই।

কুরআন শরীফের মূল ভাষা আরবী। এখনো কুরআন শরীফে সে ভাষা ব্যবহৃত হচ্ছে। পৃথিবীর প্রধান প্রধান সবগুলো ভাষাতেই কুরআন শরীফের অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। যারা আরবী ভাষা বুঝেন না, আরবী ভাষার সাথে অভ্যস্থ নন প্রধানত তাদের জন্য অনূদিত কুরআন শরীফ বেশি উপকারী। এ প্রসংগে অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে যে, কুরআন শরীফের মূলপাঠ আদি আরবী ভাষাতে আমাদের কাছে পৌছেছে। ফলে পরবর্তী সময়ের কোনো অনুবাদ থেকে পুনরায় আরবী ভাষায় কুরআন শরীফের ভাষান্তর করার প্রয়োজন পড়েনি।

অবিরত পরিবর্তনশীলভাবে কোনো ভাষার একটি বৈশিষ্ট্য এবং এমন একটি সময় আসে যখন একটি ভাষা মানুষের বোধগম্যতার বাইরে চলে যায়। এমনকি ইংল্যাণ্ডের প্রাচীন ইংরেজী ভাষায় পারদর্শী ছাত্র ছাড়া চশারের (১৪০০) ইংরেজী এখন আর কারো বোধগম্য নয়। গ্রীক, ল্যাটিন, ফ্রান্স, জার্মান, রাশিয়ান প্রভৃতি আধুনিক বা প্রাচীন সকল ভাষার জন্যই একথা সত্য। একমাত্র ব্যতিক্রম লক্ষ করা যায় আরবী ভাষার ক্ষেত্রে। বিগত ১৪০০ বছরেও এর শব্দ চয়ন, ব্যাকরণ, বানান, এমনকি উচ্চারণেও কোনো পরিবর্তন আসেনি। যদি বানানে কী উচ্চারণে কোনো পরিবর্তন হয়েও থাকে তাহলে বুঝতে হবে যে, পূর্বে হয়তো এর দু'রকম ব্যবহার রীতি ছিলো। বর্তমানে একটির প্রচলন বৃদ্ধি পেয়েছে অপরটি পরিত্যক্ত হয়েছে। কুরআন মজীদকে স্থায়ী রূপ দেয়ার জন্যই সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাআলা এ রকম একটা অপরিবর্তনশীল ভাষাকে বেছে নিয়েছেন —এটা কি আসমানী ব্যবস্থাপনা নয় ?

কুরআনুল করীমের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে, এর মূল পাঠ যে ভাষায় নাযিল হয়েছে সেই আসল ভাষাতেই এটি হুবহু রূপে রয়েছে। এর বিন্যস্তকরণ সম্পন্ন হয়েছে রাসূলে করীম (স)-এর নিজের তত্ত্বাবধানেই। এ অব্যাহতভাবে একাধারে কণ্ঠস্থকরণ ও লিখন এই দ্বৈত নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সংরক্ষিত হয়ে আসছে তাছাড়া সব যুগে সব কালেই

বিপুল সংখ্যক লোক কুরআন চর্চায় ব্যাপৃত হয়েছেন তাঁরা চর্চা করেছেন উপযুক্ত এবং যোগ্য শিক্ষকগণের তত্ত্বাবধানে। তাছাড়া কুরআন মজীদের মূল পাঠে কোনো পরিবর্তন আসেনি। এমনকি এর একটি হরকতে কিংবা হরফে কিংবা শব্দের কোনো হেরফেরও হয়নি।

কুরআন মজীদের বিষয়বস্তু

কুরআন মজীদ আল্লাহর কালাম। এ কালাম আল্লাহ তাআলার তরফ থেকে তাঁর রাসূল (স)-এর ওপর নাযিল হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (স) হচ্ছেন কেবলমাত্র একজন অসীলা ওহীসমূহ গ্রহণ ও প্রকাশ করার জন্য। তিনি এর প্রণেতা বা গ্রন্থকার নন।

আল্লাহ তাআলা অনন্ত অসীম। মানুষের সকল ভৌত উপলব্ধির অতীত। তিনি সকল প্রকার জাগতিক প্রত্যক্ষণের উর্ধে। নূরের সৃষ্টি ফেরেশতার মাধ্যমে তিনি তাঁর ইচ্ছা ও তাঁর হুকুম-আহকাম মানবজাতির স্বার্থে নবী-রাসূলগণের নিকট প্রেরণ করেন। আল্লাহ তাআলার ভাষা সকল প্রকার বাধা বন্ধনের উর্ধে। একটি রূপক উপমার মাধ্যমে গোটা বিষয়টিকে তুলে ধরা যেতে পারে। নবী-রাসূলগণ হলেন বাল্ব, ওহী হলো বিজলী বা বিদ্যুত। বিদ্যুতের সংস্পর্শে এলেই ভোল্টেজ এবং রং অনুসারে বাল্ব জ্বলে ওঠে। একজন নবীর মাতৃভাষা হলো বাল্বের রং। বাল্বের পাওয়ার, বিদ্যুতের ভোল্টেজ এবং অন্যান্য জিনিসগুলো নির্ধারণ করেন আল্লাহ নিজে। এখানে মানুষের কেবল প্রেরণ যন্ত্র বা অসীলা।

কুরআন মজীদ আল্লাহর কালাম। বলা হয়েছে, দিনে বা রাতে যখনই সময় পাওয়া যাবে তখনই মুসলমানদের কুরআন তেলাওয়াত করা উচিত। সুফীগণ কুরআন তেলাওয়াতের চমৎকার একটা ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন। তাঁদের মতে কুরআন তেলাওয়াত করেই একজন মানুষ আল্লাহর কাছে পৌঁছে যায়। আল্লাহর কালামকে সে ব্যবহার করে মাধ্যম বা অবলম্বন হিসেবে। অন্য কথায় তড়িৎ প্রবাহ যেমন আলোর বাহন হিসেবে কাজ করে, বাতির সাথে সংযোগ ঘটায় পাওয়ার হাউজের, তেমনিভাবে আল্লাহর কালামও ব্যবহৃত হয় সংযোগ মাধ্যম হিসেবে। বস্তুতপক্ষে এটা কোনো বাহুল্য কথা বা অর্থহীন বাগাড়ম্বর নয়।

প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ (স) অন্তত সাতদিনে একবার গোটা কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করার জন্য জোর তাকীদ দিয়েছেন। তদনুসারে কুরআনুল করীমকে বিভক্ত করা হয়েছে ৭টি অংশে। প্রতিটি অংশকে বলা হয় একটি মনযিল। তাছাড়া রয়েছে ১১৪টি অধ্যায়। এগুলো সূরা হিসেবে

পরিচিত। প্রতিটি সূরার মধ্যে রয়েছে কতকগুলো আয়াত বা বাক্য। আরবী পরিভাষায় মনযিল হচ্ছে একদিনের সফর শেষের একটি স্টেশন, সূরা হচ্ছে দেয়াল দিয়ে ঘেরা জায়গা বা কক্ষ। আয়াতের উৎপত্তি 'আওয়া' থেকে যার অর্থ বিছানায় যাওয়া। আধ্যাত্মিক অথবা জাগতিক যাইহোক না কেন স্টেশন, কক্ষ এবং বিছানা হলো একজন সফরকারীর জন্য তিনটি মৌলিক বিষয়। একজন সফরকারীকে দীর্ঘ আধ্যাত্মিক সফরশেষে দিবাবসানে কোনো স্টেশনে আসতে হয়। আর পরবর্তী দিনে শাশ্বত এবং অনন্তের পথে যাওয়া শুরু করার পূর্বে খানিকটা বিশ্রামের জন্য তার প্রয়োজন একটি কক্ষ ও একটি বিছানার।

স্থান-কাল-জাতি নির্বিশেষে সমগ্র মানব জাতির জন্য নাযিল হয়েছে আল কুরআন। এর মধ্যে রয়েছে আধ্যাত্মিক, জাগতিক, ব্যক্তি বা সমষ্টির জীবনের সকল বিষয়ে সর্বপ্রকার পথনির্দেশ। রাষ্ট্রপ্রধান থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ, ধনী ও গরিব প্রভৃতি সকল শ্রেণীর মানুষের আচরণ পরিচালনা, যুদ্ধ ও শান্তির আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক, বাণিজ্যিক ও বৈষয়িক উন্নয়ন সংক্রান্ত সকল প্রকার নির্দেশনা রয়েছে কুরআনুল করীমে। কুরআনুল করীম প্রধানত মানুষের ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধনে চেষ্টা করে। এখানে ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেককে জবাবদিহি করতে হয় স্রষ্টার কাছে। সে কারণেই কুরআন কেবলমাত্র নির্দেশই প্রদান করে না বরং ব্যক্তির মধ্যে প্রেরণা ও তাকীদ সৃষ্টির চেষ্টা করে। এর আবেদন রয়েছে মানুষের বিবেকের কাছে, এ মানুষের কাছে পৌঁছে দেয় ঐতিহাসিক কাহিনী, উপদেশ পূর্ণ ছোট ছোট ঘটনাবলী এবং রূপক উপমা উদাহরণ। মহান আল্লাহর গুণাবলীর বিবৃতি-বিবরণ রয়েছে এর মধ্যে। আল্লাহর ইবাদাত বন্দেগীর পদ্ধতি প্রক্রিয়া কেমন হবে। কোন্ ধরনের ইবাদাত সর্বোত্তম, আল্লাহর প্রতি মানুষের দায়িত্ব কর্তব্য কি, অন্যান্যদের তথা নিজের প্রতি তার করণীয় কাজ কি কি, প্রভৃতি বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে কুরআন মজীদে। নিজের প্রতি দায়িত্ব কর্তব্যের অর্থ এই যে, ধরার বুকে মানুষ নিজের জন্য বেঁচে থাকে না, বরং সে বেঁচে থাকে আল্লাহর দয়ায় যিনি তাঁর মধ্যে আত্মাকে স্থাপন করেছেন। সামাজিক জীবন, ব্যবসা-বাণিজ্য, বিয়ে-শাদী, দণ্ডবিধি, উত্তরাধিকার আইন, আন্তর্জাতিক রীতি-নীতি প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে সর্বোত্তম বিধি-বিধান রয়েছে কুরআন মজীদে।

কুরআন মজীদ আল্লাহর কালাম বা বাণীর সযত্ন সংকলন। এ বাণীসমূহ সুদীর্ঘ ২৩ বছরে বিভিন্ন সময়ে রাসূল (স)-এর মাধ্যমে মানুষের নিকট পৌঁছেছে ।

কুরআনুল করীমে আল্লাহকে বলা হয়েছে মালিক এবং মানুষকে বলা হয়েছে বান্দা। মালিক যখন বান্দা বা দাসের নিকট কোনো সংবাদ পৌছানোর ইচ্ছা পোষণ করেন, তখন তিনি একজন দূত বা সংবাদ বাহক প্রেরণ করেন এবং তাঁকে তাঁর নির্দেশাবলী দেন। নির্দেশাবলীর মধ্যেই এমন কতকগুলো বিষয় থাকে যা অনায়াসেই বোধগম্য ও স্পষ্টভাবে প্রকাশমান। এর মধ্যে থাকে পুনরাবৃত্তি এবং প্রকাশভংগীর বিভিন্নতা। তাই দেখা যায় যে, আল্লাহ তাআলা কখনো উত্তম পুরুষে, কখনো আবার তৃতীয় পুরুষে কথা বলেছেন। কুরআনুল করীমের বিভিন্ন স্থানে আল্লাহর স্থলে ব্যবহৃত হয়েছে 'আমি' 'আমরা' এবং 'তিনি'। কিন্তু কোথাও 'তাহারা' ব্যবহৃত হয়নি।

পরিশেষে বলা আবশ্যক যে, কুরআনুল করীম হলো বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ঘটনার প্রেক্ষিতে নাযিলকৃত ওহীসমূহের একটি সংকলন। এর মধ্যে রয়েছে সর্বকালের সকল স্থানের সকল মানুষের সর্বোত্তম পথনির্দেশনা। ইসলাম বা কুরআন সম্পর্কে যিনি প্রথম সবক নিচ্ছেন তাকে অবশ্যই একথাগুলো মনে রাখতে হবে। এর অর্থকে যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করার জন্য গভীর মনোনিবেশ সহকারে বারবার কুরআন মজীদ তেলাওয়াত করতে হবে।

কুরআন মজীদের শব্দ চয়ন এবং বর্ণনার কায়দা অতি উৎকৃষ্টমানের এবং যথার্থই আসমানী বৈশিষ্ট্য সমৃদ্ধ। যারা কুরআনের অর্থ বুঝে না, কুরআনের বাণী হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না, শুধুমাত্র কুরআন তেলাওয়াত শুনেও তাদের অন্তর আলোড়িত ও বিমোহিত হয়। পরিশেষে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, একটি আসমানী কিতাব হিসেবে কুরআন মানুষ ও জ্বিন জাতির প্রতি এ চ্যালেঞ্জ প্রদান করেছে যে, সম্ভব হলে তারা সম্মিলিতভাবে কুরআনের সমতুল্য আয়াত রচনা করুক, বলাবাহুল্য অদ্যাবধি কুরআন মজীদের এ চ্যালেঞ্জেরে কোনো জবাব দেয়া সম্ভব হয়নি।

হাদীস শরীফ

প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ (স) সম্পর্কীয় বর্ণনাকে হাদীস বলে। এ বর্ণনা রাসূল (স) যা বলেছেন বা যা করেছেন সে সম্পর্কে হতে পারে। এমনকি নবী করীম (স)-এর উপস্থিতিতে সাহাবীগণ কোনো কথা বললে বা কাজ করলে এবং তিনি তাতে আপত্তি না জানালে বা তাতে সন্তোষ প্রকাশ করলে তাও হাদীস হিসেবে গণ্য। কোনো কথা বা কাজের ব্যাপারে

প্রিয়নবী (স)-এর এ ধরনের কোনো সম্মতিকে অনুমোদনযোগ্য বলে ধরে নেয়া হয়।

কুরআন শরীফে বহুবার হাদীসের আইনগত গুরুত্ব স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। এরশাদ হয়েছে ঃ

اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ ـ

"আল্লাহর আনুগত্য কর এবং আনুগত্য কর তাঁর রাসূলের।"

–সূরা আন নিসা ঃ ৫৯

وَمَآ اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ ق وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ج

"রাসূল তোমাদের যা দিয়েছেন তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা হতে তোমাদের নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক।"–সূরা হাশর ঃ ৭

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى ○ اِنْ هُوَ اِلاَّ وَحْىٌ يُّوْحٰى

"এবং তিনি মনগড়া কথাও বলেন না। এ তো ওহী যা তার প্রতি প্রত্যাদেশ হয়।"–সূরা আন নাজম ঃ ৩-৪

فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ـ

"রাসূলুল্লাহ (স)-এর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।"

–সূরা আল আহযাব ঃ ২১

অর্থাৎ ইসলামের দৃষ্টিতে রাসূলে করীম (স)-এর সমস্ত কাজ ও কথাই হলো মহান আল্লাহর ইচ্ছার প্রকাশ মাত্র। কখনো কখনো এমন হয়েছে যে, রাসূলে করীম (স) কোনো ওহী পাচ্ছেন না। তখন তিনি নিজের বুদ্ধি-বিবেচনা খাটিয়ে একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। আল্লাহ তাআলার দরবারে এ সিদ্ধান্ত অনুমোদিত না হলে ওহী পাঠিয়ে তা শুধরে দিয়েছেন।

হাদীস শরীফের আর একটি গুরুত্ব এই যে, কোথাও কোথাও কুরআনের বাণী খুবই সংক্ষিপ্তভাবে এসেছে। সে ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ পদ্ধতি ও প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের জন্য তাকে তাকাতে হবে রাসূলে করীম (স)-এর জীবনাচরণের দিকে। নিম্নের বর্ণনা থেকেই বিষয়টি স্পষ্ট হবে। কুরআন মজীদে বলা হয়েছে যে, 'সালাত কায়েম করো।' কিন্তু কিভাবে কোন্ পদ্ধতিতে সালাত কায়েম করতে হবে সে সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি। রাসূলে করীম (স)-ও একদিন সাহাবীগণকে বলেন যে, "আমার দিকে তাকাও। দেখ আমি কিভাবে ইবাদাত করি। আমাকে অনুসরণ করো।"

হাদীসের গুরুত্ব এ কারণে যে, রাসূলে করীম (স) কেবলমাত্র শিক্ষাই দেননি, বরং জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে সে শিক্ষাকে বাস্তবরূপ দিয়েছেন। নবুওয়াত লাভের পর তিনি ২৩ বছর জীবিত ছিলেন। তিনি তাঁর উম্মতগণকে এমন একটি জীবনব্যবস্থা দিয়ে গেছেন যা তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে নিজের জীবনেও পালন করেছেন।

তিনি ছিলেন একটি নতুন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা। রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে তিনি এ রাষ্ট্র শাসন করেছেন। নিশ্চিত করেছেন অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃংখলা, বহির্শত্রুর মুকাবিলায় সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দিয়েছেন, জনসাধারণের মধ্যকার বিবাদ বিসংবাদের মীমাংসা করেছেন, অপরাধীদেরকে দণ্ড দিয়েছেন। তিনি নিজে বৈবাহিক সম্পর্কে আবদ্ধ হয়েছেন, বিশ্ববাসীর জন্য রেখে গেছেন একটি সুখী আদর্শ পারিবারিক জীবনের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এমনিভাবে তিনি মানব জীবনের সকল বিষয় সম্পর্কে প্রয়োজনীয় বিধান দিয়ে গেছেন এবং প্রতিটি বিধানকে নিজের জীবনে রূপায়িত করেছেন পুংখানুপুংখভাবে।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই যে, হযরত মুহাম্মাদ (স) অন্যান্যদের জন্য যে সমস্ত বিধান জারী করেছেন, তিনি নিজেকে কখনো সে সমস্ত আইনের ঊর্ধে বলে ঘোষণা দেননি। বরং প্রতিটি বিধানকে নিজের জীবনে রূপায়িত করেছেন পুংখানুপুংখভাবে। সে কারণেই তাঁর কাজকর্মকে কোনোক্রমেই ব্যক্তিগত আচরণ হিসেবে চিহ্নিত করা যায় না, বরং এটা ছিল তাঁর শিক্ষার বিস্তারিত ব্যাখ্যা এবং বাস্তবরূপ।

মানুষ হিসেবে হযরত মুহাম্মাদ (স) তাঁর কাজের ব্যাপারে ছিলেন খুবই যত্নবান এবং বিনয়ী। আল্লাহর নবী হিসেবে তিনি আল কুরআনকে মানুষের কাছে পৌছে দেয়া এবং এর সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় এবং সাম্ভব্য সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তিনি যদি নিজের বাণীসমূহকে সংরক্ষণের জন্য অনুরূপ ব্যবস্থা নিতেন, তাহলে অনেকেই হয়তো তাঁকে স্বার্থপর, আত্মকেন্দ্রিক বলে আখ্যায়িত করতো। সে কারণেই হাদীস সংরক্ষণের ইতিহাস কুরআন থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।

সরকারী দলীলপত্র

নবী করীম (স)-কে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের ফরমান জারী করতে হয়। যোগাযোগ ও পত্রালাপ করতে হয় বিভিন্ন রাষ্ট্রপতিগণের সাথে। বস্তুতপক্ষে এগুলো ছিল নবী করীম (স)-এর সরকারী দলীলপত্র।

স্বাভাবিকভাবেই এ সমস্ত দলীলপত্র তাঁর জীবদ্দশাতেই লিখিতরূপ লাভ করে।

তারীখে তাবারীর বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, মক্কার মুসলমানগণ স্বদেশবাসী কাফেরদের নির্যাতনে জর্জরিত হয়ে নিরাপদ আশ্রয়ের প্রত্যাশায় আবিসিনিয়া গমন করেন। রাসূলে করীম (স) তখন আবিসিনিয়ার রাজা নাজ্জাশীর কাছে একটি সুপারিশপত্র পাঠিয়ে ছিলেন। হিজরতের পূর্বে রাসূলে করীম (স)-এর লিখিত এ ধরনের আরো কতকগুলো চিঠি ও দলীলপত্রের কথা জানা যায়। অতপর তিনি স্বদেশ ছেড়ে মদীনায় গিয়ে বসতি শুরু করেন। সেখানে তিনি শাসন কাজের সাথে জড়িয়ে পড়লেন। ফলে দিনে দিনে তাঁর লিখিত চিঠিপত্রের সংখ্যা বেড়ে গেল। এসব পত্রের বিষয়বস্তু ছিল বিভিন্ন ধরনের।

মদীনায় আসার পর অল্প সময়ের মধ্যেই সেখানে তিনি একটি নগর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হলেন। মুসলিম ও অমুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরাই ছিলেন রাষ্ট্রের অধিবাসী। রাষ্ট্রের জন্য তিনি একটি লিখিত সংবিধান রচনা করলেন। রাষ্ট্রপ্রধান তথা জনগণের দায়িত্ব কর্তব্যসমূহ অত্যন্ত সুস্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করা ছিলো এ সংবিধানে। রাষ্ট্রীয় কাঠামোর কার্যক্রম এবং বিধি-ব্যবস্থা সম্পর্কেও ধারা সন্নিবেশিত করা হয়। এ লিখিত সংবিধানটি অদ্যাবধি সংরক্ষিত হয়ে আসছে। রাসূলে করীম (স) লিখিতভাবে নগর রাষ্টের সীমানা নির্দিষ্ট করে দেন। একই সময়ে তিনি গোটা মুসলিম জনগোষ্ঠীর জন্য একটি আদম শুমারী করারও নির্দেশ দেন। বুখারী শরীফে বর্ণিত তথ্যানুযায়ী এ আদম শুমারীতে ১৫০০ মুসলমানকে তালিকাভুক্ত করা হয়।

তাছাড়া আরবের বিভিন্ন গোত্রের সাথে মুসলমানদের মৈত্রি ও শান্তি চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিলো। কখনো এ সময় চুক্তিপত্রের দুটো কপি তৈরি হতো। একটি থাকতো মুসলমানদের কাছে অপরটি চুক্তিভুক্ত আরব গোত্রের কাছে। বশ্যতা স্বীকারকারী গোত্র প্রধানদের দেয়া হতো খোলা চিঠি। সমস্ত পত্র তাদের নিরাপত্তা প্রদানের নিশ্চয়তাসহ জমিজমা ও পানি সম্পদের ওপর পূর্বের ভোগ দখলিস্বত্ব দেয়া হতো।

ইসলামী রাষ্ট্রের সম্প্রসারণের সাথে সাথে স্বাভাবিকভাবেই প্রাদেশিক গভর্নরগণের সাথে রাসূল মুহাম্মাদ (স)-এর পত্র যোগাযোগ বৃদ্ধি পায়। এ সমস্ত পত্রে নতুন নতুন আইন-কানুন প্রশাসনিক ব্যবস্থাদি সম্পর্কে নির্দেশ থাকতো। কখনো কখনো অফিসারগণ ব্যক্তিগত উদ্যোগে যে সমস্ত বিচার

বিষয়ক বা প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নিতেন সেগুলোর ব্যাপারেও সংশোধনমূলক পত্র যেতো। কখনো প্রাদেশিক কর্মকর্তাগণ কর এবং অন্যান্য বিষয়ে প্রিয়নবী (স)-এর কাছে পথনির্দেশনা ও পরামর্শ চাইতেন। নিয়মিতভাবে সে সমস্ত বিষয়ের লিখিত জবাব দেয়া হতো।

রাসূলে করীম (স) বিভিন্ন দেশের শাসনকর্তাদের কাছে ইসলাম কবুল করার আহবান জানিয়ে পত্র প্রেরণ করেন। উদাহরণ হিসেবে আরবের বিভিন্ন গোত্রপ্রধান, পারস্যের বাদশাহ, রোমান সম্রাট, আবিসিনিয়ার রাজা নাজ্জাশীর কথা বলা যেতে পারে।

প্রতিটি সামরিক অভিযানের সময় সৈন্য সংগ্রহের পাশাপাশি সৈন্যদের একটি তালিকা প্রস্তুত করা হতো। তাছাড়া অভিযানে অংশগ্রহণকারী সৈন্যগণের মধ্যে সুষ্ঠভাবে বণ্টনের সুবিধার্থে আটককৃত বিষয় সম্পদের একটি বিস্তারিত তালিকা তৈরী করা হতো।

দাসদের মুক্তি এবং ক্রয়-বিক্রয়ের বিষয়টি লিখিত দলীলের মাধ্যমে সম্পাদিত হতো। রাসূলে করীম (স)-এর সাথে সংশ্লিষ্ট ক্রীতদাস মুক্তি সংক্রান্ত অন্তত তিনটি দলীল অদ্যাবধি দেখতে পাওয়া যায়।

প্রসংক্রমে এখানে একটি ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। অষ্টম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের সময়ে রাসূলে করীম (স) আইন-কানুন সম্পর্কে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘোষণা দেন। আবু শাহ নামের একজন ইয়ামনবাসী প্রিয়নবী (স)-এর ঘোষণার একটি লিখিত কপি দাবি করে। রাসূলে করীম (স) তখন উক্ত ঘোষণার একটি কপি যথারীতি লিপিবদ্ধ করে আবু শাহ-এর কাছে হস্তান্তরের নির্দেশ দেন।

নবী করীম (স) সালাতের সূরা কেরআত আরবী ভাষায় পাঠ করার নির্দেশ দেন। এ নির্দেশের সাময়িক ব্যতিক্রম লক্ষ করা গেছে পারস্যের নও-মুসলিমদের ক্ষেত্রে। ঘটনাটি এ রকম, নবী করীম (স)-এর আমলে কিছুসংখ্যক পারস্যবাসী ইসলাম গ্রহণ করে। শুরুতে কুরআন শরীফ পড়তে পারতো না অথবা কুরআন মজীদের অধ্যায় মুখস্থ করেনি অথচ তারা যাকাত আদায়ের ব্যাপারে ছিলো খুবই উৎসাহী। এমতাবস্থায় তাৎক্ষণিক প্রয়োজন মিটানোর জন্য কুরআন মজীদের প্রথম অধ্যায় (সূরা আল ফাতিহা) ফারসী ভাষায় অনুবাদ করা হয়। অনুবাদের দায়িত্ব দেয়া হয় পারস্য ভাষায় পণ্ডিত হযরত সালমান ফারসী (রা)-এর ওপর। কুরআন শরীফ মুখস্থ না করা পর্যন্ত নও মুসলিমগণ অনুবাদের সাহায্যে সালাত আদায় করেন।

রাসূল (স)-এর আমলেই এ জাতীয় অসংখ্য দলীলপত্র তৈরি হয়েছে। এর সংখ্যা কয়েকশত পৃষ্ঠা হবে।

বিশেষভাবে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, জনশিক্ষার ব্যাপারে রাসূল (স) ছিলেন খুবই আগ্রহী। তিনি বলতেন আল্লাহ তাআলা আমাকে পাঠিয়েছেন একজন শিক্ষক বা মুআল্লিম হিসেবে। মদীনায় আসার পর একটি মসজিদ নির্মাণ করাই ছিলো তাঁর প্রধান কাজ। মসজিদের একটি অংশকে তিনি স্কুল হিসেবে ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট করে দেন। এ স্কুলটি সুফ্‌ফা নামে প্রসিদ্ধ। পড়াশুনায় আগ্রহী সাহাবীগণের জন্য এ স্থানটি রাত্রিযাপন এবং দিনের বেলায় শ্রেণীকক্ষ হিসেবে ব্যবহৃত হতো।

দ্বিতীয় হিজরীতে মক্কার কুরাইশ বাহিনী বদরের প্রান্তরে পরাস্ত হয়। অনেকে বন্দী হয় যুদ্ধাপরাধী হিসেবে। রাসূলে করীম (স) নির্দেশ দিলেন, যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে যারা লেখাপড়া জানে তাদের প্রত্যেকে দশজন মুসলমান বালককে লেখাপড়া শিখানোর মাধ্যমে মুক্তিপণ পরিশোধ করতে পারবে। কুরআনুল করীমে আরো নির্দেশ রয়েছে, বাণিজ্যিক ঋণের লেনদেন কেবলমাত্র দুজন সাক্ষীর উপস্থিতিতে লিখিত দলীলের মাধ্যমে সম্পাদিত হতে পারে। এ ধরনের ব্যবস্থার ফলে মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষার দ্রুত প্রসার ঘটে এবং এতে বিস্মিত হওয়ার কোনো কারণ নেই যে, সাহাবীগণ তাঁদের মহান নেতার ঘোষণা ও নির্দেশাবলীকে লিখিতভাবে সংরক্ষণের জন্য পূর্বাপেক্ষা অধিকতর আগ্রহী হয়ে ওঠেন। এ ব্যাপারে সাহাবীদের নিষ্ঠা, আগ্রহ ও উদ্দীপনা ছিল খুবই চমকপ্রদ। নিম্নের ঘটনা থেকে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠবে ঃ

হযরত উমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে, হিজরত করে মদীনায় আসার পর রাসূলে করীম (স) মক্কার মুহাজিরগণের পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে মক্কার মুসলমানগণকে মদীনার মুসলমানগণের সাথে 'ভ্রাতৃত্ব' বন্ধন স্থাপনের নির্দেশ দিলেন। ইতিহাস প্রসিদ্ধ এ নির্দেশ অনুসারে হযরত উমর (রা) মদীনার একজন স্থানীয় মুসলমানের সাথে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হন। তাঁরা দুজনে পালা করে একটি খেজুর বাগানে কাজ করতেন। হযরত উমর (রা) যখন কাজ করতেন, তখন তাঁর সাথী চলে যেতেন রাসূল (স)-এর দরবারে। রাসূলের উপস্থিতিতে তিনি যাকিছু দেখতেন বা শুনতেন, রাতের বেলা হযরত উমর (রা)-এর কাছে তা সবিস্তারে বর্ণনা করতেন। আবার তাঁর যখন খেজুরের বাগানে কাজ করার পালা আসতো, তখন উমর (রা) ঠিক একইভাবে চলে যেতেন রাসূল (স)-এর দরবারে। এভাবেই তাঁরা

রাসূল (স)-এর দরবারে সংঘটিত প্রতিটি বিষয়ে অবহিত থাকতেন। জানতে পারতেন নতুন আইন-কানুন, নির্দেশাবলী, প্রতিরক্ষা সম্পর্কিত জটিলতা, রাজনীতি সংক্রান্ত ব্যবস্থা প্রভৃতি নানা বিষয় সম্পর্কে।

রাসূলে করীম (স)-এর আমলে হাদীস সংকলন

নিম্নোক্ত ঘটনাবলী থেকেই রাসূলে করীম (স)-এর জীবদ্দশায় হাদীসসমূহের লিখিত সংকলন সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য জানা যাবে ঃ

তিরমিযী শরীফে বর্ণিত আছে যে, একদিন মদীনার একজন মুসলিম (আনসার) রাসূলে করীম (স)-এর দরবারে আরজ পেশ করলেন, তাঁর স্মরণশক্তি খুবই দুর্বল। তিনি অল্পতেই প্রিয়নবী (স)-এর নির্দেশমূলক বক্তৃতা ভুলে যান। প্রিয়নবী (স) তখন তাঁকে বললেন—তোমার ডান হাতের সাহায্য নাও (অর্থাৎ লিখে রাখ)।

তিরমিযী, আবু দাউদ এবং আরো অনেক সূত্রে বর্ণিত আছে, মক্কার এক যুবকের নাম ছিল আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা)। রাসূলে করীম (স) যাকিছু বলতেন, আবদুল্লাহ তা লিখে রাখতেন। একদিন তাঁর সংগী-সাথীগণ এ নিয়ে তাঁকে তিরস্কার করে বললেন—প্রিয়নবী (স) কখনো খোশহালে ও সন্তুষ্ট থাকেন। আবার কখনো থাকেন অসন্তুষ্ট। সে কারণেই বিচার-বিশ্লেষণ না করে তাঁর সমস্ত কথাগুলো লিপিবদ্ধ করা প্রত্যাশিত নয়। আবদুল্লাহ (রা) সাথে সাথে প্রিয়নবী (স)-এর কাছে চলে গেলেন। তাঁর সমস্ত বাক্যাবলী কেউ লিখে রাখতে পারে কিনা সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। জবাবে তিনি বললেন, হ্যাঁ। আরো নিশ্চিত হওয়ার জন্য আবদুল্লাহ আবার তাঁকে বললেন—এমন কি তিনি যখন খোশ হন এবং সন্তুষ্ট থাকেন, অথবা তিনি যখন ক্রুদ্ধ থাকেন তখনো কি লিখে রাখা যাবে ? নবী (স) বললেন—অবশ্যই। কয়েক পুরুষ ধরে এ কিতাবটি একটি স্বতন্ত্র পাঠ্যগ্রন্থ হিসেবে পড়ানো হতো। পরবর্তীতে এ গ্রন্থখানি ইবনে হাম্বল (র) এবং অন্যান্যদের বৃহত্তর হাদীস সংকলনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

আদ-দারিমী এবং ইবনে আব্‌দ আল-হাকাম থেকে বর্ণিত আছে যে, একবার আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) বললেন, আল্লাহর শপথ ! এ মুখ থেকে কখনো কোনো মিথ্যা কথা বের হয় না।

আবদুল্লাহ (রা) তাঁর সংকলনটির নাম দেন সহীফা সাদিকা অর্থাৎ সত্যগ্রন্থ। আমর আল আস কয়েকজন ছাত্র পরিবেষ্টিত অবস্থায় বসেছিলেন। একজন তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন রোম অথবা কনস্টান্টিনোপল -এর মধ্যে কোন্ শহরটি প্রথমে মুসলমানদের পদানত হবে ? আবদুল্লাহ তখন একটি পুরাতন বাক্স আনলেন। বাক্সের মধ্য থেকে বের করে নিলেন একটি বই। অল্পক্ষণের মধ্যে তিনি একটি পৃষ্ঠা খুলে পড়তে শুরু করলেনঃ "একদিন আমরা প্রিয়নবী (স)-এর দরবারে বসে ছিলাম। লিখে নিচ্ছিলাম তাঁর কথাগুলো। সে সময়ে একজন জিজ্ঞেস করলেন, রোম অথবা কনস্টান্টিনোপলের মধ্যে কোন্ শহরটি প্রথমে মুসলমানদের পদানত হবে ? রাসূলে করীম (স) উত্তরে বললেন—হারকিউলিসের বংশধরদের শহর।" এ বর্ণনাটি নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করে যে, সাহাবায়ে কেরাম রাসূলে করীম (স)-এর জীবদ্দশাতেই তাঁর কথাগুলো লিপিবদ্ধ করে রাখার জন্য আগ্রহী ছিলেন।

হযরত আনাস (রা)-এর ঘটনাটি আরো গুরুত্বপূর্ণ। মদীনার মুষ্টিমেয় যে কয়েকজন লেখাপড়া জানতেন হযরত আনাস (রা) ছিলেন তাঁদের একজন। আনাস (রা)-এর বয়স যখন মাত্র দশ। তখন তাঁর পিতা তাঁকে প্রিয়নবী (স)-এর ব্যক্তিগত খাদেম হিসেবে তাঁর হাতে তুলে দেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত হযরত আনাস (রা) প্রিয় নবী (স)-এর সাহচর্য পরিত্যাগ করেননি। আনাস (রা) দিনরাত সারাক্ষণ নবীজীর গৃহে থাকতেন। ফলে নবীজীর কাজকর্ম অবলোকন করার এবং তাঁর কথা শুনার যে চমৎকার সুযোগ তিনি পেয়েছিলেন অন্য কারো পক্ষে বাস্তবে তা সম্ভব ছিলো না। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, নবী করীম (স) বলেছেন, "লেখালেখির মাধ্যমে জ্ঞান-বিজ্ঞান আয়ত্ত করো।"

পরবর্তী সময়ে হযরত আনাস (রা)-এর একজন ছাত্র বলেছেন যে, আমরা যখন সংখ্যায় অনেক থাকতাম তখন তিনি তাঁর লিখিত দলীল পত্রের পাতা উল্টাতেন এবং বলতেন ঃ "এগুলো হচ্ছে প্রিয় নবী (স)-এর বাণী, এগুলো আমি নিজ হাতে লিখেছি এবং ভুলত্রুটি সংশোধন করার জন্য তাঁর সামনে পাঠও করেছি।" গুরুত্বপূর্ণ এ উক্তিটি এ স্বাক্ষরই বহন করে যে, রাসূল করীম (স)-এর জীবদ্দশাতে কেবলমাত্র হাদীসগুলো সংকলিত হয়নি, বরং তাঁর দ্বারা এগুলো যথারীতি পরীক্ষাও করা হয়েছিলো। প্রাচীনকালের অনেক লেখকই এ ঘটনার উল্লেখ করেছেন, যেমন—আর রামহুল মাযী (ওফাত আনুমানিক ৩৬০ হি) ; আল-হাকিম

(ওফাত ৪০৫ হি) ; আল খাতিব আল-বাগদাদী (ওফাত ৪৬৩) এবং এ শ্রেষ্ঠ হাদীসবেত্তাগণ আদি সূত্র থেকে তা গ্রহণ করেন।

সাহাবায়ে কেরামের আমলে হাদীস সংকলন

এটা স্বাভাবিক যে, রাসূলে করীম (স)-এর ওফাতের পর তাঁর জীবন চরিত সম্পর্কে জানার আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। সাহাবায়ে কেরাম নবীজী সম্পর্কে যা জানতেন তা তাঁদের সন্তান-সন্ততি ও আত্মীয়-স্বজনের জন্য লিখে রেখে যান। বিশেষ করে নবদীক্ষিত মুসলমানগণের মধ্যে তাঁদের ধর্ম এবং ধর্মের উৎস সম্পর্কে জানাব আগ্রহ ছিলো অত্যধিক। অপরদিকে মৃত্যুজনিত কারণে প্রত্যক্ষভাবে হাদীস সম্পর্কে অভিজ্ঞ সাহাবীগণের সংখ্যা দিনে দিনে হ্রাস পেতে থাকে। এমতাবস্থায় সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে তখনো যাঁরা জীবিত ছিলেন তাঁরা খুবই তৎপর হন এবং হাদীস সংরক্ষণের ব্যাপারে গভীর মনোযোগী হন। ফলে সাহাবায়ে কেরামের বর্ণনার ভিত্তিতে রাসূলে করীম (স)-এর বাণী এবং কর্ম সম্পর্কে বহু সংখ্যক সংকলন তৈরি করা হয়।

রাসূলে করীম (স) আমর ইবনে হাজম (রা)-কে ইয়ামনের গভর্নর হিসেবে মনোনয়ন দেয়ার পাশাপাশি প্রশাসনিক দায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কে একটি লিখিত নির্দেশনা প্রদান করেছিলেন। আমর (রা) অতি সযত্নে এ নির্দেশনামাটি সংরক্ষণ করেছিলেন। রাসূলে করীম (স) জুহাইনা, জুযাম, তাঈ, ছাকীফ প্রভৃতি গোত্রসমূহের নিকট অনেকগুলো পত্র লিখেছিলেন। আমর (রা) এ জাতীয় ২১টি পত্র সংগ্রহ করেন। পরে তিনি এগুলোকে সরকারী দলীল পত্রের আকারে সংকলন করেন। সংকলনটি বর্তমান সময়েও সযত্নে সংরক্ষিত রয়েছে।—(ইবনে তুলুন-এর ই'লৃম আস সাইলিনে দেখা যেতে পারে।)

সহীহ মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে, জাবির ইবনে আবদুল্লাহ হজ্জ বিষয়ক একখানি সংকলন প্রণয়ন করেন প্রিয়নবী (স)-এর বিদায় হজ্জ এবং বিদায় হজ্জের খুতবা প্রদানের বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরেন। বিভিন্ন সূত্রমতে জানা যায় যে, জাবিরের সহীফাখানা ছিলো তাঁর ছাত্রদের একেবারে কণ্ঠস্থ। সম্ভবত রাসূলে করীম (স)-এর দৈনন্দিন কার্যাবলী এবং বাণীসমূহ ছিলো সহীফার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

সামুরাহ ইব্‌নে জুনদুব (রা) ও সা'দ ইবনে উবাদাহ (রা) নামে দু'জন সাহাবীও তাঁদের সন্তানদের জন্য দুটি হাদীস গ্রন্থ সংকলন করেছিলেন।

ইবনে হাজার-এর বর্ণনামতে সামুরা (রা)-এর সংকলনটির কলেবর ছিলো বেশ বড়।

রাসূলে করীম (স)-এর ওফাতের সময় আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) ছিলেন বেশ ছোট। কিন্তু বয়োজ্যেষ্ঠ সাহাবায়ে কেরামের কাছ থেকে শুনে শুনে তিনি অনেক বিষয় মুখস্থ করে ফেলেছিলেন। পরবর্তীতে এ সমস্ত বিষয়গুলো নিয়েই অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করেন। ঐতিহাসিকদের মতে ইবনে আব্বাস (রা) এতো বেশি গ্রন্থ রচনা করেছেন যে, ইন্তেকালের সময় এগুলোর পরিমাণ একটি উটের বোঝার সমান ছিলো।

রাসূলে করীম (স)-এর সাহাবীগণের মধ্যে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) ছিলেন একজন খ্যাতনামা আইনবিদ। তিনিও হাদীসের একটি গ্রন্থ সংকলন করেন। পরবর্তী সময়ে তাঁর ছেলে আবদুর রহমান প্রায়ই বন্ধু-বান্ধবগণকে এ গ্রন্থটি দেখাতেন।

বুখারী শরীফে উল্লেখ আছে, হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা), আবু বাকরাহ (রা) এবং মুগীরা ইবনে শুবাহ (রা) পত্র লেখালেখির মাধ্যমেও হাদীস শিক্ষা দিতেন অর্থাৎ কেউ রাসূলে করীম (স) সম্পর্কে কিছু জানতে চাইলে তাঁরা লিখিতভাবে তা জানাতেন। তাছাড়া অনেক সরকারী কর্মকর্তা এবং পরিচিতজনেরা তৎকালীন সময়ের অনেক সমস্যা সম্পর্কে প্রিয়নবী (স)-এর সিদ্ধান্ত সম্পর্কে জানতে চাইতেন। সাহাবীগণ লিখিতভাবে এ সমস্ত জিজ্ঞাসার জবাব দিতেন।

হাদীস সংকলন প্রসংগে নিম্নের বর্ণনাটি খুবই শিক্ষাপ্রদ। বিভিন্ন সূত্রে এটা বর্ণিত হয়েছে। হযরত আবু হুরাইরা (রা) তখন বয়সের ভারে নুয়ে পড়েছেন । স্মরণশক্তিও বেশ হ্রাস পেয়েছে। এমনি পরিস্থিতিতে একদিন তাঁর একজন ছাত্র তাঁকে বললেন—আপনি আমাকে অমুক অমুক বিষয়ে বলেছিলেন। হযরত আবু হুরাইরা (রা) হাদীসটি মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানালেন। এতদসত্ত্বেও তাঁর ছাত্র দৃঢ়তার সাথে বলতে লাগলেন যে, হাদীসটি সে তাঁর নিকট থেকেই শিখেছে। হযরত আবু হুরাইরা (রা) তখন বললেন, হাদীসটি যদি আমার নিকট থেকে শিখে থাক তাহলে অবশ্যই হাদীসটি আমার কাছে লেখা থাকবে। অবশেষে তিনি ছাত্রকে নিয়ে গেলেন নিজের ঘরে। সেখানে তিনি তাঁকে দেখিয়ে দিলেন অনেকগুলো হাদীস গ্রন্থ। খোঁজাখুজি করার পর উল্লেখিত হাদীসটি ঠিকই তাঁর লিখিত গ্রন্থের মধ্যে পাওয়া গেল। অবশেষে আনন্দের সাথে বললেন—বলেছিলাম না যে, হাদীসটি আমার নিকট শিখে থাকলে

অবশ্যই তা আমার কাছে লেখা থাকবে। এখানে বিশেষভাবে স্মরণ রাখতে হবে যে, এক বর্ণনায় "অনেকগুলো গ্রন্থের" কথা বলা হয়েছে।

হযরত আবু হুরাইরা (রা) ৫৯ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। ইমাম ইবনে মুনাববিহ নামের একজন ছাত্রকে তিনি ১৩৮টি কিতাব দিয়েছিলেন। হিজরী প্রথম শতাব্দীর প্রথমার্ধেই এগুলো সংকলিত হয়েছে। পরবর্তী সময়ে হাদীসের যে সংকলন তৈরী হয়েছে, তার সাথে পূর্বের সংকলনগুলো তুলনা করা হয়েছে। তা থেকে এটা স্পষ্ট প্রমাণিত যে, প্রাথমিক যুগেই ভাবী বংশধরগণের জন্য হাদীসসমূহ খুবই যত্ন ও নিষ্ঠার সাথে সংরক্ষণ করা হয়েছিলো।

ইমাম আয যাহাবী 'তাযকিরাতুল হুফফায' গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, খলীফা হযরত আবু বকর (রা) ৫০০ হাদীসের একটি সংকলন গ্রন্থ গ্রন্থনা করেছিলেন। অতপর তিনি সংকলনটি তুলে দেন কন্যা আয়েশা (রা)-এর হাতে। কিন্তু পরদিন প্রত্যুষেই তিনি তা ফিরিয়ে নেন এবং একথা বলে তিনি সংকলনটি বিনষ্ট করে ফেলেন যে, আমি যা বুঝেছি এখানে তাই লিখেছি, এমনও তো হতে পারে যে, এখানে এমন বিষয় আছে যেগুলো রাসূলে করীম (স)-এর বক্তব্যের বিষয়বস্তুর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় অর্থাৎ এ ধরনের একটি সন্দেহের কারণে তিনি সংকলনটি সংরক্ষণ করেননি।

মা'মার ইবনে রশীদের বিশ্বস্ত বর্ণনা থেকে আমরা জানতে পারি যে, হযরত উমর (রা) যখন মুসলিম জাহানের খলীফা তখন তিনি একবার হাদীসসমূহ লিপিবদ্ধ করার ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের সাথে পরামর্শ করেছিলেন। প্রত্যেকেই তাঁর এ প্রস্তাবে সম্মতি প্রকাশ করেন। হযরত উমর (রা)-এর দ্বিধা-সংশয় তবু কাটে না এবং সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে আল্লাহর সাহায্য চেয়ে গোটা একটি মাস আল্লাহর দরবারে মুনাজাত করেন। অবশেষে তিনি কাজটি হাতে না নেয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেন এবং বলেন, পূর্বপুরুষেরা আসমানী গ্রন্থকে অবহেলা করেছে, তারা দৃষ্টিনিবদ্ধ করেছে কেবলমাত্র নবী-রাসূলগণের আচরণের ওপর। আসমানী কিতাব আল কুরআন এবং প্রিয়নবী (স)-এর হাদীসের মধ্যে কোনো বিভ্রান্তি সৃষ্টি হতে পারে এমন কোনো সম্ভাবনার ক্ষেত্র আমি তৈরী করতে চাই না।

যা হোক, পরবর্তীকালে লিখিত দলীলপত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, রাসূলে করীম (স)-এর অন্তত ৫০ জন সাহাবী হাদীস লিপিবদ্ধ করেছেন।

হাদীস লেখার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা

হাদীস লেখার ব্যাপারে এ রকম একটি ধারণা চালু রয়েছে, নবী করীম (স) হাদীস লিপিবদ্ধ করতে নিষেধ করেছেন। এ ধারণার প্রকৃত তাৎপর্য উদঘাটনের ক্ষেত্রে হযরত আবু বকর (রা) এবং হযরত উমর (রা)-এর উপরিউক্ত বিবরণ দুটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তবে এ প্রসঙ্গে স্মরণ রাখতে হবে যে, হযরত আবু বকর (রা) ও হযরত উমর (রা)-ও হাদীস সংকলন তৈরির উদ্যোগ নিয়েছিলেন। সত্যিকার অর্থেই যদি হাদীস সংকলনের ব্যাপারে প্রিয়নবী (স) কোনো নিষেধাজ্ঞা জারী করতেন, তাহলে প্রথম সারির এ দুজন সাহাবী অন্তত হাদীস সংকলনের উদ্যোগ নেয়ার সাহস করতেন না। তাঁরা যুক্তি না দিয়ে রাসূলে করীম (স)-এর নিষেধাজ্ঞার কথা বলেই হাদীস লিপিবদ্ধ করণে আগ্রহী সাহাবায়ে কেরামকে নিরুৎসাহিত করতেন।

কুরআন ছাড়া অন্য কিছু লিখে রাখার ব্যাপারে রাসূলে করীম (স)-এর নিষেধাজ্ঞা জারীর বিষয়টি কেবলমাত্র তিনজন বর্ণনাকারী থেকেই জানা যায়। এঁরা হলেন হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা), হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রা) এবং হযরত আবু হুরাইরা (রা)। কিন্তু কোন্ ঘটনার প্রেক্ষিতে এ নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়েছিলো, অথবা প্রসংগটাই কি ছিল তা জানা যায়নি। এখানে অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে যে, হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) এবং হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রা) সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে বয়সে তরুণ ছিলেন। ৫ হিজরীতে তাঁদের বয়স ছিলো বড়জোর ১৫ বছর। তাঁদের মেধা এবং বুদ্ধিমত্তা যতই প্রখর হোক না কেন, এটা সহজেই বোধগম্য যে, হিজরতের পরপরই প্রিয়নবী (স) তাঁদেরকে তাঁর বাণীসমূহ লিপিবদ্ধ করতে নিষেধ করেছিলেন। হযরত আবু হুরাইরা (রা)-এর ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে, তিনি হাদীসের অনেকগুলো সংকলন গ্রন্থ তৈরী করেছিলেন। ইতিহাস পাঠে জানা যায়, হযরত আবু হুরাইরা (রা) ছিলেন দীনদার পরহেযগার অতিমাত্রায় শুদ্ধাচারী এবং দৃঢ়চিত্তের অধিকারী। এ ধরনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে তিনি যদি রাসূলে করীম (স)-এর নিকট থেকেও এ নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়ার ব্যাপারে নিশ্চিতভাবে না জানতেন তাহলে অবশ্যই তিনি হাদীস সংকলন করতেন না। হযরত আবু হুরাইরা (রা) ইসলাম কবুল করার জন্য সপ্তম হিজরীতে ইয়ামন থেকে মদীনায় এসেছিলেন। এটা এমন কোনো বিচিত্র ব্যাপার নয় যে, ইসলাম গ্রহণের পরপরই কুরআন ছাড়া অন্য কিছু লিখতে রাসূলে করীম (স) তাঁকে নিষেধ করেছিলেন। পরবর্তীতে যখন তিনি কুরআন চর্চায়

দক্ষতা অর্জন করেন, কুরআন ও হাদীসের মধ্যে অনায়াসে পার্থক্য নিরূপণ করতে সমর্থ হন, তখনই হাদীস লিপিবদ্ধ করার ব্যাপারে রাসূল (স)-এর নিষেধাজ্ঞা উঠে যায়।

এ প্রসংগে আরো একটি বিষয় বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। জানা যায় যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-ও লিখিতভাবে হাদীস সংকলন করা অনুচিত বলে অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন। অবশ্য রাসূলে করীম (স)-এর সূত্র ধরে তিনি কথা বলেননি, এটা ছিলো তাঁর একান্তই ব্যক্তিগত অভিমত। এতদসত্ত্বেও আমরা দেখতে পাই যে, হাদীস লিপিবদ্ধ করার ব্যাপারে তিনি ছিলেন অন্যান্য সাহাবীগণের চেয়ে অনেকখানি অগ্রসর।

উল্লেখিত সাহাবীগণ ছিলেন খুবই দীনদার, নিষ্ঠাবান এবং রাসূলুল্লাহ (স)-এর নির্দেশাবলী পালনের ব্যাপারে খুবই যত্নশীল। এমতাবস্থায় হাদীস লিপিবদ্ধ করার ব্যাপারে তাঁদের কথা ও কাজে আপাত দৃষ্টিতে বৈপরিত্য মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তা নয়। ওপরে বর্ণিত তথ্যাদি থেকে অনায়াসেই এ ধারণায় উপনীত হওয়া যায় যে, একটি বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে প্রিয়নবী (স) হাদীস লিখতে নিষেধ করেছিলেন। অবশ্য তাঁদের বর্ণনায় সেই বিশেষ অবস্থাটি স্থান পায়নি। ফলে এ সম্পর্কে আমরা কিছুই জানতে পারি না। তবে এ নিষেধাজ্ঞা সীমিতসংখ্যক লোকের জন্য প্রযোজ্য ছিলো। নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত তিনটি বর্ণনার মধ্যে হযরত আবু হুরাইরা (রা) এবং হযরত যায়েদ বিন সাবিত (রা)-এর বর্ণনাকে দুর্বল বলে ধরে নেয়া যায়। কারণ হাদীস সংকলনের নীতি অনুসারে কোনো হাদীস প্রথম শ্রবণকারীর সূত্রে বর্ণিত না হয়ে পরবর্তী সূত্রের বরাত দিয়ে বর্ণিত হলে হাদীস বা বর্ণনাটি দুর্বল বলে পরিগণিত হয়। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা)-এর বর্ণনাটি কেবলমাত্র সহীহ মুসলিম শরীফে স্থান পেয়েছে। এমনকি অন্যতম হাদীস বিশেষজ্ঞ ইমাম বুখারী (র) এ বিবরণটি বিবেচনার মধ্যে আনেননি। তাঁর মতে এটা রাসূলে করীম (স)-এর নির্দেশ ছিলো না, বরং এটা ছিলো হযরত আবু সা'ঈদ খুদরী (রা)-এর নেহায়েত ব্যক্তিগত অভিমত। এতদসত্ত্বেও কেউ যদি উপরিউক্ত বর্ণনার মধ্যে যে দুর্বলতা আছে তা উপেক্ষা করে এবং হাদীস লিপিবদ্ধ করার ব্যাপারে রাসূলে করীম (স)-এর নিষেধাজ্ঞাকে সত্য বলে ধরে নেয়, তাহলে সে হাদীস লিপিবদ্ধ করার ব্যাপারে স্বাভাবিকভাবেই পরস্পর বিরোধী দুটি মতের মুখোমুখি হবে। এমতাবস্থায় তাকে দুটো মতকে প্রত্যাখ্যান না করে বরং এ বিরোধের একটি মীমাংসায় পৌঁছতে হবে।

পরস্পর বিরোধী এ অবস্থায় সম্ভাব্য তিনটি ব্যাখ্যা দেয়া যেতে পারে

ক. নিষেধাজ্ঞার বিষয়টি ব্যক্তি বিশেষের জন্য প্রযোজ্য ছিলো। যারা সবেমাত্র লেখাপড়া শিখেছেন, অথবা যারা সম্প্রতি ইসলামের পতাকাতলে শামিল হয়েছেন এবং কুরআন ও হাদীসের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করার মতো দক্ষতা অর্জন করেননি। হাদীস লিপিবদ্ধ করার ব্যাপারে এ নিষেধাজ্ঞা ছিলো কেবলমাত্র তাদের জন্য। কিন্তু পরবর্তীতে যোগ্যতা অর্জনের সাথে সাথে নিষেধাজ্ঞাও তুলে নেয়া হয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে যে, হযরত আবু হুরাইরা (রা) ইয়ামন থেকে এসেছিলেন। মুসনাদ বা হিমারী ভাষার ওপর তাঁর চমৎকার দখল ছিলো। কিন্তু মক্কা-মদীনার প্রচলিত লিপিতে অতটা ব্যুৎপত্তি ছিলো না।

খ. এ নিষেধাজ্ঞার উদ্দেশ্য হয়তো এ ছিলো, যে পত্রে কুরআন মজীদের কোনো অধ্যায় বা আয়াত লেখা হবে, সে পত্রে হাদীস লেখা হবে না। কুরআন এবং হাদীসের মধ্যে সম্ভাব্য সংমিশ্রণের সম্ভাবনা পরিহার করার জন্যই এমনটি করা হয়েছিলো। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) পরোক্ষ-ভাবে এ বিষয়টির প্রতিই ইংগিত করেছেন। একই পত্রে কুরআন ও হাদীস না লেখার জন্য খলীফা হযরত উমর (রা) সরকারী নির্দেশও জারি করেন।

গ. এমনও হতে পারে যে, এ নিষেধাজ্ঞা নবী করীম (স)-এর বিশেষ কতকগুলো বক্তৃতার জন্য প্রযোজ্য ছিলো। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে, যে সমস্ত ক্ষেত্রে তিনি ইসলামের ভবিষ্যত এবং রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিজয় সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন সেগুলো লিপিবদ্ধ করতে তিনি নিষেধ করেছিলেন। কারণ এ ধরনের ভবিষ্যদ্বাণীগুলো অনেকের অন্তরেই এ রকম বিশ্বাস জন্মাতে পারে যে, বিষয়টি পূর্ব থেকেই নির্ধারিত। তখন হয়তো, অনেকেই উদ্যোগ নেয়া থেকে বিরত থাকবে। হয়তো তাদের উদ্যমে ভাটা পড়বে।

এ ধরনের আরো কিছু ব্যাখ্যা দেয়া যেতে পারে, কিন্তু বর্তমান আলোচনার জন্য এটুকুই যথেষ্ট।

পরবর্তী শতাব্দীতে হাদীস সংকলন

গোড়ার দিকে হাদীস সংকলনগুলো ছিলো সংক্ষিপ্ত। এগুলো সংকলিত হতো ব্যক্তি পর্যায়ে। অর্থাৎ সাহাবীগণের নিজেদের স্মরণে যা আসতো তাই তাঁরা লিখে রাখতেন। পরবর্তী সময়ে ছাত্রগণ একাধিক শিক্ষকের

বক্তৃতা অনুষ্ঠানে হাজির হতে শুরু করেন। তখন তাঁদের পক্ষে অনেক শিক্ষকের স্মৃতি থেকে সংগৃহীত হাদীসের সমন্বয়ে বৃহৎ সংকলন প্রস্তুত করা সম্ভব হয়ে ওঠে। তাছাড়া বিভিন্ন সূত্রের বর্ণনায় যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় তাও তাঁরা সযত্নে লিখে রাখেন এবং কয়েক পুরুষ পরে সাহাবায়ে কেরামের এ সমস্ত স্মৃতিকথাগুলো একত্রিত করা হলো। তারও কিছুকাল পরে হাদীসগুলো বিষয়ভিত্তিক শ্রেণীবিন্যাস করার উদ্যোগ নেয়া হয়। এগুলো থেকেই বিধি-বিধান প্রণীত হয়, বিকশিত হয় ইলমে ফিক্হ, ইল্মে তাসাউফ প্রভৃতি।

ছাত্রদেরকে কুরআন শরীফের মতো প্রতিটি হাদীস মুখস্থ করতে হতো। মুখস্থ করার সুবিধার্থে তাঁরা লিখিত হাদীসের সাহায্য নিতেন। তাছাড়া যোগ্য এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষকের নিকট থেকে শিক্ষা গ্রহণ করাই ছিলো পূর্বশর্ত। হাদীস সংরক্ষণ এবং নিরাপত্তা বিধানের এ তিনটি পদ্ধতিকে অনেকে খুবই কঠোরভাবে মেনে চলতেন। কেউ কেউ আবার এ পদ্ধতি-গুলো অনুসরণের ব্যাপারে এতটা কঠোর ছিলেন না। সে কারণে শিক্ষকগণের গুণগত মান এবং বিশ্বাসযোগ্যতার মধ্যে তারতম্য পরিলক্ষিত হয়।

প্রিয়নবী (স)-এর ওফাতের অনতিকাল পরেই হাদীস লিপিকারগণ কোনো হাদীসের মূল বর্ণনাকারী হিসেবে কেবলমাত্র রাসূলে করীম (স)-এর নামই উল্লেখ করতেন না, বরং যার পরে যিনি এ হাদীসটি পুনরাবৃত্তি করেছেন, তাঁদের নামও ধারাবাহিকভাবে লিপিবদ্ধ করতেন। উদাহরণ হিসেবে ইমাম বুখারী (র)-এর হাদীস লেখার রীতি উল্লেখ করা যেতে পারে। কোনো হাদীস লিপিবদ্ধ করার সময় তিনি লিখেন ঃ আমার শিক্ষক ইবনে হাম্বল বলেছেন, আমি আমার শিক্ষক আবদুর রায্যাককে বলতে শুনেছি, আমার শিক্ষক মা'মার ইবনে রশীদ আমাকে বলেছেন, আমি রাসূল করীম (স)-কে অমুক অমুক কথা বলতে শুনেছি। এভাবেই প্রতিটি হাদীসের বর্ণনাকারীগণের নাম আনুক্রমিকভাবে সবিস্তারে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। কেবলমাত্র সহীহ আল বুখারীর ক্ষেত্রেই নয়, অন্যান্য হাদীস গ্রন্থসমূহের বেলায়ও এ একই রীতি অনুসৃত হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে ইমাম হাম্বল (র)-এর মুসনাদ, আবদুর রায্যাক-এর মুসান্নাফ, মা'মার-এর জামে' এবং সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা (রা)-এর নির্দেশনায় সংকলিত হাম্মামের সহীফার উল্লেখ করা যেতে পারে। সৌভাগ্যবশত সবগুলো হাদীস গ্রন্থই অপরিবর্তিত এবং অবিকলভাবে আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। হাদীসসমূহ যথাযথ পরীক্ষা-নিরীক্ষা পূর্বক আনুক্রমিক সূত্রসহ

লিপিবদ্ধ হয়েছে। তাই এরূপ হাদীসসমূহের অকাট্যতা ও বিশুদ্ধতা সম্পর্কে কোনোরূপ সন্দেহ পোষণ করা কিংবা বানোয়াট বলে ধারণা পোষণ করা রীতিমত বোকামী হবে।

উপসংহার

মুখস্থকরণ, লিপিবদ্ধকরণের মাধ্যমে সংরক্ষণ এবং যোগ্য শিক্ষকগণের তত্ত্বাবধানে চর্চা-এ তিনটি পদ্ধতিকে বলা যেতে পারে ইসলামী শিক্ষার রক্ষাকবচ। পদ্ধতিগুলো মূলত পরস্পরের সম্পূরক। এগুলোর কারণেই আবির্ভাবকাল থেকে এ পর্যন্ত ইসলামী শিক্ষা যথাযথভাবে সংরক্ষিত হয়ে আসছে। কুরআন ও হাদীস উভয়ের ক্ষেত্রে একথা সত্য। কুরআন মজীদ হচ্ছে আল্লাহর কালাম। অপরদিকে হাদীস শরীফ সংকলিত হয়েছে সাহাবায়ে কেরামের বর্ণনার ওপর ভিত্তি করে। সাহাবীগণের বর্ণনার মধ্যে রয়েছে রাসূল (স)-এর বাণী, তাঁর কর্ম এবং রাসূল (স) কর্তৃক অনুমোদিত সাহাবীগণের আমল-আখলাকসমূহ।

এখানে বলা আবশ্যক যে, দীনের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে রাসূলে করীম (স)-এর সফলতা বর্ণনা করে শেষ করা যায় না। সফলতার নজীর হিসেবে দশম হিজরীতে মক্কার আরাফাত ময়দানে বিশাল সমাবেশে প্রদত্ত ভাষণের উল্লেখ করা যেতে পারে। হজ্জ পালনরত সেই সমাবেশে প্রায় ১,৪০,০০০ লোক উপস্থিত ছিলেন। এখানে উল্লেখ্য, ১,৪০,০০০-এর বাইরে আরো অনেকে ছিলেন যারা সে বছর মক্কায় আসেননি।

রাসূলে করীম (স)-এর সাহাবীগণের জীবনী লেখকগণ অত্যন্ত নিশ্চিত-ভাবে উল্লেখ করেছেন যে, এক লক্ষের বেশি সাহাবী রাসূলে করীম (স)-এর জীবনের অন্তত একটি ঘটনা সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। বর্ণনার মধ্যে অবশ্য অনেক পনুরাবৃত্তি রয়েছে এবং একথা সত্য যে, একটি ঘটনা বহুসূত্রে বর্ণিত হওয়ার কারণে প্রকৃতপক্ষে ঘটনার বিশ্বাসযোগ্যতা বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। সকল প্রকার পুনরাবৃত্তি বাদ দিলেও মোটামুটিভাবে দশ হাজার হাদীস সম্পর্কে আমরা জানতে পারি। জাগতিক এবং আধ্যাত্মিক বিষয়ে সাহাবায়ে কেরামকে দেয়া প্রিয়নবী (স)-এর নির্দেশ ও পরামর্শসহ জীবনের সকল বিষয় হাদীসগুলোতে স্থান পেয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়

ইসলামের দৃষ্টিতে মানব জীবন

মানুষ সাধারণত নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকে। এরপরই সে নজর দেয় আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি। অপরের জন্য সে খুব কমই ভাবে। তবু প্রত্যেক যুগেই মানব জাতির মধ্যে কিছু কিছু অগ্রসর সভ্য জনগোষ্ঠী দেখা যায়। আবার এটাও সত্য যে, পর্যালোচনা করলে হয়তো দেখা যাবে, একটি বিশেষ যুগে একটি দল সভ্যতার পথিকৃৎ হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। কিন্তু তার অর্থ এ নয় যে, সমসাময়িক কালের অন্যান্য জনগোষ্ঠীগুলো আদিম বা বর্বর অবস্থায় ছিলো। মিসরীয়রা যখন বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠা লাভ করে তখন হয়তো সমসাময়িক কালের অনেক জাতিই ছিলো তাদের মতো সভ্য। আরবে ইসলামী সভ্যতার উন্মেষকালে গ্রীক, রোমান, চৈনিক, ভারতীয় ও অন্যান্যদের মধ্যে সভ্য জাতির বৈশিষ্ট্য থাকা সত্ত্বেও তারা কেউ সভ্যতার নিশানবরদার হতে পারেনি।

স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠবে, একটি জাতির ক্রমবিকাশের ধারা দ্রুত হয় কেমন করে? অথবা অন্যান্যদের অগ্রগতির ধারা কেনই বা এত দ্রুত। একটি যুগে গ্রীক সভ্যতা যখন গৌরবোজ্জ্বল সভ্যতার ধারক, পশ্চিম ইউরোপ তখন কেন বর্বরতায় নিমজ্জিত ছিল? একই প্রশ্ন উঠতে পারে বিভিন্ন যুগের অন্যান্য সভ্যতার ক্ষেত্রে।

আসলে সভ্যতার বিষয়টি কি কেবলমাত্র সুযোগ ও পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে? অথবা এটা কি এ জন্য যে, একটি জনগোষ্ঠীতে বিশেষ কোনো মহৎ ব্যক্তি জন্ম নেন যা অন্য কোনো জনগোষ্ঠীর ভাগ্যে জোটে না? বিভিন্ন জাতি বা জনগোষ্ঠীর উন্নতির বা পশ্চাদপদতার আরো অনেক কারণ থাকতে পারে। এ কারণগুলো একটি জাতিকে অনেকখানি প্রভাবিত করে। আবার অন্যান্য জাতিকে করে তোলে হতাশাগ্রস্ত। এমন কি প্রসারিত করে দেয় তাদের নির্মূল হওয়ার পথকে। একটি জাতির উন্নতির শিখরে অবস্থানের পর আবার কেন তার পতন ঘটে? প্রায় বর্বরতার পর্যায়ে নেমে না এলেও কেন ম্লান হয়ে আসে তার গৌরবজ্জ্বল দীপ্তি?

সমসাময়িককালের ইসলামী সভ্যতার প্রেক্ষাপটেও কারণগুলো বিশ্লেষণ করে দেখা যেতে পারে, পর্যালোচনা করে দেখা যেতে পারে ইসলামী সভ্যতার টিকে থাকার সম্ভাবনার বিষয়টি।

আমরা যদি ইবনে খালদুনের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ পর্যালোচনা করি তাহলে দেখতে পাবো জীব তাত্ত্বিক বিষয়টি হচ্ছে একটি অপরিহার্য কারণ। একটি প্রজন্মের শেষ পর্যায়ে একটি জাতি তার প্রাণশক্তি নিঃশেষ করে ফেলে, তখন সেই জাতির মধ্যে প্রাণশক্তি ফিরিয়ে আনার জন্য অন্ততপক্ষে নেতৃত্বের শীর্ষে বড় ধরনের পরিবর্তন জরুরী হয়ে পড়ে। এ জাতিতাত্ত্বিক মতবাদকে পাণ্ডিত্যপূর্ণ অতিশয়োক্তি বলে মনে হতে পারে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে গোষ্ঠীগত সভ্যতা এবং যে সমস্ত ধর্মে ধর্মান্তকরণের অনুমোদন নেই তাদের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে।

ইসলাম সর্বপ্রকার অবক্ষয় চক্র থেকে একেবারে মুক্ত। সকল গোত্রের সকল বর্ণের মধ্যে রয়েছে ইসলামের অনুসারীরা। বিশ্বের সর্বত্র রয়েছে তাদের অব্যাহত অগ্রযাত্রা। কোথাও এ অগ্রযাত্রার পরিমাণ কম, কোথাও বা বেশি। তা ছাড়া এটা সর্বজনস্বীকৃত যে, ইসলাম মুসলিম উম্মাহর মধ্য থেকে সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করে দিয়েছে জাতিগত কুসংস্কারকে। এটা এমন একটা বৈশিষ্ট্য যা মুসলমানদের নিঃসংশয়ে যে কোনো গোত্রের বা বর্ণের লোকদের নেতা বা ইমাম হিসেবে গ্রহণ করার সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়।

নিয়মতান্ত্রিকভাবে দাসপ্রথা উচ্ছেদের ব্যাপারে কুরআনুল করীমে জোর তাকীদ রয়েছে। বস্তুতপক্ষে এটাও ইসলামের একটি উজ্জ্বল নিদর্শন। ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, মুসলমান শাসকদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত দাস।

একটি সভ্যতার অগ্রগতি বা অবক্ষয় তার মৌলিক শিক্ষার গুণগত মানের ওপর নির্ভর করে। কোনো সভ্যতা যদি তার অনুসারীদেরকে বৈরাগ্য সাধনে অনুপ্রাণিত করে তাতে আধ্যাত্মিকতায় প্রভূত উন্নতি হলেও মানুষের অন্যান্য অংগ-প্রত্যঙ্গ ও বৃত্তিসমূহ যেমন—দেহ, তার বৌদ্ধিক বৃত্তি প্রভৃতি মেনে নেবে না। এমন কি এ বৃত্তিগুলোর বিকাশের সময় আসার পূর্বেই ওগুলোর অপমৃত্যু ঘটবে।

অপরদিকে কোনো সভ্যতা যদি কেবলমাত্র মানব জীবনের বস্তুগত বিষয়ের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে, তাহলে অন্যান্য বৃত্তিগুলোর বিনিময়ে হয়তো তারা বস্তুগত ব্যাপারে প্রভূত অগ্রগতি সাধনে সক্ষম হবে। অবশেষে এ ধরনের সভ্যতা ব্যুমেরাং হয়ে নিজেই নিজের মৃত্যুর কারণ হতে পারে। কারণ বস্তুবাদ মানুষের অহংবোধ বাড়িয়ে দেয়। কমিয়ে দেয় অপরের অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ। এভাবেই সৃষ্টি হয় পরস্পরের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং শত্রুতা। প্রত্যেকেই পরস্পরের ওপর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য

সুযোগের অপেক্ষায় থাকে। পরিণতিতে এটাই পরস্পরের ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এ প্রসংগে একটি অতি পরিচিত কাহিনী আছে। দুই দস্যুর কাহিনী। দুই দস্যু একবার ডাকাতি করে কিছু সম্পদ দখল করলো, তারপর খাবার কেনার জন্য দুজনের একজন বাজারে গেলো। অপরজন বেরিয়ে পড়লো কাঠের যোগাড়ে। দুজন দুদিকে গেলো। দুজনেই মনে মনে কুমতলব আটলো যে, যেমন করেই হোক ডাকাতি করে আনা সব সম্পদ আত্মসাৎ করতে হবে। যে বাজারে খাবার কিনতে গিয়েছিলো সে খাবারের সাথে বিষ মিশিয়ে আনলো। অন্যদিকে ঝোপের মাঝে ওত পেতে থাকা বন্ধুটি দ্রুত ঝোপ থেকে বেরিয়ে এসে তাকে হত্যা করলো। কিন্তু নিহত বন্ধুর কিনে আনা খাবার মুখে দিতেই সেও ঢলে পড়লো মৃত্যুর কোলে। দুজনের একই দশা ঘটলো।

কখনো কখনো এমন হয় যে, একটি বিশেষ যুগ বা পরিস্থিতির জন্য একটি সভ্যতার শিক্ষা থাকে খুবই উপযোগী। কিন্তু যুগ বা পরিস্থিতির পালাবদলের সাথে সাথে এ শিক্ষা ততটা উপযোগী হয়ে উঠে না। এ ধরনের শিক্ষার মধ্যে আটকা পড়ে থাকলে স্বাভাবিকভাবেই পরবর্তী সময়ের লোকদের জন্য এ ফলাফল হবে খুবই ভয়াবহ। কোনো সভ্যতার শিক্ষার উন্নয়নের জন্য এবং পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে চলার মতো স্বাভাবিক সামর্থ যদি না থাকে তাহলে সে সভ্যতা বেশি দূর অগ্রসর হতে পারে না।

ইসলামী আদর্শ

কুরআন মজীদে সূরা আল বাকারার ২০১ আয়াতে এ মুনাজাত আমাদের শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে—

رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً - البقرة : ٢٠١

"হে আমাদের রব! আমাদের দুনিয়াতেও কল্যাণ দাও এবং আখিরাতেও কল্যাণ দাও।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২০১

মুসলমানদের মধ্যে চরমপন্থী দুটি দল পরিলক্ষিত হয়। একটি দল চরম আধ্যাত্মিকতাবাদী। তারা সকল প্রকার পার্থিব জিনিসের নিন্দা করার পক্ষপাতী। তারা সংযম দ্বারা সকল প্রকার বাসনা-কামনাকে জয় করা কর্তব্য মনে করে। অন্য দলটি চরম বস্তুবাদী। এরা অপরের অধিকারের প্রতি বিন্দুমাত্র কর্ণপাত করে না। ইসলাম অবশ্যই চরমপন্থী দল দুটির কোনোটাকেই সমর্থন করে না। কিন্তু মানব জাতির যে বৃহৎ জনগোষ্ঠী মধ্যপন্থা অনুসরণ করে একই সময়ে শরীর ও আত্মার উন্নয়নে প্রত্যাশী

তারা অনায়াসে ইসলামের বিধি-বিধান পালন করতে পারে। ইসলাম মানুষের আত্মিক এবং বস্তুগত উভয় বিষয়ের ওপর যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করে। ইসলামের দৃষ্টিতে এ দুটি অবিভাজ্য এবং একটিকে উত্তরণের আশায় অপরটি প্রত্যাখ্যান করা উচিত নয়। আধ্যাত্মিক দায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কে ইসলাম যে সমস্ত বিধি-নিষেধ আরোপ করেছে তার মধ্যে বস্তুগত সুযোগ-সুবিধাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। অনুরূপভাবে পার্থিব প্রয়োজনে ইসলাম যে সমস্ত কাজকর্মের অনুমোদন দিয়েছে, সেগুলোও যে আত্মিক উৎকর্ষের উপকরণ হিসেবে বিরাজ করতে পারে ইসলাম তাও দেখিয়ে দিয়েছে। নিম্নের উদাহরণগুলো থেকে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, আধ্যাত্মিক সাধনার মূল লক্ষ হলো মহান স্রষ্টা এক আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের নৈকট্য লাভ এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন। কুরআন মজীদে আল্লাহর রঙে রঙিন হতে বলা হয়েছে। হাদীস শরীফে আল্লাহর চোখ দিয়ে দেখার, আল্লাহর যবানে কথা বলার, আল্লাহর ইচ্ছায় ইচ্ছা পোষণ করার উল্লেখ রয়েছে। সংক্ষেপে বলা যায়, আল্লাহ্ তাআলার হুকুম অনুযায়ী সামগ্রিক ভাবে জীবন নির্বাহ করতে হবে। রূপক বর্ণনায় এভাবে বলা হয়েছে যে, মানবীয় ক্ষমতার মধ্য থেকে বিনীতভাবে তাকে অনুসরণ করার জন্য সচেষ্ট হতে হবে। কুরআন মজীদে যে সময় রোযা রাখার জন্য বলা হয়েছে, সে সময় রোযা রাখা মু'মিনের কর্তব্য। কারণ তা আল্লাহর হুকুম। আল্লাহর হুকুম পালন করা সওয়াব বা পুণ্যের কাজ। এ ছাড়াও যে শরীর আত্মাকে ধারণ করে, রোযা সে শরীরের বস্তুগত চাহিদাকে কমিয়ে দেয়। রোযা রেখে একজন আত্মিক উন্নতি অনুভব করে, সে আল্লাহ্ তাআলার কথা ভাবে, চিন্তা করে আল্লাহর নিয়ামত সম্পর্কে, উপভোগ করে আত্মিক সন্তুষ্টি। অপরদিকে রোযার কতকগুলো ব্যবহারিক উপকারিতাও রয়েছে। ক্ষুধার্ত এবং পিপাসার্ত অবস্থায় বিভিন্ন গ্রন্থি থেকে রস নিঃসৃত হয়। এ রস মানবদেহের অনেক রোগ জীবানুকে ধ্বংস করে ফেলে। তাছাড়া রোযা দুর্যোগ মুহূর্তে মানুষকে কায়ক্লেশ সহ্য করতে এবং সাধারণ কাজকর্মগুলোকে ব্যহত না করে স্বাভাবিকভাবে চালিয়ে যাওয়ার ক্ষমতাকে বাড়িয়ে দেয়। তবে কেউ যদি পার্থিব উদ্দেশ্যে রোযা রাখে তাহলে এর কোনো আধ্যাত্মিক মূল্য থাকবে না। কিন্তু রোযা রাখার উদ্দেশ্য যদি হয় আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন, তাহলে বস্তুগত বা জাগতিক সুবিধা কখনো কোনোভাবেই বিঘ্নিত হবে না।

অপরদিকে কেউ যদি কেবলমাত্র পার্থিব উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে কাজ করে, তাহলে সে হয়তো পার্থিব উদ্দেশ্য হাসিল করতে পারবে। কিন্তু

আধ্যাত্মিক সুবিধা থেকে সে পুরোমাত্রায় বঞ্চিত হবে। এ প্রসংগে রাসূলে করীম (স)-এর সেই মহান হাদীসটি স্মরণ করা যেতে পারে ঃ 'কাজের ফলাফল সম্পূর্ণভাবে নিয়ত দ্বারা নির্ধারিত হবে।'–বুখারী, মুসলিম

সরকারী তহবিলে খাজনা দেয়া, যুদ্ধ করা এবং এ জাতীয় অন্যান্য কাজগুলো একান্তভাবেই পার্থিব জগতের সাথে সম্পর্কিত। তবু এখানে বিস্ময়ের কিছু নেই যে, এ সমস্ত কাজগুলোর ব্যাপারেও ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ আলাদা। ইসলামে কালেমা, নামায, রোযা, হজ্জ যেমন ঈমানের বুনিয়াদ, তেমনি যাকাতও অন্যতম বুনিয়াদ। সরকারী তহবিলে খাজনা দেয়ার মতো পার্থিব কাজগুলোর প্রতি হাদীসে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ব্যাপক ও বিস্তীর্ণ। এখানে আধ্যাত্মিক এবং জাগতিক কাজগুলোকে অভিন্ন চোখে দেখে। সে ইচ্ছার বিরুদ্ধে অথবা কেবলমাত্র সামাজিক দায়িত্ব হিসেবে কর পরিশোধ করে না, বরং সে কর পরিশোধ করে থাকে একান্তভাবে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার প্রত্যাশায়। সে জানে যে, কর পরিশোধ করা তার একটি পবিত্র দায়িত্ব এবং এটা সেই মহান আল্লাহর প্রতি একটি হক আদায় স্বরূপ যার কাছে কিছু গোপন থাকে না, যিনি পুনরায় আমাদের জীবন দান করতে পারেন, আমাদের সমস্ত কাজের হিসাব নিকাশ চাইতে পারেন। বান্দার অন্তরে যখন এ ধারণা সৃষ্টি হয় তখন স্বাভাবিকভাবেই সে তার দায়িত্ব পালনে যে কতখানি সতর্কতা এবং যত্ন নেবে তা সহজেই অনুমেয়।

যুদ্ধের ব্যাপারেও একই কথা প্রযোজ্য। আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ ছাড়া ইসলামে সকল প্রকার যুদ্ধকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এটা হৃদয়ংগম করা কঠিন কোনো ব্যাপার নয় যে, একজন মু'মিনের দৈনন্দিন আচরণ হবে অধিকতর মানবিক। যুদ্ধের ময়দানে সে জীবনের ঝুঁকি নেবে, কিন্তু সে কোনো রকম পার্থিব সুবিধা আদায়ের চেষ্টা করবে না। পার্থিব দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলোকে আধ্যাত্মিক রূপ দিয়ে ইসলাম মূলত মানুষের আধ্যাত্মিক দিকটাকে সমুন্নত করতে চেয়েছে। এর বাইরে ইসলামের অন্য কোনো উপলক্ষ নেই। এভাবেই ইসলাম মানুষকে জাগতিক সুবিধা অর্জনের চিন্তা থেকে সরিয়ে এনে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের দিকে অনুপ্রাণিত করেছে। রাসূলে করীম (স) বলেছেন, রিয়াও এক ধরনের শিরক। এ প্রসংগে ইমাম গাযালী (র) বলেছেন যে, কেউ যদি নিজের আড়ম্বর প্রদর্শন বা লোক দেখানোর জন্য নামায পড়ে, রোযা রাখে সেটা হবে শিরক কারণ এমন ইবাদাত আল্লাহর প্রতি নিবেদিত নয়। বরং আত্মতুষ্টিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত।

মানব জীবনের একটি মৌলিক দায়িত্ব এবং উদ্দেশ্য রয়েছে। কুরআনুল করীমেও বার বার একথাটি উচ্চারিত হয়েছে। বলা হয়েছে যে, বিশ্বাস কর এবং ভালো কাজ কর। ইসলাম বিশ্বাস এবং সৎকর্মের ওপর সমান গুরুত্ব আরোপ করে এক আল্লাহর ওপর ঈমান ছাড়া সৎকাজ পারলৌকিক মুক্তি আনতে পারে না।

মন্দ থেকে ভালোকে পৃথক করারও একটি নিয়মনীতি রয়েছে। ওহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত বিধানই ভালো-মন্দের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ের একমাত্র মাপকাঠি। আবার ওহীর স্পষ্ট বিধানের অভাবে যখন পার্থক্য নিরূপণ করা যাবে না, তখন একজনের বিবেকের রায়ও হতে পারে ভালো-মন্দের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী। কোনো সমস্যার উদ্ভব হলেই তাকে ইসলামী শরীয়াহর দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি বিবেচনা করে দেখতে হবে। সম্ভব হলে ব্যক্তিগত ভাবে সে নিজেই এ কাজটি করতে পারে। প্রয়োজনবোধে এ বিষয়ে অভিজ্ঞ এবং পারদর্শী ব্যক্তিগণের সাহায্য নিতে পারে। অবশ্য ফকীহ্ বা আইন উপদেষ্টার কাছে যতটুকু তথ্য উপস্থাপন করা হয়, তার ভিত্তিতেই তিনি রায় দিয়ে থাকেন। ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতভাবে সমস্ত তথ্য পরিবেশন না করলে অন্তরের মাঝে কথা গোপন রাখলে, স্বাভাবিকভাবেই রায় প্রদানে ত্রুটি হবে এবং সেজন্য শরীআত দায়ী হবে না। বরং এজন্য ব্যক্তি দায়ী থাকবে। এ প্রসংগে রাসূলে করীম (স)-এর একটি হাদীস উল্লেখ করা যেতে পারে। হাদীসটি ছোট হলেও অর্থপূর্ণ। রাসূলে করীম (স) একদিন বললেন, "আমার নিকট যে অভিযোগ আসে এবং যে তথ্য উপস্থাপন করা হয় তার ভিত্তিতেই আমি সিদ্ধান্ত দেই। কিন্তু পূর্ণ তথ্যের অভাবে আমার রায় যদি অন্যায়কারীর পক্ষে চলে যায় তাহলে তাকে জানিয়ে দাও যে, আমি তাকে জাহান্নামের আগুনের একটি অংশ দান করলাম।" (বুখারী, মুসলিম) ইসলামী বিচার সংক্রান্ত একটি প্রবাদে এ বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে বলা হয়েছে যে, কাযীর বিচার তোমার পক্ষে গেলেও তুমি তোমার বিবেকের রায় গ্রহণ কর।

অপরের কথা না ভেবে কেবলমাত্র নিজের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করাটা শুধু অমানবিক নয়, এটা পাশবিক আচরণও। নিজের চাহিদা ও প্রয়োজন মেটানোর পর অন্যদের সম্পর্কে চিন্তা করাটা স্বাভাবিক এবং এটাই কাংখিত। কুরআন মজীদে এসব লোকদের প্রশংসা করে বলা হয়েছে যে,

وَيُؤْثِرُوْنَ عَلَىٰٓ اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ط وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ

فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ○ - الحشر : ٩

"তারা (আনসারগণ) তাদেরকে (মুহাজিরগণকে) নিজেদের ওপর প্রাধান্য দেয়, নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও, যারা কৃপণতা হতে নিজেদের মুক্ত করেছে তারাই সফলকাম।"–সূরা আল হাশর ঃ ৯

স্পষ্টতই এটা একটি নসিহত মাত্র এবং সাধারণ মানুষের জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়নি। কেউ যদি এটা পালন না করে তাহলে তাকে অপরাধী বা গোনাহগার বলা যাবে না। এ প্রসংগে রাসূলে করীম (স)-এর একটি হাদীসের উল্লেখ করা যেতে পারে। এ হাদীসটিও এসেছে নসিহত হিসেবে। প্রিয়নবী (স) বলেছেন, "মানুষের মধ্যে তিনি উত্তম যিনি অপরের কল্যাণে নিয়োজিত থাকেন।"

কুরআনুল করীমের নির্দেশনাবলীর মধ্যে ইসলামী আচার আচরণের বৈশিষ্ট্যসমূহ খুঁজে পাওয়া যাবে। যেমন কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ـ الضحى : ١١

"তুমি তোমার প্রতি লোকের অনুগ্রহের কথা জানিয়ে দাও।"-সূরা দুহা ঃ ১১

রাসূলে করীম (স)-এর একটি হাদীসের মধ্য দিয়ে বিষয়টি আরো চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে। তিনি বলেছেন যে, আল্লাহ তাআলা তাঁর নেয়ামতের প্রকাশ দেখতে চেয়েছেন তাঁর সৃষ্টিরাজির মধ্যে।–তিরমিযী

এ প্রসংগে একটি ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। একবার একজন সাহাবী ছেড়া নোংরা পোশাক পরে প্রিয়নবী (স)-এর সাথে দেখা করতে এলেন। অথচ তিনি ছিলেন বেশ ধনী এবং সম্পদশালী। প্রিয়নবী (স) তাঁকে এভাবে আসার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন, তিনি নিজের চেয়ে অপরের প্রয়োজন ও চাহিদাকে অগ্রাধিকার দেন। সে কারণেই দীন-দুঃখী বেশে থাকতেই তার বেশী পসন্দ। দৈন্যদশার জন্য নয়, বরং পুণ্যকাজ হিসেবেই তিনি এমনটি করে থাকেন। কিন্তু রাসূলে কারীম (স) তাঁর এ জবাবে সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। তিনি আত্মত্যাগের একটি মাত্রাও নির্ধারণ করে দিলেন এবং নির্দেশ দিলেন যে, আল্লাহ যখন তোমাকে বিষয়-সম্পদ দান করেছেন, তখন তাঁর নেয়ামতের ছাপতো তোমার জীবনাচরণের ওপর প্রতিফলিত হওয়া আবশ্যক। (আবু দাউদ)

কুরআন শরীফে সূরা আল কাসাসের ৭৭ আয়াতে এরশাদ হয়েছে ঃ

وَابْتَغِ فِيْمَآ اٰتٰكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَاَحْسِنْ كَمَآ اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِى الْاَرْضِ ط اِنَّ اللّٰهَ لَايُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ

"আল্লাহ তোমাকে যা দিয়েছেন তা দিয়ে আখিরাতের আবাস অনুসন্ধান করো। দুনিয়া থেকে তোমার অংশ ভুলে যেও না। পরোপকার করো যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি ইহসান করেছেন এবং পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করো না। নিশ্চয় আল্লাহ ফাসাদ সৃষ্টিকারীকে ভালোবাসেন না।"

মানুষ কাজকর্ম করা থেকে বিরত থাকবে, বেঁচে থাকবে পরজীবী হিসেবে ইসলাম আদৌ এ নীতি সমর্থন করে না, বরং ইসলামের বিধান এই যে, সে আল্লাহর দেয়া নেয়ামত এবং প্রতিভাকে অন্যান্য সৃষ্টি জীবের স্বার্থে পরিপূর্ণভাবে কাজে লাগাবে এবং উপার্জন করবে সাধ্য অনুসারে। তাছাড়া নিজের প্রয়োজন মেটানোর পর যা কিছু অতিরিক্ত থাকবে তা নিঃস্ব ও দুঃস্থদের অভাব পূরণেরে জন্য ব্যয় করবে। রাসূলে করীম (স) অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ঘোষণা দিয়েছেন, এটা উত্তম যে, তোমার পরে তোমার আপনজন ও আত্মীয়স্বজন সচ্ছল থাকবে এবং কারো কাছে হাত পাততে বাধ্য হবে না।-(বুখারী) প্রাত্যহিক অনুশীলনী ও কর্মাদি ইসলামে নির্ধারিত রয়েছে, এতদসত্ত্বেও ইসলাম বৈরাগ্য কিংবা স্বেচ্ছায় দুঃখ-দৈন্য অবলম্বন করতে বলে না। বরং এ ধরনের মতবাদকে যারা সমর্থন করে তাদের নিন্দা করে। কুরআনুল করীমে ঘোষণা দেয়া হয়েছে ঃ

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ الَّتِيْٓ اَخْرَجَ لِعِبَادِهٖ وَالطَّيِّبٰتِ مِنَ الرِّزْقِ ط

"হে নবী! তাদের বল, আল্লাহর সেসব সৌন্দর্য অলংকার কে হারাম করেছে, যা আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের জন্য বের করেছেন এবং আল্লাহর দেয়া পবিত্র জিনিসসমূহকে নিষিদ্ধ করেছে?"

—সূরা আল আরাফ ঃ ৩২

আল্লাহর ওপর ঈমান

মানুষ তার স্রষ্টাকে বারংবার অন্বেষণ করেছে, তাঁকে জানতে চেয়েছে তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের জন্য। এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রতিটি যামানায় ও সভ্যতায় সেরা ধর্মীয় নেতাগণ কতকগুলো আচরণ বিধিবদ্ধ করে গেছেন। আদিম যুগের মানুষ আল্লাহ তাআলার ক্ষমতা এবং অনুকম্পার নিদর্শন কায়মনোবাক্যে পূজা অর্চনা করেছে। আল্লাহর সৃষ্টি সূর্য-চন্দ্র-পর্বত পূজার সূত্রপাত এখান থেকেই। এসব কিছু তারা করেছে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার আশায়। অনেকে আবার দু ধরনের দেবতায় বিশ্বাসস্থাপন করেছে। একজনকে গ্রহণ করেছে মংগল, অন্যজনকে অমংগলের প্রতিভূ হিসেবে। কিন্তু তারা ভুলে যায় যে, এ ধরনের তারতম্যের কারণে উভয় দেবতার মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব দেখা দিবে এবং এর

ফলে দেবতাদের মধ্যে নিশ্চিতভাবে যুদ্ধবিগ্রহ বেঁধে যাওয়ার কথা। অনেকে আবার দেবতাদের ওপর এমন সব নিগূঢ় বিষয় আরোপ করে যা সাধারণ মানুষের বোধশক্তির বাইরে। ফলে কখনো দেবতা নিজেই রহস্যময় হয়ে উঠেছে। আবার কেউ কেউ এমন সব প্রতীক, আচার অনুষ্ঠান অথবা অংগ-ভংগীর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছে যার ফলে তাদের ধর্মীয় ধ্যান ধারণাকে পৌত্তলিকতা অথবা বহু দেবতা মতবাদ থেকে আলাদা করা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে।

এ ক্ষেত্রে ইসলামের রয়েছে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। ইসলাম বিশ্বাস করে আল্লাহ্ এক ও একক এবং তাঁর কোনো শরীক নেই। ইসলাম যে ইবাদাত-বন্দেগীর নির্দেশ দেয় তাতে প্রতিকৃতি বা প্রতিচ্ছবির কোনো স্থান নেই। বস্তুগত ধারণা দিয়ে তাঁকে অনুমান করা যায় না। কুরআন মজীদে এরশাদ হয়েছে ঃ

لَاتُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ ز وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ ج وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ ○

"তিনি দৃষ্টির অধিগম্য নন, কিন্তু দৃষ্টিশক্তি তাঁর অধিগত এবং তিনিই সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক পরিজ্ঞাত।"–সূরা আল আনআম ঃ ১০৩

তিনি চিরঞ্জীব, সর্বব্যাপী এবং সর্বশক্তিমান। স্রষ্টার সাথে মানুষের সম্পর্ক প্রত্যক্ষ এবং একান্ত। এ সম্পর্কের মাঝে কোনো প্রতিনিধিত্ব অনাবশ্যক। নবী-রাসূলগণ পথপ্রদর্শক এবং সংবাদ বাহকের ভূমিকা পালন করেন। ব্যক্তি কাকে অনুসরণ করবে, কোন্ পথ গ্রহণ করবে তা সম্পূর্ণরূপে তার পসন্দের ওপর নির্ভর করে এবং এজন্য সে সরাসরি আল্লাহ্ তাআলার নিকট দায়ী থাকবে।

ওপরের আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে, ইসলাম ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের বিকাশের ব্যাপারে আগ্রহী। মানুষের যেমন রয়েছে ভালো কাজ করার ইখতিয়ার তেমনি মন্দ কাজ করার ইখতিয়ারও রয়েছে। কিন্তু তার অর্থ এ নয় যে, জন্মগতভাবে সে পাপী। যে যেমন কর্ম করবে সে তেমন ফল পাবে। কারো পাপের বোঝা অন্য কেউ বহন করবে না। প্রত্যেকেই দায়ী থাকবে নিজ নিজ কাজ অনুসারে।

কু-প্রবৃত্তির প্ররোচনায় মানুষ আল্লাহ্র নাফরমানী করে, অন্যায় করে এবং ফাসাদ সৃষ্টি করে। নীতিগতভাবে প্রতিটি অন্যায় আচরণের জন্যই তাকে শাস্তি পেতে হবে। আবার শাস্তি থেকে অব্যাহতি লাভেরও কতগুলো উপায় আছে। যেমন—কেউ পাপ করে আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা চাইলে, তাওবা করলে এবং সংশোধিত হলে তার পাপ মোচন হতে পারে।

ক্ষতিপূরণ আদায়ের মাধ্যমে শাস্তি থেকে অব্যাহতিলাভের সম্ভাবনাও রয়েছে। কেউ কারো প্রতি কোনো অন্যায় আচরণ করলে তা এমনভাবে শুধরে নিতে হবে যাতে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি হৃষ্টচিত্তে তাকে ক্ষমা করে দেয়। আবার ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির কাছ থেকে যা নেয়া হয়েছে তা প্রত্যর্পণ বা ফেরত প্রদান করেও শাস্তি থেকে অব্যাহতি পাওয়া যেতে পারে। অপরদিকে কেউ আল্লাহর হুকুম অমান্য অথবা আল্লাহর হক আদায় না করলে তাকে উপযুক্ত শাস্তি পেতে হবে। অপরাধী ও পাপিষ্টরা আন্তরিক-ভাবে অনুতপ্ত হলে আল্লাহ তাআলা তাদের ক্ষমা করে দেবেন।

সমাজ

ইসলাম যেমন মানুষের ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের বিকাশে আগ্রহী তেমনি মানুষের মধ্যকার সমষ্টিগত ধ্যান-ধারণা ও আচরণকেও উৎসাহিত করে। ইসলামের ধর্মীয় এবং পার্থিব সকল প্রকার বিধি-বিধানের মধ্যে এ ধারা লক্ষ করা যায়। তাই দেখা যায় যে, ইসলামের ইবাদাত-বন্দেগী নীতিগতভাবে সমাজকেন্দ্রিক। দিনে পাঁচ ওয়াক্ত নামায একাকী আদায়ের ব্যাপারে অনুমোদন থাকলেও সপ্তাহের জুমআর নামায অথবা ঈদের নামায একাকী আদায় করার কোনো সুযোগ নেই।

সমষ্টিগতভাবে ইবাদাত-বন্দেগীর ক্ষেত্রে হজ্জ একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। হজ্জের সময়ে বিশ্বের বিভিন্ন স্থান থেকে মু'মিন মুসলমানগণ এক জায়গায় এসে সমবেত হন। সিয়াম সাধনার ক্ষেত্রেও রয়েছে সমষ্টিগত দৃষ্টিভঙ্গী। বিশ্বের সমস্ত মুসলমান বছরের নির্দিষ্ট মাসে সিয়াম পালন করে থাকেন। একজন মুসলিমকে যাকাত আদায় করতে হয় ব্যক্তিগতভাবে। কিন্তু একজন খলীফা দেশের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকলে যাকাত প্রদানের নিয়মনীতিও সমষ্টিগত রূপ গ্রহণ করে। মূলত এগুলো এক অভিন্ন লক্ষের প্রতি দিকনির্দেশ করে। সমষ্টি বা সমাজকেন্দ্রিক ইবাদাত-বন্দেগীর মধ্যে যে উদ্দীপনা ও বরকত থাকে একাকী ইবাদাত-বন্দেগীর সময় একজন মুসলমান তা কখনো অনুভব করতে পারে না।

আল্লাহ তাআলা বিভিন্ন ধরনের ব্যক্তিকে বিভিন্ন ধরনের মেধা দিয়েছেন। একই পিতা-মাতার দুটি সন্তান সবসময় একই ধরনের গুণসম্পন্ন হয় না। পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় একই শ্রেণীর দুটি ছাত্রের মেধায় ও যোগ্যতায়। সব জমিই একই ধরনের উর্বর না। আবহাওয়ায় রয়েছে ভিন্নতা। অনুরূপভাবে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে প্রতিটি প্রাণীর এমনকি একই প্রাণীর বিভিন্ন অংগ-প্রতংগের মধ্যে।

এ ধরনের বিভিন্নতার কারণ একমাত্র আল্লাহই ভালো জানেন। প্রকৃতিগত এ তারতম্যের প্রেক্ষাপটে ইসলামের স্পষ্ট ঘোষণা হচ্ছে, সকল মানুষই মৌলিকভাবে সমান, আবার প্রত্যেকেরই পরস্পরের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। সবাই মহান আল্লাহর সৃষ্টি। একমাত্র তাকওয়া হলো ব্যক্তির মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি। তার চেয়ে বড় কথা, দুনিয়ায় মানুষের জীবনকাল খুবই ক্ষণস্থায়ী এবং পশুর আচরণের সাথে মানুষের আচরণের অবশ্যই একটা পার্থক্য থাকতে হবে।

জাতীয়তা

ইসলাম সংহতির অংশ হিসেবে জন্ম ও রক্তের কৌলিন্যের সংকীর্ণ ভিত্তিকে বাতিল করে দিয়েছে। বংশ বা জন্মভূমির প্রতি মানুষের আকর্ষণ থাকাটা খুবই স্বাভাবিক। তবে মানব জাতির বৃহত্তর স্বার্থে একটি দল বা গোষ্ঠীর প্রতি অন্যান্য দল বা গোষ্ঠীর ধৈর্য ও সহনশীলতা থাকা আবশ্যক। তাছাড়া পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকায় প্রাকৃতিক সম্পদরাজি এমনভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে যে, গোটা বিশ্বের বিভিন্ন অংশকে পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল করে তুলেছে। এখানে বাধ্য হয়েই একজনকে "নিজে বাঁচ অপরকে বাঁচতে দাও" নীতি মেনে চলতে হয়। অন্যথায় দীর্ঘস্থায়ী বংশগত ক্রোধের যাঁতাকলে পড়ে সকলের ধ্বংস অনিবার্য হয়ে উঠে।

ভাষা, বর্ণ, গোত্র বা জন্মস্থানের ভিত্তিতে গড়ে উঠা জাতীয়তার ধারণা প্রাগৈতিহাসিক ব্যাপার এর মধ্যে নিহিত রয়েছে একটি নিশ্চিত বিপর্যয়, একটি চরম অচলাবস্থা। এটা এমন একটি পরিস্থিতির সৃষ্টি করে যেখানে মানুষের পসন্দ অপসন্দের কোনো মূল্য নেই।

জাতীয়তা সম্পর্কে ইসলামের ধারণা অত্যন্ত প্রগতিশীল এবং এটা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে ব্যক্তির পসন্দের ওপর। কেননা যারা অভিন্ন আদর্শে বিশ্বাস করে ইসলাম তাদের সকলকে একটি বন্ধনে আবদ্ধ করে। এখানে ভাষা, বর্ণ, গোত্র বা জন্মস্থানের মধ্যে কোনো তারতম্য করে না।। এখানে কাউকে নির্মূল করার বা অধীনতার পাশে আবদ্ধ করার অবকাশ নেই। ফলে ইসলামের দৃষ্টিতে জাতীয়তা সৃষ্টির একটি মাত্র বৈধ পথ উন্মুক্ত রয়েছে এবং তা হলো কাউকে সাদরে গ্রহণ বা আত্মীকরণ। বস্তুত অভিন্ন আদর্শ ও বিশ্বাসের চেয়ে উত্তম এমন আর কি আছে যার মাধ্যমে আত্মীকরণ সম্ভব হতে পারে। প্রসংগক্রমে এখানে আবারো উল্লেখ করা যেতে পারে যে, মানুষের শরীরের এবং আত্মার চাহিদাগুলোর অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে ইসলামী আদর্শের মধ্যে। উপরন্তু ইসলাম ধৈর্য ও সহনশীলতাকে

অতি মাত্রায় উৎসাহিত করে থাকে। ইসলামের দাবি এই যে, আল্লাহ তাআলা বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন জাতির কাছে নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন। আল্লাহর শাশ্বতবাণীকে বারবার তাঁরা নতুনভাবে প্রচার করেছেন। সাধ্য-সাধনা চালিয়েছেন এর পুনর্জাগরণের জন্য।

ধর্মীয় ব্যাপারে বাধ্যবাধকতা ইসলামে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অবিশ্বাস্য হলেও একথা সত্য যে, ইসলামী রাষ্ট্রে যে সমস্ত অমুসলিম বসবাস করে, তাদেরকে তাদের ধর্ম পালনের অধিকার দেয়াকে ইসলাম একটি পবিত্র দায়িত্ব বলে মনে করে। কুরআন-হাদীস এবং ইসলামী রাষ্ট্রের প্রচলিত রীতি অনুসারে মুসলিম রাষ্ট্রের অমুসলিমদের নিজস্ব বিধি-বিধান, আইন-কানুন ও বিচারক থাকবে, তাদের বিচার-আচার হবে তাদের নিজস্ব বিচারালয়ে, তাদের ধর্মীয় বা সামাজিক ব্যাপারে মুসলিম শাসক কর্তৃপক্ষ কোনো রকম হস্তক্ষেপ করবে না।

অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি

অর্থনৈতিক বিষয়সমূহের একটি সামাজিক তাৎপর্য রয়েছে। ইসলামের দৃষ্টিতে এ বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বের সাথে বিবেচনার দাবি রাখে। কুরআনুল কারীমে বলা হয়েছে ঃ

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا

وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ○ ـ النساء : ٥

"তোমাদের ধন-সম্পদ যা আল্লাহ তোমাদের জন্য উপজীবিকা করেছেন তা নির্বোধদের হাতে তুলে দিও না, তা থেকে তাদের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করবে এবং তাদের সাথে সদালাপ করবে।"-সূরা আন নিসা ঃ ৫

মানবজাতির জীবিকা আসে বস্তুগত বিষয় থেকে। এখানে কেউ যদি অন্যকে নিয়ে না ভাবে, কেবলমাত্র নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকে তাহলে সমাজ অবশ্যই দিনে দিনে এগিয়ে যাবে প্রলয়ংকারী সংকটের দিকে। এর সহজ এবং স্পষ্ট কারণ এই যে, এ ধরনের পরিস্থিতির কারণে বিশাল জনগোষ্ঠী চলে যাবে দারিদ্র সীমার নীচে। অথচ ধনাঢ্য ব্যক্তিদের সংখ্যা থাকবে খুবই মুষ্টিমেয়। অবশেষে এমন একটি সময় আসবে যখন অনাহারক্লিষ্ট বিশাল জনগোষ্ঠী সীমিতসংখ্যক ধনী শ্রেণীকে নির্মূল করে দিবে। স্মরণ রাখতে হবে যে, প্রয়োজনীয় জিনিসের অভাবকে মেনে নেয়া যত সহজ রোগযন্ত্রণা সহ্য করা তার চেয়ে বহুগুণ কঠিন এবং এটাই দেখা

দিতে পারে বিপর্যয়ের কারণ হিসেবে। এ ব্যাপারে ইসলামের ধ্যান-ধারণা ও বিধি-ব্যবস্থা খুবই স্পষ্ট। সম্পদের নিয়মিত বণ্টন, পুনর্বণ্টন ও মালিকানা বদলের ব্যবস্থা এখানে রয়েছে। দরিদ্রদেরকে যাকাত দেয়া হতে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। অথচ সচ্ছল ও সম্পদশালীদের জন্য যাকাত আদায় করা বাধ্যতামূলক। যাকাত ব্যবস্থার উদ্দেশ্য হলো অভাবীদের অভাব মোচন করা। ইসলাম এমন কতকগুলো আইন প্রবর্তন করেছে যেগুলো উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পদকে বিলিবন্টন করা বাধ্যতামূলক করে দিয়েছে। আবার কতকগুলো বিধিবিধান মুষ্টিমেয় লোকের হাতে সম্পদ কুক্ষিগত হওয়ার প্রতিরোধ করেছে। এ ধরনের আইনের মধ্যে রয়েছে ঋণ বা সম্পদের ওপর সুদ প্রথার বিলোপ, নিকটাত্মীয়দের অধিকার ক্ষুণ্ন করে উইল করার ব্যবস্থা নিষিদ্ধকরণ ইত্যাদি।

কিছু আইন আবার রাষ্ট্রীয় সম্পদ খরচ করার নিয়ম-কানুন বাতলে দিয়েছে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে সম্পদকে বেশি সংখ্যক লোকের মধ্যে পুনর্বন্টন ব্যবস্থা করা এবং সুবিধাপ্রাপ্ত লোকদের মধ্যে দরিদ্র শ্রেণীর লোকেরা থাকবে সবার শীর্ষে। বিভিন্ন অঞ্চল, বিভিন্ন যুগ বা বিভিন্ন পরিস্থিতির মধ্যে যে তারতম্য রয়েছে তার আলোকে সম্পদ বণ্টনের প্রক্রিয়া ও পদ্ধতিতে পার্থক্য থাকতে পারে। এ উদ্দেশ্য যদি হয় সম্পদের পুনর্বণ্টন ও সমতা বিধান, তাহলে ইসলামে এর অনুমোদন রয়েছে। এমন কি প্রতিযোগিতামূলক মুক্ত অর্থনীতি যদি শোষণের হাতিয়ারের রূপ গ্রহণ না করে, যদি দরিদ্র ও অর্থনৈতিকভাবে পশ্চাদপদ গোষ্ঠীকে বিপন্ন করে না তোলে তাহলে তেমন অর্থনীতি ইসলাম অনুমোদন করে। অনুরূপভাবে বিশেষ পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে একটি গোষ্ঠীর স্বার্থে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা ভিত্তিক অর্থনীতিকে গ্রহণ করা যেতে পারে, তবে অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া পদ্ধতি যাই হোক না কেন যে কোনো সম্পদ তথা উপাদান-উপকরণের অপচয়কে পরিহার করতে হবে। বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে এমন ব্যবস্থা নিতে হবে যেখানে থেকে সর্বোচ্চ ফল পাওয়া যাবে এবং সময়ের চাহিদা অনুসারে সেটা হবে সর্বাধিক উপযোগী।

স্বাধীন ইচ্ছা ও অদৃষ্ট

স্বাধীন ইচ্ছা এবং অদৃষ্টকে কেন্দ্র করে মানুষের মধ্যে এক মস্তবড় সংকট বিরাজ করছে। রাসূলে করীম (স) সাহাবায়ে কেরামকে এ বিষয় আলোচনা করতে নিষেধ করেছেন। তিনি স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, এটা এমন একটা বিষয়, যে বিষয়ে বিতর্ক তোমাদের পূর্ববর্তীগণকে ধ্বংসের

পথে নিয়ে গেছে।-(ইবনে হাম্বল, তিরমিযী) গোটা বিষয়টিকে তিনি দু ভাগে বিভক্ত করেছেন। প্রথমটি হলো আল্লাহ তাআলা সর্বশক্তিমান এবং দ্বিতীয়টি হলো মানুষের দায়িত্ব। একজন মুসলিম তার স্রষ্টাকে জীবন দিয়ে ভালোবাসে। সে অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করে যে আল্লাহ তা'আলা কেবলমাত্র সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমানই নন বরং তিনি ন্যায়বিচারক পরম দয়ালু।

তাছাড়া ইসলাম মু'মিনকে সদাসর্বদা কর্মে প্রবৃত্ত হওয়ার তাকিদ দেয় এবং যেহেতু কোন্‌টি আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা অথবা তিনি কোন্ জিনিসটি বান্দার জন্য নির্ধারণ করে রেখেছেন, তা সে জানে না। তাই কাজে প্রবৃত্ত হতে হবে। শুরুতে বিপর্যয় বা ব্যর্থতা এলেও সে কখনো হতাশ বা নির্লিপ্ত হতে পারবে না বরং বারবার তাকে চেষ্টা করতে হবে যে পর্যন্ত সে লক্ষে না পৌঁছবে অথবা যতক্ষণ হৃদয়ংগম করতে না পারবে যে লক্ষ অর্জন সম্ভব নয় ততক্ষণ পর্যন্ত এ প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে। আর আল্লাহ তাআলা মানুষকে বিচার করবেন তার নিয়ত ও আমল অনুসারে।

পৃথিবীতে আল্লাহ যত নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন, তাঁদের সকলের কাছে তিনি এ সত্যটি তুলে ধরেছেন অত্যন্ত স্পষ্টভাবে। কুরআন মজীদে একথা এভাবে বলা হয়েছে ঃ

أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِىْ صُحُفِ مُوْسٰى ۝ وَاِبْرٰهِيْمَ الَّذِىْ وَفّٰى ۝ اَلاَّ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ۝ وَاَنْ لَّيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلاَّ مَا سَعٰى ۝ وَاَنَّ سَعْيَهٗ سَوْفَ يُرٰى ۝ ثُمَّ يُجْزٰهُ الْجَزَآءَ الْاَوْفٰى ۝ وَاَنَّ اِلٰى رَبِّكَ الْمُنْتَهٰى ۝ـ النجم : ٣٦ـ٤٢

"তাকে কি অবগত করা হয়নি যা আছে মূসার কিতাবে এবং ইবরাহীমের কিতাবে, যে পালন করেছিলো তাঁর দায়িত্ব। তা এই যে, কোনো বহনকারী অপরের বোঝা বহন করবে না। আর এই যে, মানুষের জন্য কিছুই নেই, কিন্তু শুধু তাই যার জন্য সে চেষ্টা করেছে। আর এই যে, তার কর্ম অচিরেই দেখান হবে। অতপর তাকে দেয়া হবে পূর্ণ প্রতিদান। আর এই যে, সমস্ত কিছুর সমাপ্তি তোমার প্রতিপালকের নিকট।"-সূরা আন নাজম ঃ ৩৬-৪২

অদৃষ্টের নিয়ম অনুসারে আমাদের কাজ করতে হয়। আবার শাস্তি ভোগ করার জন্য তৈরি থাকতে হয়। বস্তুতপক্ষে কেবলমাত্র এ রকম প্রস্তুতির জন্য আমরা আল্লাহর নিকট থেকে পুরস্কার পেয়ে থাকি। এ ধরনের

৬—

প্রস্তুতিকে বলা যেতে পারে একটি জান্নাতী বা আসমানী আমানত। এ পবিত্র আমানত ন্যস্ত করা হয়েছে মানুষের ওপর। কুরআন মজীদে এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ

اِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَاَبَيْنَ اَنْ يَّحْمِلْنَهَا وَاَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانُ ط اِنَّهٗ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُوْلًاO - الاحزاب : ٧٢

"আমি তো আসমান যমীন ও পর্বতমালার ওপর এ আমানত অর্পণ করেছিলাম, তারা তা বহন করতে অস্বীকার করলো, তাতে শংকিত হলো কিন্তু মানুষ তা বহন করলো, সে তো অতিশয় যালিম, অতিশয় অজ্ঞ।"–সূরা আল আহ্‌যাব ঃ ৭২

কুরআন মানুষের হেদায়াতের জন্য নাযিল হয়েছে। অধিকাংশ মানুষ আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করে আমানতের হক আদায় করে না। তাই মানুষকে তার নিজের প্রতি যুলুমকারী ও আমানত সম্পর্কে অজ্ঞ বলা হয়েছে। আল্লাহ বলেছেন, আমি তোমাদের ক্রিয়াকর্মগুলো পূর্ব থেকে নির্ধারণ করে দেব। কাজগুলো মন্দ হলে তোমাদের শাস্তি দেব, ভালো হলে পুরস্কৃত করবো। অন্যান্য সৃষ্টিরাজি বললো, তা কি করে হয় ? বিষয়টি নির্ধারণ করে দেবে তুমি, আর সেজন্য দায়ী থাকতে হবে আমাদের ? অমনি তারা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লো। কিন্তু আল্লাহর দয়া, অনুগ্রহ ও অনুকম্পার ওপর মানুষের ছিল অগাধ বিশ্বাস। তারা বললো, হে আল্লাহ! আমরা এ দায়িত্ব এবং পবিত্র আমানত গ্রহণ করলাম। এমন জবাবে আল্লাহ তাআলা এতো খুশী হলেন যে, সাথে সাথে তিনি আদম (আ) তথা মানুষের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করার জন্য ফেরেশতাগণকে নির্দেশ দিলেন।

পরিশেষে বলা যেতে পারে যে, মানুষকে কাজ করতে হয় তার সাধ্যানুসারে। অদৃষ্টের লিখন যাই হোক না কেন সে তার দায়-দায়িত্বকে মেনে নেয় অকপটে। আবার আল্লাহর গুণরাজিসহ তাকে মেনে নিতে হয়। তার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করতে বিন্দুমাত্র কষ্ট হয় না। সে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ সবকিছু জানেন এবং পূর্ব থেকেই আল্লাহ তাআলা সবকিছু নির্ধারণ করে রেখেছেন।

ইসলামে অদৃষ্টবাদিদের আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য রয়েছে, তাহলো —একমাত্র আল্লাহ তাআলাই মানুষের কাজের ভালোমন্দের গুণাগুণ নিরূপণ করতে পারবেন এবং তিনি সমস্ত আইন ও বিধি-বিধান প্রণেতা।

তিনি তাঁর মনোনীত বার্তাবাহক তথা নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে যে আসমানী বিধি-বিধান, নিয়ম-নীতি প্রদান করেছেন, আমাদের সকল কাজ-কর্ম ও আচার-আচরণের ক্ষেত্রে তা মেনে চলতে হবে পুরোপুরিভাবে। রাসূলে করীম (স) সর্বশেষ প্রেরিত রাসূল। তাঁর শিক্ষা ও বার্তাসমূহ সংরক্ষিত হয়েছে সর্বোত্তমভাবে। প্রাচীনকালে নাযিলকৃত কোনো বাণীই এখন আমরা অকৃত্রিমভাবে পাই না। মানবজাতির মধ্যে অবাঞ্ছিতভাবে যে আত্মঘাতী যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে, তার ফলে এগুলো বিনষ্ট হয়ে গেছে। এ ধারার একমাত্র ব্যতিক্রম ঘটেছে কুরআন মজীদের ক্ষেত্রে এবং সর্বশেষ আসমানী বিধান সন্নিবেশিত হয়েছে এ কিতাবে ; আর এটাই স্বাভাবিক যে, একই আইন দাতার দেয়া পুরাতন বিধি-বিধান বাতিল ঘোষিত হয়ে যায় সর্বশেষ বিধি-বিধান জারী হলে।

পরিশেষে ইসলামী জীবনাচরণের বৈশিষ্ট্যের প্রতি আলোকপাত করা যেতে পারে। মুসলমানকে দৈনন্দিন আচরণে আসমানী বিধানসমূহ মেনে চলতে হয়। ব্যক্তি হিসেবে তাকে যেমন এগুলো অনুসরণ করতে হয়, তেমনি তাকে অনুসরণ করতে হয় সমষ্টির অংশ হিসেবে। জাগতিক তথা আধ্যাত্মিক উভয় ক্ষেত্রেই এ বিধানগুলো প্রযোজ্য। তাছাড়া আদর্শের প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্যে এখানে প্রত্যেককেই তার সাধ্য ও সামর্থ অনুসারে কাজ করতে হয়। কারণ এটা এমন একটি আদর্শ যা আসমানী প্রত্যাদেশের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং এর লক্ষ হলো সকল মানুষের কল্যাণ সাধন।

এটা স্পষ্ট যে, ইসলাম এমন একটা জীবন বিধান, যার ব্যাপ্তি রয়েছে সমস্ত জীবন জুড়ে। জাগতিক ও আধ্যাত্মিক উভয় বিষয়ই এর অন্তর্ভুক্ত এবং পৃথিবীতে একজন বেঁচে থাকে কেবলমাত্র মৃত্যুর পরবর্তী জীবন তথা আখিরাতের প্রস্তুতি গ্রহণের উদ্দেশ্যে। এ ছাড়া পৃথিবীতে একজন মানুষের বেঁচে থাকার অন্য কোনো কারণ নেই।

❐

চতুর্থ অধ্যায়

ঈমান ও বিশ্বাস

মানুষ হরেক রকম বিষয়ের ওপর আস্থা রাখে। সে প্রতিষ্ঠিত রীতিনীতি এবং ধ্যান-ধারণাগুলোকে বিশ্বাস করে। সে বিশ্বাস করে সমাজের প্রচলিত কুসংস্কারে, কখনো আবার এমন সব বিষয়ে যেগুলো সুস্পষ্টভাবে ভ্রান্ত ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত। বয়স, অভিজ্ঞতা এবং অন্যান্য কারণে মানুষের এ সমস্ত বিশ্বাসে পরিবর্তন আসতে পারে। কিন্তু এমন কতকগুলো বিশ্বাস আছে যেগুলোর ব্যাপারে একটি জনগোষ্ঠীর সকলেই ঐকমত্য পোষণ করে থাকে। এ প্রসঙ্গে নিজের অস্তিত্ব ও অবস্থান সম্পর্কে মানব মনের প্রশ্নগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ, যেমন সে কোথা থেকে এসেছে ? কোথায় তার গন্তব্যস্থল ? কে তাকে সৃষ্টি করেছে ? তার বেঁচে থাকা বা অস্তিত্বের উদ্দেশ্যই বা কি ? অধিবিদ্যা (Metaphysics) মানব মনের এসব জিজ্ঞাসার জবাব দেয়ার চেষ্টা করলেও ব্যাপক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এবং আনুসংগিক অন্যান্য প্রশ্নের জবাব পাওয়া যাবে ধর্মতত্ত্বে।

বিশ্বাস সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তিগত ব্যাপার হলেও বিশ্বাসকে উপলক্ষ করে মানবেতিহাসে বহুবার সংঘাত বেধেছে। এ সংঘাত যেমন আত্মঘাতি তেমনি বর্বরোচিত ও লোমহর্ষক। কখনো কখনো এর ব্যাপকতা এতো বেশি ও ভয়াবহ হয় যে, তা জন্তু-জানোয়ারকেও হার মানায়। এ প্রসংগে ইসলামের মৌল নীতিটি আল্লাহর কালাম কুরআন মজীদে বিধৃত হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ

لَآ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ ج قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ج فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى ق لاَانْفِصَامَ لَهَا ط وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝ ـ البقرة : ٢٥٦

"দীন সম্পর্কে জোর জবরদস্তি নেই। সত্যপথ ভ্রান্তপথ হতে সুস্পষ্ট হয়েছে। যে তাগুতকে অস্বীকার করে ও আল্লাহকে বিশ্বাস করে সে এমন এক মজবুত হাতল ধরে যা কখনো ভাঙবে না। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, প্রজ্ঞাময়।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২৫৬

ইসলামের দৃষ্টিভংগী এই যে, জোরজবরদস্তি করে কাউকে কোনো বিষয়ে বিশ্বাস করানো যায় না। বরং তাদের অজ্ঞানতা দূর করার জন্য

আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে। প্রচেষ্টা চালাতে হবে তাদেরকে সৎপথে পরিচালনার জন্য, ইসলামের দৃষ্টিতে এটা মস্তবড় বদান্যতা। এমন কি এ ধরনের পরিশ্রমকে কুরবানীর সাথে তুলনা করা যায়।

মানুষের জ্ঞান বা বুদ্ধি সবসময় ক্রমবিকাশের ধারায় এগিয়ে যায়। এমন একটি সময় ছিলো যখন চিকিৎসা বা গণিতবিদ্যা সম্পর্কে একজন গ্যালেন বা ইউক্লিডের জ্ঞানকে পর্যাপ্ত বলে ধরে নেয়া হতো। বর্তমান সময় সে জ্ঞানকে বড়জোর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সমমানের বলা যেতে পারে। কিন্তু কোনোক্রমেই জ্ঞানের সে স্তরকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপযোগী বলা যাবে না। কারণ বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রকে এর চেয়ে বহুগুণ বেশি জ্ঞান অর্জন করতে হয়। অনুরূপ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে আল্লাহ সম্পর্কে মানুষের ধারণার ক্ষেত্রে।

সম্ভবত প্রাচীন লোকেরা তাঁর সম্পর্কে একটি বিমূর্ত ধারণাও দিতে পারতো না। এমন কি তাঁর মহৎ গুণাবলী বর্ণনার ক্ষেত্রে তাদের ভাষাও ছিলো দুর্বল। ফলে আল্লাহর গুণাবলীর বিবরণ দিতে গিয়ে এমন সব শব্দ প্রয়োগ করতো যা বিমূর্ত ধারণার সাথে বড় একটা সামঞ্জস্যপূর্ণ হতো না। বস্তুতপক্ষে আল্লাহ্ নিরাকার। তিনি সকল প্রকার ধরা ছোঁয়ার বাইরে। তাঁর ইবাদাত-বন্দেগীর জন্য কোনো প্রতীক বা প্রতিমার প্রয়োজন হয় না।

ইসলামে অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে যে, একই সময়ে মানুষের মধ্যে পাওয়া যাবে দুটি উপাদান। একটি তার দেহ অপরটি তার আত্মা। এখানে একটি উপাদানের সর্বাঙ্গীন বিকাশের প্রয়োজনে অপরটিকে উপেক্ষা করা উচিত নয়। অন্য সবকিছুকে পরিহার করে কেবলমাত্র আত্মিক উৎকর্ষতা অর্জনের জন্য ব্যাপৃত থাকাটা ফেরেশতাদের কাজ। কেউ যদি সাধনার এ ধারায় অগ্রসর হয় তাহলে বুঝতে হবে যে, তার মধ্যে ফেরেশতা হওয়ার আকাঙ্ক্ষা বিদ্যমান রয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা ফেরেশতাগণকে একটি স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। অপরদিকে সে অন্য সবকিছুকে উপেক্ষা করে কেবলমাত্র পার্থিব ক্রিয়াকর্মের মধ্যে নিমগ্ন থাকলে তার অবনতি ঘটবে। তখন সে শয়তানের পর্যায়ে নেমে না গেলেও অন্তত পশু বা উদ্ভিদের স্তরে পৌঁছে যাবে। দুনিয়ায় মানুষ ছাড়া আরো অনেক সৃষ্টি রয়েছে। যারা পার্থিব কার্যক্রম নিয়ে ব্যাপৃত থাকে। মানুষের কর্তব্য হলো একই সময়ে দেহ ও আত্মার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে চলা। অন্যথায় এ দুটি উপাদান বা ক্ষমতা দিয়ে মানব সৃষ্টির মূলে যে উদ্দেশ্য রয়েছে তা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

মুসলমানগণ ধর্মীয় বিশ্বাস সম্পর্কে শিক্ষা পেয়েছে আল্লাহর নবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর নিকট থেকে। একদিন ঈমান সম্পর্কে প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে রাসূল (স) নিজেই বলেছেন যে, তোমরা বিশ্বাস রাখবে এক আল্লাহর ওপর, তাঁর বার্তাবাহক ফেরেশতাগণের ওপর, আসমানী কিতাব, প্রেরিত নবী-রাসূল, আখিরাত, পুনরুত্থান ও শেষ বিচার এবং আল্লাহ যে ভালো-মন্দের নির্ধারক সে বিষয়ের ওপর। একই সময়ে তিনি কর্মের ক্ষেত্রে আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণের তাৎপর্য এবং আনুগত্য প্রকাশের সর্বোত্তম পন্থা সম্পর্কে শিক্ষা দিয়েছেন। এ বিষয়ে পরবর্তী দুটি অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে।

আল্লাহ তাআলা

যারা নাস্তিক, যারা বহু দেববাদে বিশ্বাসী এবং যারা এক ইলাহ-এর সাথে অন্য কোনো কিছুর শরীকানা স্থাপন করে, তাদের সাথে মুসলমানদের কোনো আপোস নেই। আরবী পরিভাষায় একক ও অদ্বিতীয় প্রভু হচ্ছেন আল্লাহ। তিনি বিশ্বজগতের স্রষ্টা ও প্রতিপালক।

যে লোকটি সবচেয়ে সহজ সরল, সেকেলে ধরনের এবং চরম মূর্খ সেও ভালোভাবেই জানে যে, কেউ কখনো নিজেই নিজের স্রষ্টা হতে পারে না। এখানে অবশ্যই একজন স্রষ্টা থাকবেন। তিনি আমাদের এবং সমগ্র বিশ্বজগত সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু যারা নাস্তিক ও বস্তুবাদী তারা কখনো এ ধরনের যুক্তির প্রতি সাড়া দেয় না।

বহু দেববাদে বিশ্বাস করলে দেবতাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব বা সংঘাত বাধা স্বাভাবিক। অন্তত অনিবার্য কারণেই তাদের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টনের ব্যাপারে সমস্যা দেখা দেবে। একটু অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি নিয়ে তাকালে দেখা যাবে যে, এ বিশ্বজগতের সবকিছুই পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, বেঁচে থাকার জন্য মানুষকে উদ্ভিদ, প্রাণী ও পদার্থ এমন কি তারকারাজিরও সাহায্য নিতে হয়। আবার এ সমস্ত জিনিসকে কোনো না কোনোভাবে পরস্পরের সাহায্য নিতে হয়। ফলে দেবতাদের মধ্যে কখনো ঐশী ক্ষমতা বণ্টন করার বিষয়টি বাস্তবসম্মত হতে পারে না।

ভাবুকদের কেউ কেউ আবার দুজন দেবতার কথা কল্পনা করে থাকেন। একজন দেবতা ভালো কাজ এবং অপরজন মন্দ কাজের জন্য। কিন্তু প্রশ্ন হলো তারা কি পরস্পরের মধ্যে সমঝোতা ও সহযোগিতার ভিত্তিতে কাজ করবে, নাকি দুজনের মধ্যে কোন্দল ও বিবাদের উদ্ভব হবে ? প্রথমত এ

ধরনের দ্বৈততা নিষ্প্রয়োজন এবং অর্থহীন বলেই প্রতীয়মান হয়। ভালো কাজের দেবতা যদি মন্দ কাজের দেবতাকে মন্দ কাজ করার সুযোগ দেয় তাহলে সেও দুষ্কর্মের সহযোগী হিসেবে বিবেচিত হবে। অর্থহীন হয়ে পড়ে দ্বৈততা বা ক্ষমতা ভাগাভাগীর মূল উদ্দেশ্য। দ্বিতীয়ত একথা স্বীকার করতেই হবে যে, ভালো মন্দের দ্বন্দ্বে মন্দের দেবতাই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বিজয়ী হবে। এভাবেই প্রতিষ্ঠিত হবে তার শ্রেষ্ঠত্ব। এমতাবস্থায় যে দুর্বল এবং নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে অসমর্থ, কোন্ যুক্তিতে লোকে তাকে দেবতা হিসেবে মেনে নিবে ? তাছাড়া মন্দের কথাটি একটি আপেক্ষিক ব্যাপার। একজনের কাছে যে জিনিসটি মন্দ বলে পরিগণিত হয়, আরেক জনের জন্য সে জিনিসটি চিহ্নিত হয় ভালো হিসেবে। এবং যেহেতু অবিমিশ্র মন্দ বলতে কোনো জিনিসের অস্তিত্ব নেই সেহেতু দেবতাদেরকে কোনো মন্দগুণে বিশেষিত করা যায় না।

বস্তুতপক্ষে কেবলমাত্র নিরংকুশ তাওহীদ-ই মানবজাতির কাছে যুক্তিগ্রাহ্য হতে পারে। আল্লাহ্ এক এবং একক। তিনি ভালো মন্দ সবকিছু করার পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন। সুতরাং তার গুণরাজিও অসংখ্য অগণিত। আল্লাহ কেবলমাত্র স্রষ্টাই নন, তিনি সবকিছুর প্রতিপালক, তাঁর আধিপত্য রয়েছে বিশ্বজগতে এবং নভোজগতে। এমন কি তাঁর অবগতি ও হুকুম ছাড়া একটি জিনিসও নড়াচড়া করে না। রাসূলে করীম (স) বলেছেন যে, আল্লাহ তাআলার প্রধান ৯৯টি গুণের জন্য অতি সুন্দর ৯৯টি নাম রয়েছে। তিনি সবকিছুর স্রষ্টা এবং প্রতিপালক। তিনি সর্বজ্ঞানী, ন্যায়বিচারক, পরম দয়ালু, সর্বত্র বিরাজমান, সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ এবং সবকিছুর নির্ধারক। তাঁর কাছে রয়েছে আমাদের জীবন, মরণ ও পুনরুত্থান।

ওপরের আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে, আল্লাহ্ সম্পর্কে এক একজনের ধারণা এক এক রকম হয়ে থাকে। একজন সাধারণ মানুষ আল্লাহকে যেভাবে অনুভব করে, একজন দার্শনিক তাঁকে দেখে অন্যভাবে। রাসূলে করীম (স) সাধারণ মানুষের ঈমানের এ অনুভূতির গভীরতার প্রশংসা করেছেন। কখনো উপমা হিসেবে উপস্থাপন করেছেন বৃদ্ধার বিশ্বাসকে। যা অটল এবং অকৃত্রিম দৃঢ় প্রত্যয়ে পরিপূর্ণ।

অন্ধলোকদের হাতী দেখার ছোট্ট অথচ চমৎকার কাহিনীটি সকলেরই ভালোভাবে জানা আছে। অন্ধলোকগুলো পূর্বে কখনো হাতী সম্পর্কে কোনো বিবরণ শোনেনি। সুতরাং হাতীটি যখন তাদের সামনে আনা

হলো, তখন প্রত্যেকে অপরিচিত প্রাণীটির দিকে এগিয়ে গেলো। একজন হাতীর শুড়ে হাত রাখলো, একজনে হাত রাখলে হাতীর কানে, তৃতীয়জন হাত রাখলো হাতীর পায়ে, চতুর্থজন নাড়াচাড়া করে দেখলো তার লেজ, অপরজন গিয়ে ধরল তার দাঁত। অবশেষে তারা ফিরে এলো। নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকে নিজেদের অনুভূতি ব্যক্ত করলো। যার যার দৃষ্টিকোণ থেকে তুলে ধরলো হাতীর দৈহিক বিবরণ। একজন বললো, হাতী একটি বিশাল খুটি, দ্বিতীয় জনের মতে এটা মস্তবড় একটা পাখা। কেউ বললো, হাতী আসলে পাথরের মতো একটা শক্ত বস্তু। অন্যজনের কথা হলো, হাতী কোমল এবং হালকা-পাতলা। প্রকৃতপক্ষে তাদের প্রত্যেকেই সঠিক এবং সত্যকথা বলেছিলো। কারণ তাদের কেউ তো হাতীর গোটা অবয়ব দেখতে পায়নি এবং সেটা ছিলো তাদের ক্ষমতার বাইরে।

এবার আমরা অন্ধ লোকগুলোর স্থলে এমন কিছু অনুসন্ধানকারীদের বসিয়ে দেই যারা অদৃশ্যমান এবং নিরাকার আল্লাহকে খুঁজে বেড়ায়। তারা যদি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকে আল্লাহ সম্পর্কে তাদের উপলব্ধি বর্ণনা করে, তাহলে সেখানেও দেখতে পাব ব্যাপক ভিন্নতা। ইসলামের প্রাথমিক যামানার মরমী পুরুষগণ যথার্থভাবে মন্তব্য করেছিলেন যে, "একজন সাধারণ মানুষ আল্লাহকে যেভাবে দেখে তার মধ্যেও একটা সত্যতা আছে। একজন নবদীক্ষিতের দেখার মাঝেও অনুরূপ সত্যতা আছে। সত্যতা রয়েছে আসমানী প্রেরণায় উজ্জীবিত নবী-রাসূলগণের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে, সর্বোপরি আল্লাহ তাআলাই তাঁর সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি জানেন।"

ওপরের আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে, এখানে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষকে তৃপ্ত করার জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ রয়েছে। শিক্ষিত ও অশিক্ষিত, চতুর ও সহজ-সরল, কবি-শিল্পী-আইনবিদ, ধর্মজ্ঞানী এবং অন্যান্য সকল শ্রেণীর সকল মানুষের জন্য একথা প্রযোজ্য। তাদের বিবেচনার আংশিক এবং দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপারে একজনের সাথে আরেকজনের তারতম্য থাকতে পারে। কিন্তু তাদের লক্ষ ও উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন। এ ব্যাপারে কোনো তারতম্য নেই।

মুসলিম পণ্ডিতপ্রবর তথা ফকীহগণ গোটা জীবনব্যবস্থাই কতকগুলো রীতিনীতি এবং বৈধ বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে নির্মাণ করেছেন। এখানে দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলো পরস্পরের সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে অংগ-প্রত্যংগ দিয়েছেন। সেই সাথে আমাদের দান

করেছেন ধীশক্তি ও কর্মক্ষমতা। তার চেয়ে বড় কথা, আল্লাহ তাআলার এ সমস্ত দানের সাথেই জড়িয়ে আছে বিশেষ কতকগুলো দায়িত্ব। আল্লাহ তাআলার ইবাদাত-বন্দেগী করা, তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা, আনুগত্য প্রকাশ করা, যা কিছু তাঁর মহান সত্তা ও মর্যাদার সাথে অসংগতিপূর্ণ তা পরিহার করা—এসব কিছুর সমন্বয়েই গড়ে ওঠে প্রত্যেকের ব্যক্তিগত দায়িত্ব। প্রত্যেককেই এ সমস্ত দায়িত্ব পালনের জন্য ব্যক্তিগতভাবে আল্লাহর নিকট দায়ী থাকতে হয়।

ফেরেশতা

আল্লাহ তাআলা অদৃশ্যমান। তিনি সকল প্রকার বস্তুগত ধ্যান-ধারণা, উপলব্ধি ও অনুভূতির অতীত। সে কারণেই তাঁর সাথে মানুষের সংযোগের জন্য কিছু একটা মাধ্যম প্রয়োজন। অন্যথায় মহান আল্লাহর ইচ্ছা ও বিধান সম্পর্কে জানা ও তা মেনে চলা মানুষের পক্ষে সম্ভব হতো না। আল্লাহ তাআলা শুধু আমাদের দেহকেই সৃষ্টি করেননি বরং তিনি আমাদের সকল প্রকার ধীশক্তি ও কর্মক্ষমতারও স্রষ্টা। কর্মক্ষমতাগুলোও আবার বৈচিত্রময় এবং প্রত্যেকটি কর্মক্ষমতারই বিকাশ উন্নয়ন সম্ভব। তিনি আমাদেরকে আরো এমন অনেক বিষয়বস্তু দান করেছেন যেগুলোর সাহায্যে আমরা নিজেদের সঠিক পথে পরিচালনা করতে পারি।

মানুষের মধ্যে রয়েছে দুটি প্রেরণা। একটি সু, অপরটি কু—মানুষ এ দুটো প্রেরণা দ্বারাই অনুপ্রাণিত হতে পারে। কখনো কখনো এমন হতে পারে যে, সাধারণ মানুষের মধ্যে যারা ভালো তারা কুকর্মের প্ররোচনায় প্ররোচিত হলো। কখনো আবার মন্দ লোকেরা অনুপ্রাণিত হলো ভালো কাজের জন্য। আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য সূত্র থেকেও তারা ভালো বা মন্দ কাজের জন্য উৎসাহ পেতে পারে। যেমন শয়তানের নিকট থেকেও তারা মন্দ কাজের জন্য উৎসাহ অনুপ্রেরণা পেয়ে থাকে। বস্তুতপক্ষে আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমতই মানুষের বিবেক বিবেচনা শক্তিকে সচল রাখে। আল্লাহর রহমতেই আমরা কোন্‌টা ভালো, কোন্‌টা মন্দ, কোন্‌টা হালাল কোন্‌টা হারাম তা নির্ণয় করতে পারি।

আল্লাহর সাথে মানুষের সংযোগ স্থাপন বা যোগাযোগের বিভিন্ন পথ রয়েছে ঃ

[ক] কেউ কেউ স্রষ্টার প্রতিমূর্তির কথা বলে থাকে, এ ধারণাকে ইসলাম সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে। যে সত্তা বিশ্বজগতের অতীত তাঁর পক্ষে মনুষ্যরূপ গ্রহণ করা, পানাহার করা, তাঁর সৃষ্টিরাজির দ্বারা নির্যাতিত

হওয়ার বিষয়টি একেবারেই অযৌক্তিক। নিরলস সাধনা বলে মানুষ আল্লাহ তাআলার যত নৈকট্য লাভ করুক না কেন, সফলতার যত সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছুক না কেন, সে মানুষের বৈশিষ্ট্য নিয়েই বেঁচে থাকে। আল্লাহ তাআলার নিকট থেকে তার অবস্থান থাকে অনেক অনেক দূরে। সূফীয়ায়ে কিরামের মতে আল্লাহর বিধান অনুসারে কাজ করতে গিয়ে মানুষ নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিলীন করে দিতে পারে, ম্লান করে দিতে পারে তার ব্যক্তিত্ব ও সত্তাকে। তবু একথায় বিন্দুমাত্র দ্বিধা সন্দেহ নেই যে, মানুষ মানুষ হিসেবেই টিকে থাকে। তাকে মানবীয় দুর্বলতার শিকার হতে হয় আর আল্লাহ তাআলা এ সমস্ত অসম্পূর্ণতা এবং সীমাবদ্ধতা থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত।

আরো অনেক উপায়ে আল্লাহর সাথে মানুষের সংযোগ স্থাপিত হতে পারে এবং সেগুলো মানুষের আয়ত্তের মধ্যে রয়েছে।

[খ] সম্ভবত স্বপ্ন হলো তন্মধ্যে সবচেয়ে সাধারণ উপায়। রাসূলে করীম (স) বলেছেন, ভালো স্বপ্নের মধ্যে আল্লাহর ইচ্ছার প্রকাশ ঘটে এবং এভাবেই তিনি মানুষকে সত্য পথের সন্ধান দেন।

[গ] আল্লাহর সাথে মানুষের সংযোগ স্থাপনের আরেকটি মাধ্যম হলো ইলকা। এর শাব্দিক অর্থ কারো দিকে কোনো কিছু নিক্ষেপ করা। এটাকে বলা যেতে পারে এক ধরনের আত্মসম্মোহন, স্বতঃস্ফূর্ত জ্ঞান বা প্রজ্ঞা। কোনো জটিল ও দুর্বোধ্য কোনো সমস্যা সমাধানের প্রেক্ষিতেই মানুষ ইল্‌কা পেয়ে থাকে।

[ঘ] এ রকম আরেকটি মাধ্যম হলো ইলহাম। এটাকে আসমানী প্রেরণা হিসেবে ব্যাখ্যা করা যায়। যার আত্মা যথেষ্ট পরিমাণ বিকশিত, ন্যায়বিচার, বদান্যতা, নিঃস্বার্থপরতা এবং অপরের উপকার করার ইচ্ছার মতো গুণরাজি যার মধ্যে রয়েছে তার অন্তরে কতগুলো পূর্বাভাস ধরা পড়ে। এ পূর্বাভাসটাই হলো ইলহাম। সকল দেশের সকল যুগের সূফী-দরবেশগণ স্রষ্টার এ অনুগ্রহ পেয়ে ধন্য হয়েছেন। কেউ যখন নিজেকে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর নিকট সপে দেয়, ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করে নিজের সত্তাকে, তখন স্বল্প সময়ের জন্য এমন কতগুলো মুহূর্ত আসে যখন বিদ্যুত চমকের মতো তার অন্তরের মাঝে আল্লাহর অস্তিত্বের অনুভূতি প্রবল হয়ে ওঠে। এভাবে মানবাত্মা আলোকিত হয়। সেখানে তখন বিরাজ করে দৃঢ় বিশ্বাস, সন্তুষ্টি এবং সত্যকে উপলব্ধি করার মতো একটি প্রস্তুতি। আল্লাহ তাআলা তখন তাঁকে তার কর্মধারা ও চিন্তাকে সঠিক পথে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন।

আল্লাহর প্রেরিত নবী-রাসূলগণও অন্যান্য বিষয়াদির মধ্যে এ ধরনের নির্দেশ পেয়ে থাকেন। যা হোক একথা সত্য যে, মানুষের পক্ষে গোটা বিষয়টিকে অনুধাবন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ভ্রান্তির সম্ভাবনা থেকে যায়। সূফীয়ায়ে কেরাম বিষয়টির প্রতি আলোকপাত করে বলেছেন যে, উচ্চ পর্যায়ের একজন ধার্মিক ব্যক্তিও সামান্য অহমিকাজনিত কারণে ধ্বংসের পথে চলে যেতে পারে। কারণ কখনো কখনো প্রেরণাগুলো আল্লাহর তরফ থেকে পরীক্ষা হিসেবে আসে । কিন্তু সবসময় তার পক্ষে প্রেরণাগুলোর মধ্যকার পার্থক্য নিরূপণ করা সম্ভব হয় না।

[ঙ] স্রষ্টার সাথে মানুষের সর্বোচ্চ পর্যায়ের যোগাযোগের আরো একটি মাধ্যম রয়েছে। রাসূল (স) এটাকে বলেছেন ওহী। বস্তুতপক্ষে যোগাযোগের এটাই সবচেয়ে নিশ্চিত ও অভ্রান্ত মাধ্যম। এটা কোনো সাধারণ প্রেরণা নয় বরং আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের তরফ থেকে মানুষের নিকট সত্য সঠিক প্রত্যাদেশ। এ হচ্ছে আসমানী যোগাযোগ। মানুষ বস্তুজগতের একটি অংশ। পক্ষান্তরে আল্লাহ্ জাল্লা শানহু বস্তুজগত ও আত্মাজগতের ঊর্ধে এক পরম সত্তা। তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন সবাই তাঁর মুখাপেক্ষী। সকল প্রকার ধরাছোঁয়ার বাইরে তাঁর অবস্থান। সে কারণেই তাঁর সাথে মানুষের সরাসরি কোনো রকম শারীরিক যোগাযোগ সম্ভব নয়। তিনি সর্বত্র বিরাজমান। কুরআন মজীদে এরশাদ হয়েছে, وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ -"আমি তার গ্রীবাস্থিত ধমনি অপেক্ষাও নিকটতর" (সূরা কাফ ঃ ১৬)। অথচ বস্তুগতভাবে তাঁর সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা অসম্ভব। এমতাবস্থায় একজন ফেরেশতা বা মালাক সংযোগ স্থাপনের মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করে থাকেন। মালাক-এর শাব্দিক অর্থ বার্তাবহনকারী। এখানে এটা ব্যবহৃত হয়েছে অশরীরি বা ঊর্ধজগতের বার্তাবাহক হিসেবে। সাধারণভাবে এঁরা ফেরেশতা নামে পরিচিত। এঁরা আল্লাহর বাণীকে তাঁর প্রতিনিধি বা খলীফা নবী-রাসূলগণের নিকট পৌঁছে দেন। নবী-রাসূলগণ ছাড়া আর কারো কাছে ফেরেশতাদের মাধ্যমে আসমানী বাণী পৌঁছে না। এখানে অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে যে, ইসলামে নবী-রাসূল বলতে এমন কাউকে বুঝায় না যিনি অনুমানে কথা বলেন বা ভবিষ্যদ্বাণী করেন। বরং তাঁরা হলেন একান্তভাবেই আল্লাহর প্রতিনিধি, তাঁদের স্বজাতির জন্য আসমানী বার্তাবাহক। এখানে বলে রাখা আবশ্যক যে, ফেরেশতাগণের পরিচয়, তাদের স্বতন্ত্র সত্তা বা অবস্থা সম্পর্কে এখানে আলোচনা করার অবকাশ নেই। কুরআনের বর্ণনা অনুসারে যে ফেরেশতা নবী-রাসূলগণের নিকট ওহী নিয়ে আসেন তিনি

জিবরাঈল (আ)। জিবরাঈল শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থ "আল্লাহর শক্তি"। কুরআনুল করীমে মিকাঈল (আ) ফেরেশতার উল্লেখ আছে। কিন্তু তাঁর কার্যক্রম সম্পর্কে কিছুই বলা হয়নি। জাহান্নামের দায়িত্বে যিনি আছেন, তাঁর নাম মালিক। নামটির শাব্দিক অর্থ অধিনায়ক বা স্বত্বাধিকারী। কুরআন মজীদে আরো অনেক ফেরেশতার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু তাঁদের নাম বা গুণাবলীর কোনো উল্লেখ সেখানে নেই। এঁরা সবাই আল্লাহর হুকুম প্রতিপালনের কাজে নিয়োজিত।

কুরআন মজীদের বর্ণনানুসারে জিবরাঈল (আ)-এর আরেক নাম রুহুল আমীন। এর অর্থ হচ্ছে বিশ্বস্ত আত্মা। সকল ফেরেশতার মধ্যে জিবরাঈল (আ)-এর স্থান সবার শীর্ষে। রাসূলে করীম (স)-এর হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি যে, জিবরাঈল (আ) সবসময় একই সুরতে হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর নিকট উপস্থিত হননি। রাসূলে করীম (স) তাঁকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে দেখেছেন। তিনি তাঁকে দেখেছেন বাতাসে ভাসমান অবস্থায়, কখনো মানুষের সুরতে, কখনো আবার তাঁকে দেখেছেন ডানাবিশিষ্ট অবস্থায়। ইবনে হাম্বল (র)-এর সংকলিত এক বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, "একদিন বেশ কিছু সাহাবায়ে কিরামের উপস্থিতিতে প্রিয়নবী (স)-এর দরবারে একজন অপরিচিত লোক হাজির হলেন। তিনি নবী করীম (স)-কে লক্ষ করে কতকগুলো প্রশ্ন করলেন। অতপর তিনি সেখানে থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। এ ঘটনার বেশ কিছুদিন পর রাসূল (স) সাহাবায়ে কেরামকে বললেন, সেদিন যিনি আমাকে প্রশ্ন করেছেন, তিনি আল্লাহর ফেরেশতা জিবরাঈল (আ) ছাড়া আর কেউ নন। তিনি এসেছিলেন তোমাদেরকে দীন সম্পর্কে শিক্ষা দেয়ার জন্য। ইতিপূর্বে তাঁকে চিনতে কখনো আমার এত সময় লাগেনি। এটা এ কারণে যে, তিনি সেদিন মহান আল্লাহর কোনো বাণী পৌছে দেয়ার জন্য আসেননি বরং তিনি এসেছিলেন তোমাদেরকে দীন শিক্ষা দেবার জন্য।"

নিম্নের আলোচনা থেকে ওহী কিভাবে নাযিল হতো সে সম্পর্কে বিবরণ পাওয়া যাবে ঃ

নবী করীম (স) বলেছেন, "হযরত জিবরাঈল (আ) আমার নিকট আসতেন এবং চলে যেতেন ঘণ্টা পিটানোর মতো আওয়াজ তুলে। এটা ছিলো আমার জন্য এক কঠিন অভিজ্ঞতা। তিনি যা বলতেন, সুন্দরভাবে আমার স্মরণে গেঁথে যেত। আবার কখনো কখনো তিনি আমার নিকট আবির্ভূত হতেন অবিকল মানুষের বেশে। তিনি তাঁর কথাগুলো আমার নিকট বলে যেতেন। আর আমি তা কণ্ঠস্থ করতাম।"-(বুখারী) একই

বর্ণনাকে ইমাম ইবনে হাম্বল (র) তুলে ধরেছেন এভাবে যে, "নবী করীম (স) বলেছেন, ঘণ্টাধ্বনি শুনে আমি নিশ্চুপ হয়ে যেতাম। ওহী নাযিল হবার সময় আমি ভীষণ রকমের ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়তাম। মনে হতো যে, হয়তো এখনি প্রাণ বেরিয়ে যাবে। প্রত্যক্ষদর্শী সাহাবায়ে কেরাম ওহী নাযিল হবার সময় প্রিয়নবী (স)-এর অবস্থা বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে, যখনই তাঁর নিকট ওহী নাযিল হতো, তখনই তাঁর মধ্যে বিরাজ করতো এক ধরনের শান্ত সম্মোহিত অবস্থা।"-(ইবনে হাম্বল) "অথবা আল্লাহর নবীর নিকট যখনই ওহী নাযিল হতো তখন তিনি অভিভূত হয়ে পড়তেন। এভাবে কেটে যেতো বেশ কিছু সময়। মনে হতো তিনি যেন উদ্বেলিত হয়ে পড়েছেন।"-ইবনে সা'দ

কোনো কোনো বর্ণনায় উল্লেখ আছে যে, "তাঁর নিকট ওহী নাযিল হতো দিনের শীতল সময়ে। ওহী যখন শেষ হতো তখন তাঁর মুখাবয়বে ফুটে উঠতো মুক্তার দানার মতো বিন্দু বিন্দু ঘাম।"-(বুখারী) বর্ণিত আছে যে, "একবার যখন ওহী নাযিল হবার সময় হলো তখন তিনি একটি কাপড়ের মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে দিলেন। রাসূল (স)-এর মুখাবয়ব রক্তিম বর্ণ ধারণ করলো। ঘুমের ঘোরে নাক ডাকার মতো শব্দ হতে লাগলো। অতপর এ অবস্থা কেটে গেলো।"-(বুখারী) "যখনই তাঁর নিকট ওহী নাযিল হতো তখনই তাঁকে যাতনাক্লিষ্ট মনে হতো। ম্লান হয়ে যেত তাঁর চেহারা মুবারক।"-(ইবনে সা'দ) "যখন তাঁর নিকট ওহী আসতো আমরা তাঁর পাশে থেকে মৌমাছির গুনগুন শব্দের মতো মিষ্টি আওয়াজ শুনতে পেতাম।" (ইবনে হাম্বল ও আবু নুয়াইম) আবার এ রকম বর্ণনা রয়েছে যে, "ওহী নাযিল হবার সময় রাসূল (স) অসহনীয় যন্ত্রণা অনুভব করতেন এবং তাঁর ঠোঁট নড়তে থাকতো।"-(বুখারী শরীফ)

অন্যান্য বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, ওহী নাযিল হবার সময় রাসূলুল্লাহ (স)-এর দেহে ভীষণ রকমের ভার অনুভব করতেন। বর্ণনাকারী বলেছেন যে, "একবার ওহী নাযিল হবার সময় আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে দেখতে পেলাম। তিনি সে সময় উটের পিঠে ছিলেন। উটটি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো। ফেনায়িত হয়ে গেলো তার মুখ এবং সে পাগুলো ভীষণভাবে ঘুরাতে লাগলো। মনে হলো এক্ষুণি হয়ত তা সশব্দে ভেংগে যাবে। কখনো কখনো এমন হয়েছে যে, উট বসে পড়তো। কখনো আবার ওহী নাযিল হবার সময় ধৈর্যের সাথে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে থাকার চেষ্টা করতো। তখন মনে হতো উটের পাগুলো যেনো পেরেক দিয়ে শক্তভাবে আটা। ওহী নাযিল শেষ না হওয়া পর্যন্ত এ অবস্থা অব্যাহত থাকতো। তখন নবীজীর

মুখাবয়ব থেকে মুক্তার দানার মতো বিন্দু বিন্দু ঘাম ঝরে পড়তো। (ইবনে সা'দ) "এবং বোঝার ভারে উটের পাগুলো সশব্দে ভেংগে যাবার উপক্রম হতো।"-(ইবনে হাম্বল)

হযরত যায়িদ বিন সাবিত (রা) তাঁর একদিনের অভিজ্ঞতাকে এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, "ওহী নাযিল হবার সময় রাসূলে করীম (স)-এর পা ছিলো আমার উরুর উপর। পা এতো ভারী হয়ে এলো যে, আমি ভিত হয়ে পড়লাম এবং ভাবলাম আমার পায়ের হাড় হয়ত এক্ষুণি বিকট শব্দে ভেংগে যাবে।"-(বুখারী)। আরেকটি বর্ণনায় অতিরিক্ত একথাটুকু আছে যে, "যদি এটা রাসূলে করীম (স)-এর পা না হতো তাহলে আমি চিৎকার করে উঠতাম এবং আমার পা সরিয়ে নিতাম।"

অন্যান্য বর্ণনায় উল্লেখ আছে যে, "একবার মসজিদের মিম্বারে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় তাঁর নিকট ওহী এলো। তখন তিনি নিশ্চল স্থির হয়ে গেলেন।"-(ইবনে হাম্বল) "একবার যখন তাঁর হাতে রুটি-গোশত ছিলো ঠিক তখনি ওহী নাযিল হলো। ওহী যখন শেষ হলো তখন হাতে ছিলো সেই রুটি ও গোশত।"(-ইবনে হাম্বল)

ওহী নাযিল হবার সময় অবস্থার প্রেক্ষিতে কখনো কখনো নবীজি পিঠ হেলান দিতেন, কখনো আবার সাহাবীগণ শ্রদ্ধা সহকারে কাপড়ের টুকরো দিয়ে তাঁর চেহারা মুবারক ঢেকে দিতেন। কিন্তু কখনো তাঁর চেতনা লোপ পেত না। বা নিজের ওপর তিনি নিয়ন্ত্রণ হারাতেন না। নবুওয়াতের প্রথম দিকে ওহী নাযিল হবার সময় রাসূল (স)-এর নিকট যা নাযিল হতো তিনি বেশ শব্দ করে তা পুনরাবৃত্তি করতেন। কিন্তু অল্প কিছুকাল পরে মক্কায় থাকতেই ওহী নাযিল হওয়ার সময় নাযিলকৃত অংশ পুনরাবৃত্তি করার নিয়মটি বন্ধ করে দেন। এরপর থেকে তিনি ওহী নাযিল শেষ না হওয়া পর্যন্ত নিশ্চুপ থাকতেন। ওহী নাযিল সম্পূর্ণ হলে যথারীতি লিখে রাখার জন্য কাতিবগণকে আবৃত্তি করে শুনাতেন। এ প্রসঙ্গে কুরআন মজীদে উল্লেখ আছে ঃ

لَاتُحَرِّكْ بِهٖ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهٖ ـ القيمة : ١٦

"তাড়াতাড়ি ওহী আয়ত্ত করার জন্য তুমি তোমার জিহবা তাঁর সাথে সাথে সঞ্চালন করো না।"-সূরা কিয়ামাহ ঃ ১৬

আরো বলা হয়েছে যে, তোমার প্রতি আল্লাহর ওহী সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্বে কুরআন পাঠে তুমি ত্বরা করো না।

وَقُلْ رَّبِّ زِدْنِىْ عِلْمًا ○

"এবং বলো, হে আমার রব! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি কর।"-সূরা ত্বা-হা ঃ ১১৪

এবং রাসূল (স) যখন স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতেন তখন যে অংশটুকু নাযিল হয়েছে, তা কাতিবগণকে দিয়ে লিখিয়ে নিতেন। পরে এর কপি সংখ্যা বাড়িয়ে মুসলমানগণের মধ্যে বিতরণ করতেন। "আল মাব'আছ ওয়াল মাগাযি" গ্রন্থে ইবনে ইসহাক উল্লেখ করেছেন যে, যখনই কুরআনুল করীমের কোনো অংশ রাসূল (স)-এর নিকট নাযিল হতো তিনি তা প্রথমে পুরুষদের নিকট আবৃত্তি করতেন এবং পরে মহিলাদের শোনাতেন।

আসমানী কিতাব

আল্লাহ তাআলা সারাজাহানের মালিক। তিনি জান্নাতেরও অধিকর্তা। তিনি স্বাধীন ও সার্বভৌম। তিনি আধ্যাত্মিক ও জাগতিক সকল প্রকার আইনের উৎস। তার চেয়ে বড় কথা, তিনি দয়াপরবশ হয়েই মানুষের কল্যাণার্থে নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। তাঁদের মাধ্যমেই তিনি তাঁর ইচ্ছা ও নির্দেশাবলী ওহীর আকারে মানুষের নিকট পৌঁছে দেন। আল্লাহর তরফ থেকে প্রেরিত এ সমস্ত প্রত্যাদেশ এবং বাণীসমূহের সংগৃহীত ও সংকলিত রূপই হলো আসমানী কিতাব।

হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর প্রচারিত ধর্মমতে কেবলমাত্র কুরআনকেই আসমানী কিতাব হিসেবে চিহ্নিত করা হয়নি। বরং সেখানে অন্যান্য আসমানী কিতাবেরও উল্লেখ রয়েছে। রাসূল (স)-এর শিক্ষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো সহনশীলতা। কুরআনের বিভিন্ন স্থানে এ বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে। যেমন ঃ

كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ قف لَانُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ قف

"তাদের সকলে আল্লাহ তাঁর ফেরেশতাগণ ও তাঁর কিতাবসমূহ ও রাসূলগণের ওপর ঈমান এনেছি। তারা বলে আমরা তাঁর রাসূলগণের মধ্যে কোনো তারতম্য করি না।"-সূরা আল বাকারা ঃ ২৮৫

কুরআন মজীদে ইবরাহীম (আ)-এর কিতাব, মূসা (আ)-এর তাওরাতে দাউদ (আ)-এর যবুর, ঈসা (আ)-এর ইনজিলের উল্লেখ আছে । এবং এগুলোকে স্বীকার করে নিয়েছে আল্লাহ তাআলার তরফ থেকে নাযিলকৃত আসমানী কিতাব হিসেবে।

একথা সত্য যে, হযরত ইবরাহীম (আ)-এর ওপর নাযিলকৃত কিতাবের চিহ্ন এখন আর খুঁজে পাওয়া যায় না। মূসা (আ)-এর তাওরাতের বেলায় যে দুঃখজনক ঘটনা ঘটেছে এবং বিভিন্ন যুগের বিধর্মীদের হাতে কিভাবে তা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে তা সকলেরই জানা আছে। দাউদ (আ)-এর যবুরের ক্ষেত্রেও ঘটেছে একই পরিণতি। ঈসা (আ) তাঁর প্রচারিত বাণীকে লিপিবদ্ধ বা সংকলন করার অবসর পাননি। তাঁর শিষ্য ও উত্তরসূরীরা তাঁর প্রচারিত বাণীসমূহ সংগ্রহ করেন। তারা ভাবী বংশধরদের জন্য আলোচনা সমালোচনার মাধ্যমে অনেকগুলো শুদ্ধি পত্র রেখে যান। কম করে হলেও এ ধরনের সমাচার বা সংশোধিত ইঞ্জিলের সংখ্যা ৭৩টি বলে জানা যায়। তন্মধ্যে চারটি ছাড়া অবশিষ্টগুলোকে বাতিল বলে ঘোষিত হয়েছে। সে যাই হোক না কেনো মুসলমানদের কেবলমাত্র কুরআন মজীদে বিশ্বাস রাখলে চলে না। বরং ইসলাম পূর্ব যুগে যে সমস্ত আসমানী কিতাব নাযিল হয়েছে সে সমস্ত কিতাবে বিশ্বাস রাখাও প্রতিটি মুসলমানের জন্য অবশ্য কর্তব্য—হযরত মুহাম্মাদ (স) বৌদ্ধ, জরদস্ত অথবা ভারতীয় ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রতিষ্ঠাতাদের সম্পর্কে কিছু বলে যাননি। আবেস্তা, বেদ প্রভৃতি যে ঐশী গ্রন্থ তা নিশ্চিত করে বলা যায় না।

নবী ও রাসূল

জিবরাঈল ফেরেশতা আল্লাহর বাণীকে তাঁর মনোনীত ব্যক্তির নিকট পৌঁছে দেন। কুরআনের পরিভাষায় মনোনীত ব্যক্তির বিভিন্ন নামকরণ রয়েছে। যেমন নবী বা রাসূল, মুরসাল বা দূত, বাশীর বা সুসংবাদদাতা, নাযির বা সতর্ককারী ইত্যাদি। তিনি আল্লাহর বাণীকে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেন।

নবী-রাসূলগণও মানুষ। অসাধারণ তাঁদের কর্তব্যবোধ। তাঁরা হলেন সামাজিক, জাগতিক ও আধ্যাত্মিকভাবে উত্তম চরিত্রের উজ্জ্বল আদর্শ। অলৌকিকতা তাঁদের জন্য অত্যাবশ্যকীয় কোনো বিষয় নয়। অবশ্য ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, নবী-রাসূলগণের প্রত্যেকেই মুজিযার অধিকারী ছিলেন এবং তাঁরা সবসময়ই দৃঢ়তার সাথে বলেছেন যে, তাঁদের নিজস্ব ক্ষমতা বলে কোনো কিছু ঘটে না। বরং যা কিছু ঘটে তা আল্লাহর ইচ্ছাতেই ঘটে।

কুরআনের বর্ণনামতে জানা যায় যে, কিছুসংখ্যক নবীর ওপর আসমানী কিতাব নাযিল হয়েছে। আবার এমন কিছু নবী আছেন যাঁদের ওপর কোনো কিতাব অবতীর্ণ হয়নি। সে ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী নবীগণের ওপর যে

কিতাব নাযিল হয়েছে, তাঁদেরকেও সে কিতাব অনুসরণ করতে হয়েছে। এসব কিতাবগুলোতে আল্লাহর একত্ববাদ, ভালো কাজের আদেশ, খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকা প্রভৃতি বুনিয়াদী সত্যের ব্যাপারে কোনো মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয় না। পার্থক্য দেখা যায় সমাজ পরিচালনার বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে একটি জনগোষ্ঠী কতখানি সামাজিক অগ্রগতি সাধন করেছে তাঁর ওপর এ পার্থক্যের পরিমাণ নির্ভর করে। আল্লাহ তা'আলা আনুক্রমিকভাবে নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন। অর্থাৎ একজন নবী বা রাসূলের পর এসেছেন আরেকজন নবী বা রাসূল। নবী বা রাসূল প্রেরণের এ ধারা থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, একজন নবী আসার সাথে সাথে পূর্বের সমস্ত বিধি-বিধান, নিয়ম-কানুন রহিত হয়ে যায়। জারী করা হয় নতুন নিয়ম। অবশ্য নতুন নিয়ম-নীতিগুলোর পাশাপাশি পুরাতন কিছু কিছু নিয়ম-নীতি অব্যাহত থাকে।

কোনো কোনো নবী-রাসূলের ওপর কেবলমাত্র একটি গোত্র বা বংশের লোকদেরকে আল্লাহর পথে আহবানের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। আবার কোনো কোনো নবীর ওপর অর্পিত হয়েছে একটি জাতি বা একটি অঞ্চলের লোককে শিক্ষা দেয়ার দায়িত্ব। কারো কর্ম পরিধি অনেক— ব্যাপক সমগ্র মানবতা ব্যাপী এবং সকল যুগে তার বিস্তৃতি ঘটেছে।

কিছুসংখ্যক নবী-রাসূল সম্পর্কে কুরআন মজীদে উল্লেখ রয়েছে। এঁদের মধ্যে আছেন হযরত আদম (আ) হযরত ইউনুছ (আ), হযরত নূহ (আ), হযরত ইবরাহীম (আ), হযরত ইসমাঈল (আ), হযরত ইসহাক (আ), হযরত দাউদ (আ), হযরত মূসা (আ), হযরত সালিহ (আ), হযরত হুদ (আ), হযরত ঈসা (আ) এবং হযরত মুহাম্মাদ (স)। কুরআন মজীদে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, মুহাম্মাদ (স)-এর পূর্বে আরো অনেক নবী ছিলেন। তিনি হলেন সর্বশেষ নবী খাতামুন নাবিয়ীন অর্থাৎ তাঁর পরে আর কোনো নবী আসবেন না।

আখিরাত

প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ (স) বিচারের দিনে বিশ্বাস রাখার জন্য তাকিদ দিয়েছেন। সেদিন আল্লাহর হুকুমে গোটা বিশ্ব ধ্বংস হয়ে যাবে। যে আল্লাহ আমাদের প্রথম সৃষ্টি করেছিলেন তিনি আমাদের পুনর্জীবন দান করবেন। তখন তিনি আমাদের বিচার করবেন ইহলৌকিক জীবনের কাজ-কর্মের নিরিখে। ভালো কাজের জন্য তিনি পুরস্কার দেবেন। মন্দ কাজের জন্য দেবেন কঠিন শাস্তি। এ প্রসঙ্গে কুরআন মজীদে বলা হয়েছে যে,

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ أُخْفِيَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ ۚ جَزَآءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ○

"কেউ জানে না তাদের নয়ন প্রীতিকর কী লুকিয়ে রাখা হয়েছে তাদের কৃতকর্মের পুরস্কার স্বরূপ।"–সূরা আস সাজদা ঃ ১৭

অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

وَعَدَ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِيْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ؕ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ اَكْبَرُ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ○ - التوبة : ٧٢

"আল্লাহ মু'মিন নর-নারীকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন জান্নাতের—যার নিম্নদেশ দিয়ে নহর প্রবাহিত, যেখানে তারা স্থায়ী হবে এবং স্থায়ী জান্নাতের উত্তম বাসস্থানের। আল্লাহর সন্তুষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সেটাই মহাসাফল্য।"–সূরা আত তাওবা ঃ ৭২

কুরআন মজীদে আরো উল্লেখ আছে ঃ

لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوا الْحُسْنٰى وَزِيَادَةٌ ؕ - يونس : ٢٦

"যারা ভালো কাজ করে তাদের জন্য আছে কল্যাণ এবং আরো অধিক।"–সূরা ইউনুস ঃ ২৬

জান্নাত প্রসংগে রাসূল (স)-এর একটি বহুল প্রচলিত হাদীস রয়েছে। রাসূল (স) বলেছেন যে, পুণ্যবান বান্দাদের জন্য ঃ আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে এমন সব জিনিস তৈরী করে রেখেছেন যা কখনো কারো দৃষ্টিতে আসেনি, কর্ণগোচর হয়নি, এমন কি যে জিনিসগুলোর কথা সে কোনো দিন ভাবতেও পারেনি। হাদীস গ্রন্থে আরো উল্লেখ আছে যে, জান্নাতে প্রবেশের যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিগণ জান্নাতে প্রবেশ করার পর আল্লাহ তা'আলা প্রশ্ন করবেন—বলো, তোমাদের জন্য আমি আর কি করতে পারি। বস্তুত পক্ষে জান্নাত প্রাপ্তি এবং জাহান্নামের অগ্নিকুণ্ড থেকে অব্যাহতি লাভ তাদের জন্য মস্তবড় সম্মানের ব্যাপার। এতবড় সম্মান পেয়ে তারা খুবই বিস্মিত ও অভিভূত হবে এবং আল্লাহ তা'আলার নিকট যে কী চাইবে তারা তা বুঝে উঠতে পারবে না। এরপর আল্লাহ জাল্লা শানহু পর্দা সরিয়ে ফেলবেন। তখন তারা অপলক চোখে আল্লাহর দিকে তাকিয়ে থাকবে। মহান রাব্বুল আলামীনের উত্তম এবং প্রিয় আর কোনো জিনিস তাদের নজরে পড়বে না।-(বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী) অন্য কথায় বলা

যেতে পারে যে, আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের সুযোগই হলো একজন মু'মিনের জন্য সর্বোচ্চ এবং প্রকৃত পুরস্কার। বস্তুতপক্ষে আখিরাত সম্পর্কে যারা অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে, হৃদয় দিয়ে একে অনুভব করে, ভালো কাজের পুরস্কার হিসেবে জান্নাত কেবল তাদেরই প্রাপ্য। এ ধরনের একটি পরিপূর্ণ দৃষ্টিভংগী নিয়েই কুরআন মজীদ ও হাদীস শরীফের বর্ণনাগুলো অধ্যয়ন করতে হবে। সেখানে সাধারণ মানুষের জন্য জান্নাতের সুখ-শান্তি এবং জাহান্নামের দুর্ভোগ সম্পর্কে মানুষকে বার বার স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। উদাহরণ-উপমাগুলো নেয়া হয়েছে পার্থিব জগতের পারিপার্শ্বিক পরিবেশ ও পরিস্থিতি থেকে। বলা হয়েছে যে, জান্নাতে রয়েছে বাগান, ছোট ছোট নদী বা ঝর্ণাধারা, হুর-পরী ও কারুকার্য খচিত পোশাক ও গালিচা, মূল্যবান পাথর ও মণিমুক্তা, সুস্বাধু ফল-মূল ও পানীয়। তাছাড়া মানুষ সেখানে যা প্রত্যাশা করে তাই পাবে। অনুরূপভাবে জাহান্নামে রয়েছে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড, বিষাক্ত পোকা-মাকড়, ফুটন্ত বা হিম শীতল পানি। আরো বর্ণনা রয়েছে অসংখ্য রকমের নির্যাতন নিপীড়ন সম্পর্কে, দুর্যোগ-দুর্ভোগের পরও সেখানে কোনো মৃত্যু নেই, সুযোগ নেই নিদারুণ শাস্তির হাত থেকে অব্যাহতি লাভের।

আখিরাত সম্পর্কে এ রকম বিবরণ দেয়ারও কারণ রয়েছে। বিশাল জনগোষ্ঠীর কথা চিন্তা করলে এবং যাদের প্রতি আল্লাহর বাণী নাযিল হয়েছে, তাদের দিকে লক্ষ করলেই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যেমন সকল মানুষের বুদ্ধি, মেধা, ও সামর্থ এক রকম নয়। কারো সাথে কথা বলার সময় তার বুদ্ধি, মেধা ও সামর্থের দিকে লক্ষ রাখতে হয়। নবী করীম (স)-এর পবিত্র আখলাক থেকেই আমরা এ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি। একদিন রাসূল করীম (স) সাহাবায়ে কেরামের নিকট জান্নাত এবং জান্নাতের সুখ-শান্তি সম্পর্কে কথা বলছিলেন। এমন সময় একজন বেদুঈন দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলো, সেখানে কি উটও থাকবে ? রাসূল (স) মৃদু হেসে শান্তভাবে বললেন— সেখানে একজন যা কিছু চাবে তাই পাবে।–ইবনে হাম্বল, তিরমিযী।

কুরআন মজীদে জান্নাত ও জাহান্নাম সম্পর্কে আলোচনার উদ্দেশ্য হলো, সাধারণ মানুষকে ন্যায়ানুগ জীবন অবলম্বন এবং সত্য পথে অনুপ্রাণিত করা। আলোচনার বিষয়বস্তু কি, জান্নাত অথবা জাহান্নাম কেমন অথবা এখানে কি কি আছে ? এগুলো একজন মু'মিন মুসলমানের জন্য কোনো মুখ্য বিষয় নয়। কোনো রকম দ্বিধা-দ্বন্দ্ব না রেখে অথবা কোনো রকম প্রশ্ন না তুলে একজন মুসলমানকে এগুলো মেনে নিতে হবে সরল অন্তকরণে।

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, জান্নাত ক্ষণস্থায়ী কোনো ব্যাপার নয়। বরং অনাদি অন্তকাল ব্যাপী এটা বিরাজ করবে। একবার যদি কেউ জান্নাতে প্রবেশের যোগ্যতা অর্জন করে, তাহলে সেখান থেকে আর কোনো দিন বেরিয়ে আসবে না। কুরআন মজীদে বলা হয়েছে যে, সেখানে তাদেরকে অবসাদ স্পর্শ করবে না এবং তারা সেখান থেকে বহিষ্কৃত হবে না। সরাসরি জান্নাতে প্রবেশ করবে। অনেকে আবার জান্নাতে যাবে জাহান্নামের শাস্তিভোগের পর। অবশ্য জাহান্নামে কারো অবস্থান স্বল্পকালের হতে পারে। আবার কারো দীর্ঘ মেয়াদীও হতে পারে।

কিন্তু প্রশ্ন হলো, অবিশ্বাসীদের জাহান্নামে অবস্থান কি অনন্তকালের জন্য ? প্রশ্নের জবাবে আলেমগণের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। তবে কুরআন মজীদের সূত্র ধরে বেশীর ভাগ আলেম অভিমত ব্যক্ত করেন যে, আল্লাহ তা'আলা ছোট বড় সকল প্রকার পাপ ও অন্যায় অপরাধকে ক্ষমা করে দিতে পারেন। কিন্তু আল্লাহর একত্বে অবিশ্বাস করার মত পাপকে তিনি কখনো ক্ষমা করেন না। এ ধরনের পাপের জন্য যে শাস্তি দেয়া হয়, অনন্তকালব্যাপী চলতে থাকবে। অন্যান্য আলেমগণ অভিমত পোষণ করেন যে, আল্লাহ তাআলা তাঁর রহমতের অসীলায় এ ধরনের অপরাধের জন্য দেয়া শাস্তিকেও ক্ষমা করে দিতে পারেন। বস্তুতপক্ষে এরাও কুরআন মজীদের কিছু কিছু আয়াতের (১১ ঃ ১০৭) সূত্র ধরে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। এখানে এ প্রসংগে বেশি আলোচনা করা নিরর্থক বরং আল্লাহর অপরিহার্য রহমত প্রত্যাশা করাই আমাদের জন্য উত্তম।

তাকদীর ও তদবীর

রাসূলে করীম (স) তাকদীরের ওপর ঈমান রাখার জন্য তাকীদ দিয়েছেন। অর্থাৎ একজন মুসলমানকে বিশ্বাস করতে হবে যে সমস্ত ভালো ও মন্দের নির্ধারণ (কদর) আল্লাহর তরফ থেকেই। কিন্তু তার অর্থ কি এই যে, মানুষের জন্য সবকিছুই পূর্ব থেকে নির্ধারিত ? অথবা আল্লাহ তাআলা তাঁর ইচ্ছা অনুসারে নির্দিষ্ট একটি কাজকে ভালো বা মন্দ করে থাকেন ? বস্তুতপক্ষে কোনো কিছুই নিজ থেকে ভালো বা মন্দ হতে পারে না। এর গুণাগুণ নিরূপিত হয় কেবলমাত্র আল্লাহ তাআলার ঘোষণার প্রেক্ষিতে। এ ঘোষণাকে মেনে চলাই মানুষের একমাত্র করণীয় কাজ।

বাস্তবিকই একজন ধর্মবেত্তার জন্য বিষয়টি উভয় সংকটের। যদি ধরে নেয়া হয় যে, একজন মানুষ ভালো বা মন্দ যাই করুক না কেন, তা পূর্ব থেকে নির্ধারিত এবং কাজের জন্য সে-ই দায়ী। তাহলে সেটা হবে

স্ববিরোধিতা। আবার একজন মানুষকে তার কাজকর্মের ব্যাপারে স্বাধীন বলে ধরে নিলে তার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, এ পার্থিব জীবনে মানুষ যা করতে যায় তার ওপর আল্লাহ্ তাআলার কোনো কর্তৃত্ব থাকে না বা কোনো জ্ঞান থাকে না। এ দুটো বিকল্প ধারণাই জটিলতার সৃষ্টি করে। আমাদের স্মরণ রাখতে হবে, আল্লাহ্ হচ্ছেন ন্যায় বিচারক, সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ।

প্রিয়নবী (স) তাকদীর সম্পর্কে বাক-বিতণ্ডা করতে নিরুৎসাহিত করে বলেছেন ঃ তোমাদের পূর্ববর্তীগণ এ ব্যাপারে বাদানুবাদ করে ধ্বংস হয়ে গেছে। এসব আলোচনা হতে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তাকদীর সম্পর্কে চর্চা বা বিতর্কে অবতীর্ণ হওয়াটা উচিত নয়। পৃথিবীতে ডিম আগে এসেছে না মুরগী আগে এসেছে এরূপ বাক-বিতণ্ডার সাথে বিষয়টি তুলনীয়। বস্তুতপক্ষে এটা এমন একটা আলোচনা কস্মিনকালেও যে ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত উপনীত হওয়া যাবে না। আল্লাহ্ কেবলমাত্র ন্যায়বিচারকই নন, তিনি সর্বত্র বিরাজমান এবং সর্বজ্ঞ। মানুষকেই তার কর্মের জন্য আল্লাহ্র নিকট দায়ী থাকতে হবে।

উপরন্তু ভালো ও মন্দ দুটি আপেক্ষিক শব্দ। আহারের উদ্দেশ্যে একটি বাঘ একটি খরগোশ শিকার করলো। এখানে একজনের জন্য যা ভালো অন্যজনের জন্য তা মন্দ। অর্থাৎ এখানে একজনের বেঁচে থাকার জন্য আরেকজনকে মরতে হয়। আমাদের বিবেচনায় যে বিষয়টি আমাদের সামনে মন্দ হিসেবে হাজির হয় সেটিকে আমরা মন্দ বলি। আর সে কারণেই একটি নির্দিষ্ট কাজ কার জন্য ভালো আর কার জন্য মন্দ তা একমাত্র আল্লাহ্ই নির্ধারণ করতে পারেন। তাছাড়া আল্লাহ্ তাআলা আমাদের ওপর কতকগুলো দায়িত্ব ন্যস্ত করেছেন। এটা জাগতিক ব্যাপার। ভালো-মন্দের বিবেচনায় না গিয়ে আমাদের উচিত সে দায়িত্বগুলো যথাযথভাবে পালন করা।

আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান এবং তিনি মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এ দ্বিবিধ বিশ্বাসই একজন মুসলমানকে কাজে অনুপ্রেরণা যোগায়। এমনকি এ বিশ্বাসের কারণে তার মধ্যে কখনো স্থবিরতা সৃষ্টি হতে পারে না। বরং তার মধ্যে সৃষ্টি করে অদ্ভুত রকমের কর্মচাঞ্চল্য ও প্রাণশক্তি। প্রাথমিক যামানায় মুসলমানগণ ছিলেন রাসূল (স)-এর শিক্ষার সার্থক অনুসারী। আমাদেরকে তাঁদের আচারিত কর্মতৎপরতার প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে। তাহলেই উপরোক্ত বক্তব্যের প্রতি আমাদের বিশ্বাস আরো গভীর ও দৃঢ় হবে।

উপসংহার

একজন মুসলমানকে যে সমস্ত বিষয়ে বিশ্বাস করতে হয় এখানে তারই একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হলো। দুটি কথার মধ্য দিয়ে এর মর্মবাণীকে অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও যথাযথভাবে তুলে ধরা হয়েছে। "আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, মুহাম্মাদ (স) তাঁর প্রেরিত পুরুষ ও বান্দা।" এ উক্তিটি আসলে আমাদের একথাই স্মরণ করিয়ে দেয় যে, ইসলাম কেবলমাত্র একটি বিশ্বাসের নাম নয়। এর সাথে জড়িয়ে রয়েছে একটি ব্যবহারিক দিক। আধ্যাত্মিক ও জাগতিক উভয় বিষয়ের অপূর্ব সমন্বয় এর মধ্যে। প্রকৃতপক্ষে ইসলাম হলো একটি পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা।

❐

পঞ্চম অধ্যায়

অনুরক্ত জীবন ও অনুশীলন ঃ নামায-রোযা-হজ্জ-যাকাত

মানুষের জন্য একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান প্রদান করাই ইসলামের মূল লক্ষ। ইসলাম যেমন কাউকে অবজ্ঞা করে না তেমনি মানুষের ব্যাপক কর্মকাণ্ডে কোনোটিকে উপেক্ষাও করে না। বস্তুতপক্ষে মানুষের বহুমুখী কার্যকলাপের মধ্যে সমন্বয় সাধন করাই এর উদ্দেশ্য। তার সকল প্রকার আচার-আচরণ মূলত দেহ ও আত্মাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত।

আল্লাহর দেয়া বিধি-নিষেধ অনুসারে জীবন পরিচালিত হলেই জাগতিক কাজ-কর্মগুলো ইবাদাতের মূল্য পায় এবং নৈতিক চরিত্র উন্নত ও পবিত্র হয়। অনুরূপভাবে আমরা যেগুলোকে আধ্যাত্মিক সাধনা বলি সেগুলোর মধ্যেও নিহিত রয়েছে বস্তুগত সুবিধা। আধ্যাত্মিক অথবা জাগতিক কাজের নিয়ম-নীতিগুলো উৎসারিত হয়েছে একটি অভিন্ন উৎস থেকে এবং তাহলো কুরআন মজীদ। কুরআন মজীদ আল্লাহর কালাম। আধ্যাত্মিক ও জাগতিক কাজের গুরুত্বের অপরিহার্য নিদর্শন ইমাম। তিনি কেবল মসজিদে সালাতের ইমাম নন, তিনি মুসলিম রাষ্ট্রের নেতা।

ঈমান, ইসলাম ও ইহসান সম্পর্কে রাসূলে করীম (স) যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, হাদীস শরীফে তার বিবরণ রয়েছে। ইতিপূর্বে ঈমান বা বিশ্বাস সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। প্রিয়নবী (স) বলেছেন, ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি ঃ আল্লাহ্ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, হযরত মুহাম্মাদ (স) তাঁর বান্দা ও রাসূল—একথার সাক্ষ্য দেয়া, সালাত (নামায) কায়েম করা, যাকাত প্রদান করা, বায়তুল্লাহর হজ্জ করা এবং মাহে রমযানে রোযা রাখা।–বুখারী ও মুসলিম

সালাত বা নামায

রাসূলে করীম (স) বলেছেন, সালাত হলো দীনের স্তম্ভ। কুরআন মজীদে একশতেরও বেশি জায়গায় সালাত সম্পর্কে বলা হয়েছে এবং বিভিন্ন স্থানে সালাতের বিভিন্ন নামকরণও করা হয়েছে। যেমন দোয়া, যিকর, তাসবিহ, ইনাবাহ।

দৈনিক ৫ ওয়াক্ত সালাত আদায়ের হুকুম রয়েছে। দুনিয়ার বুকে আল্লাহর সার্বভৌমত্বের পরিবেশ সৃষ্টি করাই এর উদ্দেশ্য। এখানে

একজনকে খুব সকালে ঘুম থেকে উঠতে হয় এবং সালাত আদায় করতে হয়। তাকে সালাত আদায় করতে হয় বিকালের প্রথম ভাগে, শেষ বিকালে, সূর্য অস্ত যাবার সাথে সাথে এবং রাতে বিছানায় যাবার পূর্বক্ষণে। প্রতি ওয়াক্ত সালাত আদায় করতে কয়েক মিনিট সময়ের দরকার হয়। এ সময়ে নিজেকে যাবতীয় স্বার্থাদির চিন্তা থেকে বিরত রেখে একাগ্রচিত্তে আল্লাহর দিকে গভীর মনোনিবেশ করতে হয়। তাকে সালাত আদায় করতে হয় স্রষ্টা আল্লাহর প্রতি আনুগত্য ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের নজীর হিসেবে। প্রাপ্তবয়স্ক প্রতিটি নর ও নারীর জন্য সালাত আদায় করা ফরয বা অবশ্য কর্তব্য।

প্রতি সপ্তাহে শুক্রবার যোহরের সালাতের স্থলে জুমআর সালাত মসজিদে জামায়াতবদ্ধ হয়ে আদায় করতে হয়। সাপ্তাহিক এই সমাবেশে অত্যন্ত ভাবগম্ভীরতার সাথে সালাত আদায় করা হয়—সালাতের পূর্বে স্থানীয় ইমাম খুতবা (ভাষণ) দেন । ইসলামে বছরে দুটি আনন্দ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। একটি অনুষ্ঠিত হয় মাহে রমযানুল মুবারক শেষে, অপরটি হজ্জের মৌসুমে। আনন্দ উৎসব দুটি আবার বিশেষ সালাতের সাথে আদায় করা হয়। এই আনন্দ উৎসবের একটি ঈদুল ফিতর, অপরটি ঈদুল আযহা। ঈদের সালাত নিত্য দিনের পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের অতিরিক্ত। ঈদের সালাত ওয়াজিব। ছয় তকবীরের সাথে এ সালাত আদায় করা হয়।

এ সালাত সমবেতভাবে আদায় করতে হয়। এ উদ্দেশ্যে খুব সকাল থেকেই লোকেরা নির্দিষ্ট স্থানে সমবেত হতে শুরু করে। অতপর ইমাম তাদের উদ্দেশ্যে খুতবা (ভাষণ) দেন। মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার জন্য যে সালাত আদায় করা হয় তাকে জানাযার সালাত বলে। জানাযার সালাত ফরযে কিফায়া।

সালাতের অন্তর্নিহিত অর্থ এবং আধ্যাত্মিক তাৎপর্য আলোচনা করতে গিয়ে প্রখ্যাত সুফী শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী (র) বলেছেন ঃ

স্মরণ রাখবেন, কখনো কখনো মানুষ খারতুল কুদস বা পবিত্র মঞ্জিল পর্যন্ত পৌঁছে যায়। তখন সে আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভ করে। তার ওপর অবতীর্ণ হয় পবিত্র জ্যোতি (তাজাল্লী)। সে নফসের ওপর বিজয়ী হয় এবং এমন সব জিনিস অবলোকন করতে থাকে যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। আবার যখনই তার ওপর থেকে সেই পবিত্র জ্যোতি সরে যায় তখনই সে ফিরে আসে পূর্বাবস্থায়। ফলে তার মধ্যে সৃষ্টি হয় অদ্ভুত রকমের এক অস্থিরতা ও অস্বস্তি। অবশেষে সে বাধ্য হয়ে এ নিম্ন অবস্থাকে

মেনে নেয়। তখন সে আল্লাহর ইশকে মাতওয়ারা হয়ে হারানো অবস্থা ফিরে পেতে আল্লাহকে স্মরণ করতে থাকে। আসলে এটা হলো কথা ও কাজের মাধ্যমে আল্লাহর দরবারে আবেদন-নিবেদন ও কাকুতি-মিনতি করার নামান্তর মাত্র। সালাতের তিনটি মৌলিক বিষয় রয়েছে ঃ

১. আল্লাহর মহিমা ও কুদরতের অনুভবে একাগ্রচিত্তে তাকে হাযির-নাযির জানা।

২. আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব বিনয়ের সাথে ঘোষণা করা এবং নিজের বিনম্রতা যথাশব্দে প্রকাশ করা। কারো প্রতি সম্মান দেখাতে গিয়ে আমরা সোজা হয়ে দাঁড়াই। তাঁর দিকে মুখ ফিরাই এবং তাঁর প্রতি পূর্ণমাত্রায় মনোনিবেশ করি। কিন্তু যখন পরম শ্রদ্ধা সহকারে রুকূ' বা সিজদা করি তখন সেটা হয় আরো বড় ধরনের সম্মান প্রদর্শন।

৩. এ বিনম্রতাকে দেহের অংগ-প্রত্যংগে যথাযথ সুনির্দিষ্ট ভংগিমার মাধ্যমে স্থাপন করা এবং ভয় ও শ্রদ্ধায় অবনত হওয়া। তার চেয়ে বড় কথা এই যে, মুখাবয়ব হলো আমাদের শ্রেষ্ঠতম অংগ। আমাদের আমিত্ব এবং আত্মসচেতনতার প্রকাশ ঘটে এ মুখাবয়বের মধ্য দিয়ে। সে মুখাবয়বকে যখন আমরা নত করি, এমন পর্যায়ে নিয়ে আসি যা সম্মানিত বিষয়ের সম্মুখে ভূমিকে স্পর্শ করে তখন যে সম্মানের প্রকাশ ঘটে তা তুলনাহীন। মহান স্রষ্টা আল্লাহ তাআলাকে মানুষ এভাবে স্মরণ করবে যাতে সে আলোকিত হবে পবিত্র জ্যোতিতে। এভাবেই সে হৃদয় দিয়ে আল্লাহর মহত্ত্বকে অনুধাবন করতে পারে। তার মধ্যে ফুটে ওঠে বিনয়-নম্র ভাব। বস্তুতপক্ষে এটাই সৃষ্টির উদ্দেশ্য। মানব জীবনের একমাত্র সাধনা। মানুষ কেবলমাত্র ক্রমাগত সাধনার মাধ্যমে এ উন্নততর পর্যায়ে উপনীত হতে পারে। এ ধরনের আরোহণ কেবলমাত্র সম্মান সহকারে সোজা হয়ে দাঁড়ান, নত হওয়া এবং সিজদার মাধ্যমে হতে পারে এবং সর্বোত্তম ইবাদাত সেটাই যার মধ্যে এ তিনটি কাজ বিরাজমান রয়েছে। –হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা, শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবী (র) প্রথম খণ্ড সালাতের রহস্য।

কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يَسْجُدُ لَهٗ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُوْمُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَآبُّ وَكَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ ط

"তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহকে সিজদা করে যাকিছু আছে আকাশজগতে ও পৃথিবীতে, সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজি, পর্বতরাজি, বৃক্ষলতা, জীব-জন্তু এবং সিজদা করে মানুষের মধ্যে অনেকে।"–সূরা হাজ্জ ঃ ১৮

আরো বলা হয়েছে যে,

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمٰوٰتُ السَّبْعُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ ط وَاِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ وَلٰكِنْ لَّاتَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ ط

"সপ্ত আকাশ, পৃথিবী এবং তাদের অন্তর্বর্তী সবকিছু তাঁরই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং এমন কিছু নেই যা তাঁর প্রশংসা, পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে না। কিন্তু তাদের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা তোমরা অনুধাবন করতে পার না।"–সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৪৪

সমস্ত সৃষ্টিরাজির ইবাদাত-বন্দেগীর একটি নির্দিষ্ট ধরন রয়েছে। এসব কিছুরই সমন্বয় ঘটেছে সালাতের মধ্যে। সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র নিয়মিত উদয় হয়, অস্ত যায়। এ যেনো সালাতের এক রাকআতের পর আরেক রাকআত আদায় করার অনুরূপ। পাহাড়-পর্বত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। সালাতের শুরুতে মু'মিন মুসলমানদেরও ঠিক এমনিভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। পশু-পাখীরা বশ্যতা স্বীকারের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে নত হয়। এর সাথে সংগতি রয়েছে সালাতের রুকূ'র। বৃক্ষরাজিকে আমরা মূলের সাহায্যে মাটি থেকে খাদ্য খাবার সংগ্রহ করতে দেখতে পাই। মূল হলো তার মুখ। অন্য কথায় চির অসহায়ের মতো গাছপালা যেনো চিরদিনের জন্য ভূতলশায়ী হয়ে রয়েছে। এর সাথে হুবহু মিল রয়েছে সিজদার।

তাছাড়া কুরআনের বর্ণনা অনুসারে পানির একটি প্রধান কাজ হলো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা। ইবাদাত-বেন্দেগীর শুরুতে যে অযু করা হয় তার সাথে এর তুলনা হতে পারে। কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهٖ وَالْمَلٰٓئِكَةُ مِنْ خِيْفَتِهٖ ج

"বজ্র নির্ঘোষ ও ফেরেশতাগণ সভয়ে তাঁর প্রশংসা, মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করে।"–সূরা আর রা'দ ঃ ১৩

এ আয়াতটির প্রতিধ্বনী ঘটে সালাতেও। সালাতের সময়ও আমরা উচ্চস্বরে আল্লাহু আকবার উচ্চারণ করি। সালাতে কখনো উচ্চস্বরে কখনো নিম্নস্বরে কুরআন তেলাওয়াত করলেও আমাদেরকে সবসময়ই আওয়াজ

করে আল্লাহু আকবার বলতে হয়। পাখীরা ঝাঁক বেঁধে আকাশে উড়ে আল্লাহর যিকর করে। অনুরূপভাবে মুসলমানরাও সমবেতভাবে ধর্মীয় অনুষ্ঠান উদযাপন করে থাকে। প্রাত্যহিক জীবনের বিভিন্ন সময়ে কখনো ছায়া প্রসারিত হয়, কখনো আবার সংকুচিত হয়ে আসে। এটাও মূলত আল্লাহর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ ও তার ইবাদাত বন্দেগী করার একটা ধরন। সালাতের মধ্যে আমরা এর প্রকাশ দেখতে পাই। তেমন আমরা সালাত আদায় করতে গিয়ে কিয়াম (দাঁড়ান), রুকূ' এবং সিজদার মাধ্যমে কখনো নিজেকে প্রসারিত করি আবার সংকুচিত করি।

এখানে স্মরণ করা যেতে পারে যে, ইসলামী পরিভাষায় আল্লাহর যিকর-আযকারকে ইবাদাত বলে। ইবাদাতের মূল শব্দ 'আবদ'। এর অর্থ দাস। অন্য কথায় বলা যেতে পারে যে, মনিবের প্রত্যাশা অনুসারে চাকর যা করে সেটাই হলো ইবাদাত। স্রষ্টার দাবি এই যে, পাহাড়-পর্বত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে, পশু-পাখীরা নত হয়ে থাকবে, বৃক্ষরাজি থাকবে ভূতলশায়ী হয়ে। আর এটাই হলো তাদের আনুগত্য ও যিকর-আযকার। যে ধরনের যিকর-আযকার একজনের জন্য উপযুক্ত আল্লাহ্ তাআলা তার নিকট থেকে সেটাই প্রত্যাশা করেন। অনুরূপভাবে সৃষ্টির সেরা প্রাণী জগতের মধ্যে সর্বাধিক বিবেকবান এবং পৃথিবীর বুকে তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে যে ধরনের ইবাদাত-বন্দেগী মানুষের জন্য প্রযোজ্য আল্লাহ্ তার নিকট সেটাই প্রত্যাশা করেন।

অযু ও শারীরিক পরিচ্ছন্নতার মাধ্যমে একজন পবিত্রতা অর্জন করে। আর পবিত্রতা হলো সালাত বিশুদ্ধ ও বৈধ হওয়ার পূর্বশর্ত। হাদীস গ্রন্থেও অযু ও গোসলের গুরুত্ব সম্পর্কে অনেক বর্ণনা রয়েছে। পবিত্রতা অর্জন করার জন্য একজনকে হাত, মুখ, নাক, পা ও মাথা ধৌত করতে হয়। এখানে অযু অর্থে কেবলমাত্র বাহ্যিক পরিচ্ছন্নতা বুঝায় না। বরং এটা ব্যবহৃত হয়েছে অতীতের জন্য অনুশোচনা এবং আগামীতে ন্যায়নিষ্ঠভাবে চলার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে। অনুশোচনা অতীতের পাপরাশিকে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে দেয়। অপরদিকে ন্যায়নিষ্ঠভাবে চলার শপথ গ্রহণের মাধ্যমে আমরা আল্লাহ্ তা'আলার রহমত লাভের আশা করি। প্রধানত যে সমস্ত অংগ-প্রত্যংগ দ্বারা অন্যায় অপকর্মে লিপ্ত হই, অযুর সাথে তার সংযোগ রয়েছে বেশি। হাত দিয়ে আমরা আঘাত বা আক্রমণ করি ও কোনো কিছু গ্রহণ করি। মুখ দিয়ে কথা বলি, নাক দিয়ে ঘ্রাণ নেই। মুখাবয়বের সাহায্যে কখনো আমরা একজনকে অবজ্ঞা করি, কখনো আবার কাউকে প্রভাবিত বা চাপ দেয়ার জন্য উদ্যোগী হই। মাথা

দিয়ে চিন্তা করি, ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হই। কান দিয়ে শুনি। যে পথে চলতে আল্লাহ্ নিষেধ করেছেন পা দিয়েই আমরা সে দিকে অগ্রসর হই। অযুর নিয়ত করতে গিয়ে প্রথমেই একজনকে বলতে হয় যে, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি পানিকে পরিষ্কার এবং পরিষ্কারক হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। মুখাবয়ব ধোয়ার সময় সে আল্লাহর কাছে এ মুনাজাত করে যে, শেষ বিচার দিনে আমার মুখাবয়বকে উজ্জ্বল করো এবং কালিমা লিপ্ত করো না। হাত ধোয়ার সময় বলে, আমাকে ভালো কাজে নিয়োগ করো, মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখ। কিয়ামতের দিনে বাম হাতের পরিবর্তে ডান হাতে আমলনামা দান করো, হিসাব নিকাশ সহজতর করে দাও। মাথা মাসেহ করে বলে, আমাকে ইলম শিক্ষা দাও। কান ধোয়ার সময় বলে, আমাকে তোমার এবং তোমার রাসূলের বাণী শ্রবণ করার তাওফিক দাও। পা ধোয়ার সময় বলে জাহান্নামের ওপর দিয়ে পুলসিরাত অতিক্রম করার সময় পাপীষ্ঠরা পা ফসকে জাহান্নামে নিপতিত হবে। আর তোমার প্রিয় বান্দাদের পদযুগল থাকবে অতি দৃঢ়। হে আল্লাহ! সে দিন পা ফস্‌কে আমার যেনো পতন না ঘটে এবং আমার পদযুগলকেও দৃঢ় রেখো।

রাসূলে করীম (স)-এর মি'রাজের সময় মুসলমানদের জন্য দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাতকে বাধ্যতামূলক করা হয়। রাসূলে করীম (স) ঘোষণা দিয়েছেন যে, একজন ঈমানদারের জন্য সালাত হলো তাঁর মি'রাজ। সালাতের মাধ্যমে সে পৌঁছে যায় আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের সান্নিধ্যে। এগুলো কোনো অর্থহীন বক্তব্য নয়। বরং সালাতের সময় একজন মুসলমান যেভাবে আচরণ করে তার মধ্যে দিয়ে ফুটে ওঠে এর সত্যতা। প্রথম সে সোজা হয়ে দাঁড়ায়, হাত উঠিয়ে ইহরাম বাঁধে এবং স্পষ্টভাবে ঘোষণা দেয় যে, আল্লাহু আকবার—আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ মহান। আল্লাহ্ ছাড়া অন্যান্য সমস্ত সত্তাকে সে অস্বীকার করে এবং মহান আল্লাহ্ তাআলার কাছে সর্বতোভাবে আত্মসমর্পণ করে। আল্লাহর হামদ বা মহিমা ঘোষণা করার পর সে খুবই বিনম্র বোধ করে। তখন সে আল্লাহর আনুগত্য ও কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ তাঁর সামনে মাথা নত করে এবং বলে, "সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম"—"আমার মহান রব পবিত্র।" অতপর সে সোজা হয়ে দাঁড়ায় এবং সত্য পথ প্রদর্শনের জন্য আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া জানায়। আল্লাহর মহত্ব তার অন্তরকে এমনভাবে আলোড়িত করে যে, সে আল্লাহর সামনে মস্তক অবনত করার তীব্র তাগিদ অনুভব করে। এক সময়ে পরিপূর্ণ বিনয়ের সাথে ভূমিতে মাথা ঠেকিয়ে বলে, "সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা"—"আমার শ্রেষ্ঠতম রব পবিত্র।" বার বার সে এগুলো পুনরাবৃত্তি

করে এবং এভাবে তার দেহ আধ্যাত্মিক সাধনার সাথে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। ক্রমান্বয়ে সে অর্জন করে পার্থিব জগতের বেড়াজাল থেকে উত্তরণের যোগ্যতা। এক সময়ে সে আসমানী পরিমণ্ডল অতিক্রম করে চলে যায় আল্লাহ তাআলার সান্নিধ্যে। সেখানে সে আল্লাহর মহান দরবারে অভিবাদন পেশ করে এবং তার জবাবও পেয়ে যায়। বস্তুতপক্ষে এ স্তরে উপনীত হওয়ার জন্য সে এমন নীতি ও পন্থা অনুসরণ করে যেগুলো মি'রাজের সময়ে রাসূল (স)-এর অনুসৃত নীতি ও পন্থারই অনুরূপ। এ সময়ে সে বিনয় নম্রভাবে বলে যে, "সকল প্রকার ইবাদাত-বন্দেগী আল্লাহর জন্য। হে নবী, তোমার ওপর বর্ষিত হোক আল্লাহর শান্তি, নেমে আসুক আল্লাহর দয়া ও বরকত। শান্তি বর্ষিত হোক আমাদের এবং আল্লাহর সমস্ত নেক বান্দাদের ওপর।" এটাকে বলা যেতে পারে, একজন মু'মিনের রূহানী সফর। এ সফরের লক্ষ্য হলো আল্লাহর সান্নিধ্য প্রাপ্তি। এখানে তাকে জড় কোনো প্রতীক ব্যবহার করতে হয় না।

এটাই হলো সালাতের আধ্যাত্মিক তাৎপর্য। জাগতিকভাবেও সালাতের অসংখ্য গুরুত্ব রয়েছে। যেমন সালাত আদায় উপলক্ষে মহল্লার অধিবাসীরা দৈনিক পাঁচবার সমবেত হয়। পেশাগত জীবনে অবিরত কাজ করে যাওয়ার কারণে মানুষের মধ্যে এক ঘেয়েমী বা বিরক্তির ভাব আসে। সালাত মিনিট কয়েকের জন্য হলেও তাতে স্বস্তি জোগায়। একটি লোকালয়ের ছোট বড় ধনী-নির্ধন সবাইকে পূর্ণ সমতায় একটি স্থানে (মসজিদ) সংঘবদ্ধ করে। লোকালয়ের যিনি বুযুর্গ তিনি স্থানীয় মসজিদে সালাতের নেতৃত্ব দেন। আবার রাষ্ট্রের যিনি প্রধান, তিনি সালাতের ইমামতি করেন রাজধানীর কেন্দ্রীয় মসজিদে। মসজিদে বসে দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের সাথে সর্ব সাধারণের সাক্ষাত মেলে। কোনো রকম বাঁধা-প্রতিবন্ধকতা বা আনুষ্ঠানিকতা ছাড়া সরাসরি তাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারে।

সালাতের সামাজিক তাৎপর্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সালাতে এসে একজন মু'মিনের অন্তরে এ অনুভূতির সৃষ্টি হয় যে, তার চারপাশে এবং সমাজের সর্বত্র বিরাজ করছে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব। সে বসবাস করছে সামরিক শৃঙ্খলার মতো বৈশিষ্ট্যপূর্ণ একটি পরিবেশে। মুয়ায্যিনের আযানের ধ্বনির সাথে সাথে সকলেই ছুটে আসে নির্ধারিত মিলনস্থল বা মসজিদে। ইমামের পেছনে সবাই দাঁড়িয়ে যায় সারিবদ্ধভাবে। সকলেই একই ধরনের ক্রিয়া-কর্মে এবং অংগচালনায় লিপ্ত হয়। তখন তাদের মধ্যে লক্ষ করা যায় অদ্ভূত রকমের সমন্বয় ও ঐক্য।

উপরন্তু বিশ্বের যে কোনো স্থানের সকল মু'মিন সালাতের সময় কা'বার দিকে মুখ করে দাঁড়ায়। মক্কায় অবস্থিত এ কা'বা শরীফ হলো আল্লাহ্‌র ঘর এবং কা'বাই সকলের অভিন্ন লক্ষস্থল। এ বিশ্বজগতের মুসলমানদের মধ্যেকার ঐক্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এখানে শ্রেণী, বর্ণ বা অঞ্চলের ভিত্তিতে কোনো রকম তারতম্য বা বৈষম্য সৃষ্টির অবকাশ নেই।

জামায়াতে সালাত আদায় করাটাই উত্তম ও অধিকতর সওয়াবের। তবে জামায়াতে সালাত আদায় করা সম্ভব বা পর্যাপ্ত সুযোগ না থাকলে পুরুষ বা মহিলা যে কেউ একাকী এবং ব্যক্তিগতভাবে সালাত আদায় করতে পারে। দিনে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করার অর্থ হলো ২৪ ঘণ্টার মধ্যে অন্তত ২৪ মিনিট আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে এবং তাঁর স্মরণে সময় অতিবাহিত করা। তবে প্রকৃত অর্থে একজন মু'মিন মুসলামানকে প্রতি মুহূর্তে আল্লাহকে স্মরণ করা উচিত। সে আল্লাহকে স্মরণ করবে সুখে ও দুঃখে, কর্মে ও বিশ্রামে এবং কোনো কাজে লিপ্ত থাকা অবস্থায়। কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ

اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِى الْاَلْبَابِ ۝ الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ج رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا ج سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝

"আকাশজগত ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে দিবস ও রাতের পরিবর্তনে নিদর্শন রয়েছে বোধশক্তিসম্পন্ন লোকের জন্য যারা দাঁড়িয়ে বসে বা শুয়ে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আকাশজগত ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করে এবং বলে, হে আমাদের রব! এ তুমি নিরর্থক সৃষ্টি করোনি, তুমি পবিত্র তুমি আমাদেরকে জাহান্নামের আগুন হতে রক্ষা কর।"

–সূরা আলে ইমরান ঃ ১৯০-১৯১

মানুষের প্রয়োজন এবং সুবিধার্থে আল্লাহ তাআলা এ বিশ্বজগতকে তার অধীন করে দিয়েছেন। এ সুবিধা বা নিয়ামতের জন্য তাকে কৃতজ্ঞ ও অনুগত থাকতে হবে। সে আল্লাহ্‌র আইনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে না। অবিচার ও বেইনসাফী করবে না জগত সংসারের কারো প্রতি।

এখানে উল্লেখ্য যে, যে মুহূর্তে মানুষের জন্য সালাত আদায়ের বিধানকে বাধ্যতামূলক করা হয় তখন কুরআন মজীদে এ ঘোষণা দেয়া হয় ঃ

لاَيُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلاَّ وُسْعَهَا ط- البقرة : ٢٨٦

"আল্লাহ্ কারো ওপর এমন কোনো কষ্টদায়ক দায়িত্ব অর্পণ করেন না যা তার সাধ্যাতীত ।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২৮৬

অর্থাৎ আল্লাহ্ তাআলা মানুষকে বিচার করবেন তার অভিপ্রায় ও নিয়ত অনুসারে। সবচয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই যে, বস্তুগত ও জাগতিক কাজ-কর্মের শত ব্যস্ততার মধ্যেও পারমার্থিক ও আধ্যাত্মিক দায়িত্বের কথা কারো ভুলে যাওয়া উচিত নয়। কেবলমাত্র অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে নির্ধারিত পরিমাণের চেয়ে কম সালাত আদায় করার সুযোগ রয়েছে। এ ধরনের পরিস্থিতির মধ্যে রয়েছে ব্যক্তির অসুস্থতা ও অবচেতন অবস্থা অথবা এমন কোনো কর্মব্যস্ততা যার মধ্যে ব্যক্তিকে বাধ্য হয়ে নিয়োজিত থাকতে হয়েছে।

হাদীসে উল্লেখ আছে যে, খন্দকের যুদ্ধের সময় শত্রুপক্ষ মুসলমানদের ব্যতিব্যস্ত করে রেখেছিল। এমন কি রাসূল (স) দিবাভাগের সালাত আদায় করার জন্য এক মুহূর্ত ফুরসত পাননি। ফলে তিনি যোহর, আসর, মাগরিব ও এশার সালাত গভীর রাতে এক সাথে আদায় করেছিলেন। অর্থাৎ দিন রাত ২৪ ঘণ্টায় তিনি মাত্র দুবেলা সালাত আদায় করেছিলেন। ইবনে আব্বাস (রা)-এর সূত্রে বর্ণিত আছে যে (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, ইবনে হাম্বল মালিক) কখনো কখনো রাসূলে করীম (স) যোহরের সাথে আসর এবং মাগরিবের সাথে এশার সালাত আদায় করতেন (হজ্জ পালন কালে)। অথচ এ সময় শত্রু ভয় বা সফরের কোনো অসুবিধা ছিলো না। আসলে মুসলিম উম্মাহ্র সালাত আদায়ে যাতে কোনো অসুবিধা না হয় সেজন্যই এরূপ করেছিলেন। এ বর্ণনা অনুসারে উক্ত দিনগুলোতে তিনি সালাত আদায় করতেন তিন বার (যোহরের সময় যোহর ও আসর এক সাথে এবং এশার সময় মাগরিব ও এশা এক সাথে) বস্তুতপক্ষে এসব কিছু নির্ভর করে মু'মিন মুসলমানের ব্যক্তিগত বিবেচনার ওপর এবং এখানে তাকে ব্যক্তিগতভাবে আল্লাহ্র নিকট জবাবদিহি করতে হয়। সে কোনো রকম প্রতারণার আশ্রয় নিতে বা কোনো কিছু আল্লাহ্র নিকট থেকে গোপন রাখতে পারে না।

আমরা জানি যে, বিষুবীয় বা গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চল ও মেরু অঞ্চলের মধ্যে সূর্য উদয় হয় এবং এক নাগাড়ে ছয় মাস উদীয়মান থাকার পর আবার অস্ত যায়। ইসলামের শরীআত বিশারদগণ উল্লেখ করেছেন যে, এতদঞ্চলে কেউ সূর্যের উদয় অস্তের হিসেবে চলতে পারে না। বরং তাকে

চলতে হয় ঘড়ির কাঁটার হিসেবে। সালাত, সওম এবং অন্যান্য ইবাদাত-বন্দেগীর জন্য এ বিধান প্রযোজ্য। মেয়েদের ক্ষেত্রে মাসে বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে নির্দিষ্ট কিছুদিন এবং সন্তান প্রসবের পর কিছু দিন সালাতের বিধান শিথিল করা হয়েছে।

সওম বা রোযা

একজন মু'মিন মুসলমানের জন্য দ্বিতীয় ধর্মীয় দায়িত্ব হলো বছরে এক মাস সিয়াম পালন করা। বিষুবীয় ও গ্রীষ্ম প্রধান অঞ্চলের মুসলমানরা রমযান মাসে রোযা রাখে দিবাভাগে। অর্থাৎ সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার থেকে বিরত থাকে। আর যারা মেরু অঞ্চল এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বসবাস করে, তারা বিষুবীয় অঞ্চলের সমপরিমাণ সময়ের জন্য পানাহার করা থেকে বিরত থাকে। একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, পানাহারের সাথে সাথে যে সমস্ত জাগতিক চিন্তা ও ইন্দ্রীয় সুখ আধ্যাত্মিক সমৃদ্ধির পরিপন্থী তাকে তাও পরিহার করতে হয়। বস্তুতপক্ষে সিয়ামের মধ্যে রয়েছে কঠোর নিয়ম-শৃঙ্খলা। অন্যান্য ধর্মের অনুসারীদের কাছে ইসলামের এ নিয়ম-শৃঙ্খলা মেনে চলা দুষ্কর বলে মনে হতে পারে। কিন্তু বিগত শতাব্দীগুলোর অভিজ্ঞতা থেকে এটা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়েছে যে, ইচ্ছা এবং আগ্রহ থাকলে নও মুসলিমগণও অনায়াসে এ সমস্ত নিয়ম-শৃঙ্খলা মেনে চলতে পারে।

ইসলামের বছর গণনা করা হয় চন্দ্র মাসের হিসেবে এবং গোটা রমযান মাস একজন মু'মিনকে সিয়াম পালন করতে হয়। ফলে বছরে সকল ঋতুতে অর্থাৎ গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত পালা করে সিয়াম পালনের মাস রমযানুল মুবারক আসে। কোনো ঋতুতে প্রচণ্ড গরম পড়ে আবার কোনো ঋতুতে থাকে হাড় কাঁপানো শীত। মুসলমানগণ বিভিন্ন ঋতুতে প্রতিকূল এবং ক্লেশকর পরিস্থিতির মধ্যেই সিয়াম পালন করে থাকেন। তারা এসব করে থাকেন আধ্যাত্মিক সাধনা এবং আল্লাহর আনুগত্য প্রকাশের উদ্দেশ্যে।

সিয়াম পালনের আধ্যাত্মিক সুবিধা ছাড়াও জাগতিক বা পার্থিব উপকারিতা রয়েছে। সালাত আদায় করে যে উপকারগুলো পাওয়া যায় সেগুলো ছাড়াও সিয়াম পালনের মধ্য দিয়ে স্বাস্থ্যগত সুবিধা ও সামরিক প্রশিক্ষণ পাওয়া যায়। তাছাড়া সিয়াম পালনের মাধ্যমে ইচ্ছাশক্তির বিকাশ

ও উন্নয়ন ঘটে। বিশেষ করে অবরোধ এবং যুদ্ধকালীন সময়ে সামরিক বাহিনীর লোকদের খাদ্য ও পানির কষ্ট করতে হয়। এরপরও তারা প্রতিরক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের প্রতি অবিচল থাকে। সিয়াম সাধনার মাধ্যমে অতি সহজে এ শিক্ষা লাভ করা যায়। সে কারণেই যে শাসক বা সেনানায়ক রমযান মাসে তার সৈন্যদেরকে সিয়াম পালন করতে নিষেধ করে, সে সত্যিকার অর্থেই একজন নির্বোধ। কিন্তু একথা অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে যে, সিয়ামের মূল ও প্রধান উদ্দেশ্য হলো ইবাদাত। এর লক্ষ্য হলো আধ্যাত্মিক সাধনার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করা। কেউ যদি চিকিৎসকের পরামর্শ অনুসারে অথবা অন্য কোনো কারণে কেবল মাত্র পার্থিব উদ্দেশ্যে পানাহার করা থেকে বিরত থাকে তাহলে সেটা ইবাদাত হিসেবে গণ্য হবে না। আধ্যাত্মিকভাবেও সে উপকৃত হবে না। অসুস্থকালীন সময়ে মহিলারা সালাতের ন্যায় সিয়াম পালন করা থেকেও অব্যাহতি পেয়ে থাকে। তবে এটুকু ব্যতিক্রম যে, রমযান মাসে একজন মহিলা যে কয়দিনের জন্য সিয়াম পালন করতে পারছে না, সুস্থ হবার পর তাকে ঠিক সেই কয়দিন সিয়াম পালন করতে হবে। যারা রুগ্ন তাদের জন্যও এ একই বিধান প্রযোজ্য। আবার যে খুব বেশী বৃদ্ধ, সে সিয়াম পালন করার বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত এবং তার আর্থিক সংগতি থাকলে রমযান মাসের একটি রোযার জন্য তাকে একজন দরিদ্র ব্যক্তির পানাহারের ব্যবস্থা করতে হবে।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, রাসূলে করীম (স) লাগাতার কয়েকদিনের জন্য যেমন ৪৮ অথবা ৭২ ঘণ্টা সিয়াম পালন করতে নিষেধ করেছেন। তিনি নিষেধ করেছেন সারা বছর বা গোটা জীবনব্যাপী সিয়াম পালন করতে। এমন কি যারা বেশি বেশি আধ্যাত্মিক সাধনা এবং সওয়াবের জন্য অতি উৎসাহিত ছিলেন, তাদেরকেও তিনি সারা বছর রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন।

রমযান মাসে সিয়াম পালন করা মুসলমানদের জন্য ফরয। ইচ্ছা করলে এর বাইরেও মাঝে মাঝে সিয়াম পালন করা যায়। তবে সেটা গণ্য হবে অতিরিক্ত এবং নফল ইবাদাত হিসেবে। রাসূলে করীম (স) এক সাথে দুদিনের জন্য সিয়ামের অনুমোদন দিয়েছেন। চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে, মাঝে মধ্যে বিরতি দিয়ে সিয়াম পালনের মধ্যে যে সুফল পাওয়া যায়, সিয়াম বা উপবাস নিত্যদিনের স্বভাবে পরিণত হলেও সে ফল পাওয়া যায় না। আবার এক

নাগাড়ে ৪০ দিনের বেশি সিয়াম পালন করলে তা নিত্যদিনের অভ্যাসে পরিণত হয়।

সমাজে এ রকম একটি ধারণা রয়েছে যে, শীতকালে পানাহার থেকে বিরত থাকলে স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়। বস্তুতপক্ষে এ রকম ধারণার কোনো যৌক্তিক ভিত্তি নেই। জীববিদ্যা সম্বন্ধীয় পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে যে, যখন বরফ পড়তে শুরু করে তখন বন্যপ্রাণীরা বাস্তবিক পক্ষে কোনো খাদ্য খাবার সংগ্রহ করতে পারে না। এ সময়ে তাঁদের অনাহারে ঘুমিয়ে অথবা অন্য কোনো উপায়ে সময় কাটাতে হয়। অথচ বসন্তে তারা নতুন উদ্যমে জেগে ওঠে। বৃক্ষরাজির বেলাও একথা সত্য। শীতের সময়ে বৃক্ষের পত্র পল্লব পড়ে। এমনকি বৃক্ষরাজিতে পানি সেচের ব্যবস্থা থাকে না। গাছপালাগুলো যেনো এ সময়ে ঘুমিয়ে কাটায়। এভাবে মাস কয়েক উপোস থাকার পর বসন্তের শুরুতে তারা আবার যেনো নতুন জীবন ফিরে পায়। পূর্বাপেক্ষা যেনো অধিকতর সতেজ রূপ লাভ করে। এ সময়ে বৃক্ষরাজিকে দেখা যাবে নতুন পত্র পল্লবে বিকশিত ও মুকুলিত অবস্থায়। বস্তুতপক্ষে প্রাণী দেহের অন্যান্য অংগ-প্রত্যংগের ন্যায় পরিপাকযন্ত্রেরও বিশ্রাম দরকার। পানাহার থেকে বিরত থাকাই এ ধরনের বিশ্রামের একটি উপযুক্ত মাধ্যম। সম্প্রতি পাশ্চাত্য জগতে চিকিৎসা বিজ্ঞানের একটি নতুন শাখার উদ্ভব হয়েছে। এ পন্থায় প্রধানত ক্রনিক রোগের চিকিৎসার জন্য রোগীকে স্বল্প বা দীর্ঘ সময়ের জন্য পানাহার থেকে বিরত রাখা হয়।

কুরআনুল করীমে বলা হয়েছে ঃ

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ج وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ٥ - الانعام : ١٦٠

"কেউ কোনো সৎকাজ করলে সে তার দশগুণ পাবে এবং কোনো অসৎকাজ করলে তাকে শুধু তারই প্রতিফল দেয়া হবে, আর তাদের প্রতি যুলুম করা হবে না।"–সূরা আল আনআম ঃ ১৬০

অর্থাৎ একটি ভালো কাজের জন্য আল্লাহ দশগুণ প্রতিদান দিয়ে থাকেন। রাসূলে করীম (স)-এর একটি হাদীসের রহস্য উদঘাটিত হয়েছে এ ঘোষণার মধ্যে দিয়ে। রাসূল (স) বলেছেন, "যে রমযান মাসে এবং পরবর্তী শাওয়াল মাসে আরো ছয়টি সিয়াম পালন করবে সে যেনো গোটা বছরের জন্য সিয়াম পালন করলো।" ইসলামের দৃষ্টিতে ৩৫৫ দিনে

একটি চন্দ্র বছর পূর্ণ হয়। এবং মাস গণনা করা হয় ২৯ অথবা ৩০ দিনে। সুতরাং একজন মু'মিন মুসলিম রমযান মাসের অতিরিক্ত আরো ছয়টি রোযা রাখলে মূলত সে বছরে ৩৫ অথবা ৩৬ দিন সিয়াম পালন করে এবং প্রতিদিনের জন্য দশগুণ হিসেবে সে ৩৫০ দিন অথবা ৩৬০ দিনের সওয়াব পেয়ে যায়।

সূফীয়ায়ে কেরাম লক্ষ করেছেন যে, মানব মনের মধ্যে পশুস্বভাবও রয়েছে। এ স্বভাব মানুষের আত্মিক উন্নতির পথে বাঁধার সৃষ্টি করে। দেহকে আত্মার নিয়ন্ত্রণে আনতে হলে দৈহিক প্রেরণাকে সংযত করতে হয়। সমৃদ্ধ করতে হয় আত্মিক শক্তিকে। লক্ষ করা গেছে যে, দৈহিক প্রেরণাকে সংযত করতে হলে একদিকে ক্ষুধা তৃষ্ণার কষ্ট ও রিপুর তাড়নাকে পরিহার করতে হয়। অপরদিকে জিহ্বা ও মনের চাহিদা এবং অন্যান্য অংগ-প্রত্যংগকে নিয়ন্ত্রণ করা জরুরী। এভাবে দৈহিক প্রেরণাকে যত সফলভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব, অন্য কোনো ভাবে তা সম্ভব নয়। মানুষ যখন তার পশুস্বভাবের ওপর আত্মিক ও বিবেকের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারে তখনই সে পূর্ণতার দিকে এগিয়ে যায়। পশুস্বভাব কখনো মাথাচাড়া দিয়ে উঠলেও তাকে আত্মসংযমের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখা যায়। সে কারণেই সিয়ামের মতো কঠোর সংযম সাধনার মাধ্যমে সে পশুস্বভাব নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আনার চেষ্টা করে। কেউ যদি কোনো অন্যায় বা পাপকর্ম করে ফেলে তা হলেও সে সিয়াম পালন করে অনুশোচনা করবে ও অনুতপ্ত হবে। সে দমন করবে তার রিপুকে। এভাবেই সে প্রশান্তি পাবে, পরিশুদ্ধ হবে তার অন্তর। এমন কি এক পর্যায়ে ইচ্ছা শক্তি তার নিয়ন্ত্রণে এসে যাবে। তখন সে বিরত থাকবে পুনর্বার অন্যায় অপকর্ম করা থেকে। পূর্বে আরো বলা হয়েছে যে, ফেরেশতাদের পানাহার করতে হয় না, এটা তাদের বৈশিষ্ট্য সিয়ামের মাধ্যমে পানাহারকে সংযত করে মানুষ ক্রমান্বয়ে তাদের বৈশিষ্ট্যকেই গ্রহণ করে। যেহেতু সমস্ত কাজ কর্মের মধ্যে দিয়ে মানুষ মূলত আল্লাহর আদেশ নির্দেশগুলোকে মেনে চলার চেষ্টা করে সে আল্লাহর সন্তুষ্টিও অর্জন করে। এভাবেই সে এগিয়ে যায় আল্লাহর সান্নিধ্যে এবং এটাই হলো মানুষের পরম লক্ষ্য।

হজ্জ

হজ্জের শাব্দিক অর্থ সংকল্প করা, প্রচেষ্টা করা। এর আরেকটি অর্থ কোনো কিছুর ওপর আধিপত্য স্থাপনের চেষ্টা করা। প্রচলিত অর্থে হজ্জ বলতে কা'বা ঘর তাওয়াফ, সাফা-মারওয়া সাঈ, আরাফাত-মুযদালিফা ও মিনায় অবস্থান করাকে বুঝায়। বস্তুতপক্ষে হজ্জের অর্থ আরো ব্যাপক ও

বিস্তীর্ণ। মুসলমানদের ধর্মীয় দায়িত্বাবলীর মধ্যে হজ্জের স্থান তৃতীয়। পূর্ণ বয়স্ক ও সামর্থবান প্রতিটি মু'মিন মুসলমানের জন্য হজ্জ ফরয। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেককেই তার জীবদ্দশায় একবার মক্কায় যেতে হয়। হজ্জ পালনের মধ্যে দিয়েই সে নিজের অহংবোধকে নির্মূল করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়। নিজের সত্তাকে একাকার করে ফেলে আল্লাহর ইচ্ছার সাথে, আর যাদের হজ্জে যাওয়ার মতো আর্থিক সংগতি নেই তারা এ দায়িত্ব থেকে মুক্ত। কিন্তু এমন কি কোনো মুসলমান আছে যে, আল্লাহর ঘর কা'বায় হাজির হবার সামর্থ লাভের আশায় অল্প অল্প করে প্রয়োজনীয় অর্থ জোগাড় না করবে ?

কুরআন মজীদে এরশাদ হয়েছে ঃ

اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِىْ بِبَكَّةَ مُبٰرَكًا وَّهُدًى لِّلْعٰلَمِيْنَ ۝

"মানবজাতির জন্য সর্বপ্রথম যে গৃহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো তাতো বাক্কায় (মক্কায়) তা বরকতময় ও বিশ্বজগতের দিশারী।"

–সূরা আলে ইমরান ঃ ৯৬

হযরত আদম (আ) প্রথম যে ঘর নির্মাণ করেছিলেন, পরবর্তীতে হযরত ইবরাহীম (আ) কেবলমাত্র তা পুনর্নির্মাণ করেন। কেউ যদি কেবলমাত্র ইবরাহীম (আ)-এর সময়কালকে হিসেবে আনে, তাহলেও কা'বাই হবে সবচেয়ে পুরনো ঘর। হযরত সুলায়মান (আ) নির্মিত জেরুজালেমের ইবাদাতগাহর চেয়েও কা'বা অধিক পুরাতন। কা'বা ঘরের চেয়ে পুরাতন কোনো ইবাদাতখানা দ্বিতীয়টি আর নেই। এখানে সংক্ষেপে হজ্জের আচার অনুষ্ঠানগুলো উল্লেখ করা যেতে পারে। পবিত্র মক্কার সীমানায় মীকাত আসার সাথে সাথে নিত্যদিনের পোশাক খুলে ফেলতে হয়। তাকে পরিধান করতে হয় নির্ধারিত ইহরামের দুখণ্ড কাপড় যা সিলাইবিহীন। এক খণ্ড কোমর থেকে নীচ পর্যন্ত এবং অন্যটি কাঁধ আবৃত করার জন্য ব্যবহৃত হয়। এ পোশাক কেবলমাত্র পুরুষদের জন্য। মহিলাদের জন্য ভিন্ন পোশাক। এ সময় পুরুষের মাথাকে অনাবৃত অবস্থায় রাখতে হয়। তাছাড়া হজ্জের দিনগুলোতে সে নিজের সত্তাকে সম্পূর্ণরূপে ভুলে যেতে চেষ্টা করে। মক্কার অদূরে একটি স্থানের নাম আরাফাত। ইহরামের পোশাক পরিহিত অবস্থায় তাকে সেখানে যেতে হয়। সেখানে সে দিনটি অতিবাহিত করে গভীর ধ্যান-মগ্নতার মধ্য দিয়ে দিবাবসানে সে আরাফাতের ময়দান থেকে প্রত্যাবর্তন করে। রাতটি অতিবাহিত করে মুযদালিফায়। পরদিন প্রত্যুষে সে পৌঁছে যায় মক্কার সীমান্তবর্তী অঞ্চল

মিনায়। তাকে এখানে তিনদিন থাকতে হয়। প্রতিদিন সকালে সে শয়তানকে লক্ষ করে কঙ্কর ছুড়ে, পশু কুরবানী দেয়। এক সময়ে সে ক্ষণিকের জন্য চলে আসে কা'বায়। এখানে চারপাশে চক্কর দিয়ে সাতবার তাওয়াফ করে এবং কা'বা ঘরে অবস্থিত সাফা-মারওয়া পাহাড়ে সাত বার দৌড়ে সাঈ পালন করে।

বস্তুতপক্ষে এ ধরনের আচার-অনুষ্ঠান প্রতিপালনের একটি প্রতীক প্রেক্ষাপটও রয়েছে। জান্নাত হতে বের হয়ে আসার পর হযরত আদম (আ) এবং বিবি হাওয়া (আ) পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান। অতপর শুরু হয় একে অপরকে অনুসন্ধানের পালা। অবশেষে মেহেরবান আল্লাহর অসীম রহমতে তারা মিলিত হলেন আরাফাতের ময়দানে। হযরত আদম (আ) ও বিবি হাওয়ার বংশধরগণ আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বরূপ আরাফাতের ময়দানে এসে সমবেত হয়। নিজেদের অস্তিত্ব ও সত্তাকে ভুলে গিয়ে আল্লাহকে হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে। এভাবেই সে অতীতের ভুলত্রুটির জন্য আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং আগামী দিনগুলোর জন্য তাঁর হেদায়াত ও সাহায্য কামনা করে।

শয়তানের প্রতি কংকর নিক্ষেপ করা প্রসংগে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর ঘোষণাটি স্মরণ করা যেতে পারে। তিনি ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, তিনি দুনিয়ার যে কোনো জিনিসের চেয়ে আল্লাহকে বেশি ভালোবাসেন। তাঁর এ দাবি যে সত্য তা প্রমাণ করার জন্য আল্লাহ তাআলা তাঁকে প্রাণপ্রিয় পুত্র ইসমাঈলকে কুরবানী করতে বলেন। ঠিক তখনই শয়তান এসে সেখানে হাযির হয় এবং ইসমাঈলকে কুরবানী দেয়া থেকে বিরত থাকার জন্য হযরত ইবরাহীম (আ)-কে প্ররোচিত করার চেষ্টা করে। প্রতিবারই ইবরাহীম (আ) শয়তানকে তাড়িয়েছেন এবং তাকে লক্ষ করে কংকর ছোড়েন। অতপর শয়তান বিবি হাজেরার কাছে যায়। সবশেষে যায় ইসমাঈল (আ)-এর কাছে। তাঁদেরকেও ঠিক একইভাবে প্ররোচিত করার চেষ্টা করে। কিন্তু তাঁরা প্রত্যেকেই শয়তানকে তাড়া করেন। প্রতীকী আচরণ হিসেবে এখনো আমরা এর পুনরাবৃত্তি করে থাকি। এভাবেই মনের শয়তানী ও কুপ্রবৃত্তিগুলোকে প্রতিহত করার চেষ্টা করি।

আল্লাহর ঘর কা'বায় হাযির হওয়ার ঘটনাটি ব্যাখ্যা করে বলা অনাবশ্যক। আনুগত্য প্রকাশের নজীর হিসেবেই একজন মু'মিন কা'বা ঘরে যায়। তখন তার মধ্যে বিরাজ করতে থাকে পূর্ণ শ্রদ্ধা এবং বিনম্রতা।

তাছাড়া যে জিনিসের প্রতি কারো অনুরাগ থাকে, যাকে কেউ অন্তর দিয়ে ভালোবাসে, যত্ন করে তার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করার নজীর হিসেবে তার চারিপাশে প্রদক্ষিণ করে। এ রেওয়াজটি সুদূর অতীতকাল থেকে চালু রয়েছে। অনুরূপভাবে একজন মু'মিন কা'বা ঘরে এসে নির্দিষ্ট নিয়মে কা'বা ঘর তাওয়াফ করে।

সাফা-মারওয়ার পাদদেশ দিয়ে ৭ বার দৌড়ানোর যোগসূত্র রয়েছে বিবি হাজেরার সাথে। বর্ণিত আছে যে, হযরত ইবরাহীম (আ) স্বীয় স্ত্রী হাজেরা এবং দুধের শিশু ইসমাঈল (আ)-কে মক্কার জনমানব শূন্য একটি নির্জন স্থানে রেখে আসেন। অল্প সময়ের মধ্যে তাঁদের খাবার পানি শেষ হয়ে যায়। মাতৃস্নেহ মা হাজেরাকে অস্থির চঞ্চল করে তোলে। পিপাসায় কাতর শিশুর জন্য এক ফোঁটা পানির অন্বেষণে তিনি ছুটাছুটি করতে থাকেন। অতপর নির্গত হলো যমযম। মা হাজেরা যে স্থান বরাবর পানির জন্য ছুটাছুটি করছিলেন, মুসলমানগণ এখনো সেখানে গিয়ে এর পুনরাবৃত্তি করে থাকেন। এটা তারা করে থাকেন মাতৃ ভালোবাসার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন এবং আল্লাহর অনুগ্রহের প্রতি শুকরিয়া জানানোর উদ্দেশ্যে।

হজ্জের সামাজিক তাৎপর্যও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। হজ্জ অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়েই মুসলিম উম্মাহর মধ্যেকার ভ্রাতৃত্ববোধ অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। বর্ণ-ভাষা-গোত্র-স্থান ও আভিজাত্যের তারতম্যের কথা ভুলে গিয়ে সকল মু'মিন মুসলমান কা'বা ঘরে আসার জন্য তীব্র তাকিদ অনুভব করে। এখানে তারা পরস্পরের সাথে মিলিত হয় আন্তরিক ও সাম্যের ভিত্তিতে। নির্জন মরুভূমিতে তাঁরা ছাউনি ফেলে দিন যাপন করেন এবং হজ্জের আরকান-আহকাম পালন করেন সমবেতভাবে এবং নির্দিষ্ট সময়ে। এমনিভাবে তাঁরা অতিবাহিত করেন কয়েকটি দিন। এ সময়ের মধ্যে তারা নির্ধারিত নিয়মে কখনো সফরে থাকে, বিশ্রাম করে, আবার তাঁবুর মধ্যে অথবা খোলা আকাশের নীচে রাতযাপন করে। বস্তুতপক্ষে এর ব্যাপকতা ও গুরুত্ব অনেক বেশি। এসব কিছুর মধ্য দিয়ে মূলত আল্লাহর সৈনিকগণ সুশৃঙ্খল জীবনের প্রশিক্ষণ লাভ করে।

নবী করীম (স) ইন্তিকালের মাত্র কয়েক মাস পূর্বে হজ্জ পালন করেন। সে সময়ে তিনি জাবালে রহমতের চূড়ায় দাঁড়িয়ে একটি ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। ইসলামের ইতিহাসে এ ভাষণ মুক্তি সনদ হিসেবে পরিচিত। সে বছর আরবের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রায় ১,৪০,০০০ লোক হজ্জ উপলক্ষে মক্কায় আসেন। রাসূলে করীম (স)-এর ভাষণ শোনার জন্য

তাঁরা সমবেত হন জাবালে রহমতের পাদদেশে। তিনি তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণে বিশ্ববাসীকে ইসলামের মৌলিক বিষয়ের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। এর মধ্যে (ক) এক আল্লাহর ওপর বিশ্বাস এবং কোনো মূর্তি বা বস্তু তাঁর প্রতীক হতে পারে না। (খ) সকল মানুষ সমান। ধর্ম বা কৌলিন্যের কারণে মানুষের মধ্যে কোনো রকম তারতম্য বা ভেদাভেদ হতে পারে না। কেউ দাবি করতে পারে না একজনের ওপর আরেকজনের শ্রেষ্ঠত্ব। এখানে শ্রেষ্ঠত্ব বিবেচিত হবে কেবলমাত্র ব্যক্তির আল্লাহভীতি এবং আমলে সালেহ্-এর নিরিখে। (গ) জীবন, সম্পদ এবং সম্মানের ব্যাপারে প্রত্যেক মানুষের রয়েছে মৌলিক অধিকার। (ঘ) তিনি সুদী কারবারকে সম্পূর্ণ রূপে নিষেধ করেন (ঙ) রহিত করেন বংশগত বিরোধ এবং মানুষের তৈরি মতলবী বিচার ব্যবস্থাকে (চ) নারী জাতির সাথে ভালো ব্যবহার করার নির্দেশ দিলেন (ছ) সম্পদ মুষ্টিমেয় লোকের হাতে পূঞ্জীভূত না হয়ে যাতে অবিরত বণ্টন এবং হাত বদল হয় সেজন্য উত্তরাধিকার আইন প্রদান করলেন ও সুদ নিষিদ্ধ করলেন। (জ) তিনি আরো ঘোষণা দিলেন যে, আমাদের জীবনের প্রতি ক্ষেত্রেই আল্লাহর কালাম আল কুরআনই হবে সকল আইনের উৎস।

জানা যায় যে, হজ্জের ব্যাপারে জাহেলিয়াত যুগের কিছু আচার ইসলামের আবির্ভাবের প্রথম যামানা পর্যন্ত অব্যাহত ছিলো। যেমন বিশাল জনসমাবেশ উপলক্ষে এ সময়ে একটি বাৎসরিক সাহিত্য সম্মেলনের আয়োজন করা হতো। এ সম্মেলনে কবিরা তাদের স্বরচিত রচনা পাঠ করতেন। অনলবর্ষী বক্তারা উচ্চস্বরে বক্তৃতা দিয়ে তাঁদের মেধা প্রকাশ করতেন। পেশাদার কুস্তিগীরেরা দর্শকদের মাতিয়ে রাখত। আর ব্যবসায়ীরা নিয়ে আসত হরেক রকমের বিক্রয় সামগ্রী। খলীফা হযরত উমর (রা)-এর আমলে এ সমাবেশ প্রশাসনিক গুরুত্ব লাভ করে। তিনি এ সমাবেশকে ব্যবহার করেন একটি আপীল কোর্ট হিসেবে। এ সময়ে জনসাধারণ গভর্নর সেনাপতিদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে অভিযোগ তুলতে পারতো। অভিমত পেশ করতে পারতো সরকারের নতুন নতুন প্রকল্প সম্পর্কে।

পরিশেষে আবারো স্মরণ করা যেতে পারে যে, ইসলামে জাগতিক এবং ধর্মীয় জীবনের সাধারণ বিষয়গুলো সমানভাবে পবিত্র ও গুরুত্বপূর্ণ। এমন কি এগুলোর মধ্যে রয়েছে চমৎকার একটি সাযুজ্য ও সংযোগ।

যাকাত

সাধারণ অর্থে যাকাত মওজুদ অর্থ বা সম্পদের একটি নির্দিষ্ট অংশকে বছরান্তে দুঃখীদের মধ্যে বিতরণ করাকে বুঝায়। এর মধ্যে রয়েছে কৃষি ফসল, ব্যবসা-বাণিজ্যের পুঁজি, গৃহপালিত পশু, মওজুদ অর্থ এবং অন্যান্য সম্পদের ওপর ধার্যকৃত অর্থ। গোড়ার দিকে যাকাত হিসেবে পরিশোধ যোগ্য সমস্ত অর্থ সরাসরি সরকারী তহবিলে জমা দিতে হবে। কিন্তু খলীফা উসমান (রা)-এর খিলাফতকালে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, মওজুদ অর্থের ওপর যে যাকাত হয় তা মুসলমানরা নিজেরাই ব্যয় করতে পারবে। তবে কুরআন মজীদের যে সমস্ত খাতে যাকাতের অর্থ ব্যয়ের অনুমোদন রয়েছে, এ ব্যয় কেবলমাত্র সে সমস্ত খাতের জন্য হতে পারে।

কুরআন মজীদে ঘোষণা দেয়া হয়েছে যে, সম্পদ হলো মানুষের বেঁচে থাকার জন্য একটি অত্যাবশ্যকীয় এবং মৌলিক উপাদান। ইসলামে যাকাত প্রদান করাকে ঈমানের একটি অংগ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। নামায, রোযা ও হজ্জের ন্যায় যাকাতকেও দেয়া হয়েছে অবশ্য পালনীয় কর্তব্যের মর্যাদা। তবে স্মরণ রাখতে হবে যে, রাষ্ট্র প্রধানের আরাম আয়েশ বা শান-শওকতের জন্য কেউ যাকাত দেয় না। বরং ব্যক্তির ওপর সমাজের বিশেষ করে অভাবগ্রস্ত মানুষের যে অধিকার রয়েছে তারই অংশ হিসেবে সে যাকাত দেয়। এভাবে সে নিজেই আত্মাকে পবিত্র এবং উন্নততর পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। ব্যুৎপত্তিগত দিক থেকে বিবেচনা করলেও এটাই যাকাতের উদ্দেশ্য।

রাসূলে করীম (স) এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের আমলে ইসলামী রাষ্ট্রের মুসলমান নাগরিকদের যাকাত ছাড়া অন্য কোনো কর দিতে হতো না। উল্লেখ্য যে, যাকাতের সাথে দান-খয়রাতের বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। মুসলমানদেরকে নির্দিষ্ট পরিমাণ এবং বাধ্যতামূলকভাবে যে যাকাত পরিশোধ করতে হতো সেটাই বিবেচিত হতো রাজস্ব হিসেবে। রাসূলে করীম (স) যাকাতকে একটি দীনী দায়িত্ব বা ইবাদাত হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন। একজন মুসলমানের অন্তরে যাকাত আদায়ের ব্যাপারে নিষ্ঠা এবং আগ্রহ সৃষ্টি করাই ছিলো উদ্দেশ্য। তা ছাড়া এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস, নামায-রোযা ও হজ্জের মত যাকাতও আল্লাহ প্রদত্ত বিধানের অন্তর্ভুক্ত। বিশ্বাসকে যদি আধ্যাত্মিক ইবাদাত এবং নামায-রোযা এবং হজ্জকে শারীরিক ইবাদাত হিসেবে গণ্য করা হয়, তাহলে যাকাতকে বিবেচনা করা যেতে পারে অর্থ সংক্রান্ত ইবাদাত হিসেবে। ফকীহগণ একে বলেছেন ইবাদাতে মালিয়াহ। অর্থাৎ সম্পদের মাধ্যমে আল্লাহর ইবাদাত।

একথা দ্বারা আবারো এটা প্রমাণিত হয় যে, ইসলাম সমগ্র মানব জীবনকে একটি সত্তায় বিকশিত করেছে। এর মূল উদ্দেশ্য হলো দেহ ও আত্মার মধ্যে একটি সুন্দর সামঞ্জস্য বিধান করা। এখানে দেহ ও আত্মার মধ্যে একটিকে হেয় করে অপরটির প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শনের অবকাশ নেই।

কুরআন হাদীসে কর অর্থে মোটামুটি অনেকগুলো শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এগুলো হলো—যাকাত, সাদকা, হক। কুরআনের অসংখ্য আয়াতে যাকাতের উল্লেখ রয়েছে। এর অর্থ সমৃদ্ধ এবং পবিত্রকরণ। যাকাত শব্দ দ্বারা একথাই বুঝান হয়েছে যে, সম্পদ বৃদ্ধির সাথে সাথে সম্পদের একটি অংশকে অবশ্যই পরিশোধ করতে হবে। সম্পদ পবিত্র করার জন্য এটা আবশ্যক। এর পরে আসে সাদাকা। সাদাকা শব্দটি সততা এবং বদান্যতা উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ যারা পশ্চাদপদ যাদের ভাগ্য ততটা সুপ্রসন্ন নয়, মানবতার খাতিরে তাদের প্রতি সহৃদয়বান এবং দয়াপরবশ হওয়াটাই হলো সাদাকা। খাজনা বা কর হিসেবে ব্যবহৃত আরেকটি শব্দ হলো হক। 'হক'-এর অর্থ ন্যায্য অধিকার। একজনের জন্য যা অধিকার তাই অপরের জন্য অবশ্য পালনীয় কর্তব্য হিসেবে বিবেচিত হয়। অন্য ভাবে বলা যেতে পারে যে, দায়িত্ব ও অধিকার পরস্পরের সাথে ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্পর্কযুক্ত এবং এটাই হলো সমাজের সকল প্রকার কাজ-কর্মের মূল ভিত্তি।

বিভিন্ন জিনিসের জন্য কর প্রদান করতে হয়। এর মধ্যে রয়েছে সঞ্চিত সম্পদ, ব্যবসা সামগ্রী, সরকারী চারণ ভূমিতে পালিত গবাদি পশু ও খনিজ সম্পদ, পানিতে উৎপন্ন দ্রব্যাদি প্রভৃতি। এ সমস্ত দ্রব্যাদির ওপর আরোপিত কর বা শুল্কের পরিমাণের মধ্যে তারতম্য থাকতে পারে।

রাসূলে করীম (স)-এর আমলে শুল্ক বা করের নিয়ম-নীতিগুলো অতটা কঠোর ছিলো না। অথবা এটা এমনো কোনো বিষয় ছিলো না যেখানে কোনো রকম পরিবর্তন বা সংশোধনের সুযোগ নেই। ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি যে, রাসূল (স) নিজে তায়েফবাসীদের যাকাত প্রদানের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়েছিলেন। অন্যান্য অঞ্চলের অধিবাসীদের ক্ষেত্রেও অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণের নজীর রয়েছে। আবু উবায়দের সূত্রে বর্ণিত আছে যে, মহান খলীফা হযরত উমর (রা) মদীনায় আমদানীকৃত খাদ্যসামগ্রীর ওপর থেকে কর বা শুল্কের পরিমাণ হ্রাস করেছিলেন। রাসূল (স)-এর জীবদ্দশায় কখনো এমন ঘটনা ঘটেছে যে, তিনি মুসলমানদের নিকট থেকে বিশেষ ধরনের কর প্রদানের জন্য আবদন করেছেন। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে যে, বহিঃশত্রুর আগ্রাসনের মুখে তিনি দেশের

প্রতিরক্ষার জন্য এ ধরনের করের জন্য আবেদন জানাতেন। বস্তুতপক্ষে এ ঘটনাবলী থেকে আইনবেত্তাগণ এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, প্রয়োজনবোধে সরকার নতুন নতুন শুল্ক আরোপ করতে পারে। আরবী পরিভাষায় এটাকে বলে নাবায়িব। তা ছাড়া কোন্ কোন্ বিষয়ের উপর কর আরোপ করা যাবে অথবা কর এবং হার কত হবে কুরআন মজীদে সে বিষয়ে নির্দিষ্ট করে কিছু বলা নেই।

তবে সরকারী বাজেটের প্রধান প্রধান খাত এবং রাষ্ট্রীয় খরচ সম্পর্কে কুরআন মজীদে বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে।

اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَاۗءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ

وَفِى الرِّقَابِ وَالْغٰرِمِيْنَ وَفِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ط- التوبة : ٦٠

"সাদাকা তো কেবল নিঃস্ব, অভাবগ্রস্ত ও সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের জন্য, যাদের চিত্ত আকর্ষণ করা হয় তাদের জন্য, দাসমুক্তির জন্য, ঋণ ভারাক্রান্তদের জন্য, আল্লাহর পথে সংগ্রামকারী ও মুসাফিরদের জন্য।"
—সূরা আত তাওবা ঃ ৬০

অর্থাৎ সাদাকা এবং যাকাত মোটামুটিভাবে সম অর্থবোধক শব্দ। এ কেবলমাত্র মুসলিম নাগরিকদের নিকট থেকে আদায় করা হয়। আবার অমুসলিম নাগরিকদের নিকট থেকে আদায়যোগ্য পাওনাকে বলা হয় খারাজ, জিযিয়া, গনীমাত প্রভৃতি। এগুলো সাদাকা বা যাকাতের অন্তর্ভুক্ত নয়। আবার এ দু ধরনের অর্থ বা সম্পদ থেকে যারা সুবিধা ভোগ করবে, তাদের মধ্যেও প্রচুর প্রভেদ রয়েছে।

আয় সম্পর্কে নিয়ম-নীতি ও বিধি-বিধান প্রণয়ন করা আইনবিদগণের দায়িত্ব। অপরদিকে রাষ্ট্রীয় খরচের নিয়ম-নীতিগুলো নির্ধারণ করা হয়েছে কুরআন মজীদে। যাকাতের অর্থ যারা ভোগ করতে পারে তাদেরকে আটটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে। ওপরের আয়াতে তাদের বিবরণ রয়েছে। লক্ষণীয় বিষয় এই যে, এ আটটি শ্রেণীর মধ্যে রাসূলে করীম (স)-এর নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। নিম্নে উপরোক্ত আয়াতের কিছুটা আলোকপাত করা হলো। যা আয়াতের ব্যাপকতা ও মর্মকথা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পেতে সহায়ক হবে।

খলীফা ওমর (রা) ছিলেন নবী করীম (স)-এর আদর্শের একজন অন্যতম ব্যাখ্যাতা। তাঁর বর্ণনা মতে নিঃস্ব বলে দরিদ্র বা মিসকীনকে,

আর অভাবী মুসলমানকে বলে ফকীর। অবশ্য অভাবী ও মিসকীন উভয়ের সাহায্যের প্রয়োজন। এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, অমুসলিমদের নিকট থেকে রাজস্ব হিসেবে যে অর্থ পাওয়া যায় তা সাদাকার অন্তর্ভুক্ত নয়। তবু ইসলাম মুসলমানদের নিকট থেকে আদায়কৃত রাজস্ব থেকে অমুসলিমদের সুবিধা লাভের সুযোগ দিয়েছে।

রাষ্ট্রের রাজস্ব আদায়ের কাজে যারা নিয়োজিত রয়েছে তাদেরকে কালেকটর বলে। অপরদিকে যারা রাজস্ব খরচের দায়িত্বে নিয়োজিত তাদের বলে কন্ট্রোলার এবং অডিটর। বস্তুতপক্ষে বেসামরিক কর্মকাণ্ড থেকে শুরু করে প্রতিরক্ষা পর্যন্ত গোটা প্রশাসনই কোনো না কোনোভাবে রাজস্ব সংগ্রহ বা ব্যয়ের সাথে জড়িত। এদিক থেকে বিবেচনা করলে প্রশাসনের সমস্ত বিভাগই রাজস্ব সুবিধা প্রাপ্তদের তালিকার মধ্যে এসে যায়।

মুসলিম সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলতে হয়। প্রখ্যাত ফকীহ আবু ইয়ালা আল ফাবরা (আল আহকামুস সুলতানিয়াহ, পৃ ১১৬)-এর মতে এদেরকে ৪টি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। প্রথমত যারা মুসলমানদের উপকারে আসতে পারে। দ্বিতীয়ত যারা ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে, তৃতীয়ত এমন কিছু লোক যারা মুসলমানদের ক্ষতি করা থেকে বিরত থাকবে, চতুর্থত যাদের মাধ্যমে তাদের গোত্র বা গোষ্ঠীর লোকজনকে ইসলামে দীক্ষিত করা সম্ভব হবে।

সাধারণ অর্থে বন্দিমুক্তি শব্দটি দুটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। প্রথমত দাসত্বের শৃংখলা থেকে ক্রীতদাসদের অব্যাহতি প্রদান, দ্বিতীয়ত যুদ্ধ বন্দীদের মুক্তিপণ প্রদান। এখানে ক্রীতদাস সম্পর্কে সামান্য আলোকপাত করা যেতে পারে। ইসলামে পূর্বে বিশ্বের অন্য কোনো ধর্মই দাসত্বের দূরাবস্থা দূরীকরণের প্রতি নজর দেয়নি। ঐতিহাসিক সারাকসীর বর্ণনায় উল্লেখ আছে যে, প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ (স) সর্বপ্রথম দাস প্রথাকে নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করেন। কুরআন মজীদে এরূপ বিধান রয়েছে যে, দাস-দাসীদের মধ্যে কেউ মুক্তি বাবদ অর্থ পরিশোধ করার প্রস্তাব দিলে মালিক তা প্রত্যাখ্যান করতে পারে না। এমন কি দাসকে অর্থ উপার্জন এবং মুক্তি বাবদ প্রয়োজনীয় অর্থ জমা করার জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ দেয়ার জন্য আদালত মালিককে বাধ্য করতে পারে। উপরন্তু মুসলিম সরকার মুক্তি প্রত্যাশী দাসদের সাহায্যে বাৎসরিক বাজেটে অর্থ বরাদ্দের ব্যবস্থা রাখে।

ইসলামের দৃষ্টিতে একজন মানুষ আরেকজন মানুষের ওপর শোষণ চালাবে না। বন্দীদের মধ্যে যারা সর্বস্ব হারিয়ে নিঃস্ব হয় এবং যারা স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেনি তাদের ব্যাপারে ইসলাম বন্দীদের মধ্যে ন্যায়ানুগ

ব্যবস্থা প্রদান করেছে। তাদেরকে ইসলামী পরিসীমার মধ্যে রেখে ইসলামী আচার-আচরণ ও ধ্যান-ধারণা সম্পর্কে জ্ঞান দান করার তাকিদ দিয়েছে। ইসলামের দৃষ্টিতে একটি সরকার কেবলমাত্র ন্যায়সংগত যুদ্ধ বন্দীদের আটক রাখতে পারে। লুণ্ঠন বা অপহরণের মাধ্যমে কেউ কাউকে দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধ করতে পারে না। এমন কি পিতামাতা স্বেচ্ছায়-সন্তানকে দাস হিসেবে বিক্রি করতে পারে না।

আবার যারা ঋণভারে নিমজ্জিত তাদেরকে সাহায্য প্রদান করা যেতে পারে। ঋণগ্রস্তদের সাহায্যার্থে খলীফা হযরত ওমর (রা) সুদমুক্ত ঋণ প্রদানের কর্মসূচি চালু করেছিলেন। দয়াপরবশ ও সদিচ্ছা নিয়ে যে কাজ করা হয় তা সবই ফী সাবীলিল্লাহর অন্তর্ভুক্ত। দুনিয়ার বুকে আল্লাহর শাসন কায়েম করাই ইসলামের উদ্দেশ্য। সে কারণেই ফকীহগণ ইসলামের প্রতিরক্ষার্থে সমরাস্ত্র ক্রয় করাকে সওয়াবের কাজ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

মুসাফিরদেরকে আতিথেয়তা করা ছাড়াও আরো অনেকভাবে সাহায্য করা যেতে পারে। এর মধ্যে রয়েছে মুসাফিরদের যাতায়াতের পথে স্বাস্থ্য ও আরামের নিশ্চয়তা দেয়া, সফরকালীন নিরাপত্তা বিধান করা, তাদের সুখ ও কল্যাণের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি। এ স্থলে মুসাফির স্বদেশী কি বিদেশী মুসলিম কি অমুসলিম তা বিবেচ্য বিষয় নয়।

উপসংহার

এ পর্যন্ত ইসলামের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান সম্পর্কে একটি বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হলো। এ স্থলে একথা পুনরায় উল্লেখ করাটা অপ্রাসংগিক হবে না যে, উল্লেখিত আচার-অনুষ্ঠানসমূহের যথাযথ প্রতিপালন এবং বিভিন্ন বিধানসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধনই হলো ইসলামী জীবন ব্যবস্থার মূলনীতি। কুরআন মজীদে বার বার বলা হয়েছে যে, সালাত কায়েম কর এবং যাকাত দাও। কুরআন মজীদের এ নির্দেশের মধ্য দিয়ে মূলত একই সাথে এবং একই সময়ে এক আল্লাহর ইবাদাত-বন্দেগীর ও সমাজের প্রতি দায়িত্ব পালন করার কথা বলা হয়েছে। দেহ ও আত্মার মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এর চেয়ে উত্তম মাধ্যম আর কি হতে পারে ? ইসলামের দৃষ্টিতে আধ্যাত্মিক সাধনা যেমন পার্থিব সুযোগ সুবিধা থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, তেমনিভাবে জাগতিক দায়-দায়িত্বের সাথে জড়িয়ে আছে আধ্যাত্মিক গুরুত্ব এবং এসব কিছুই নির্ভর করছে ব্যক্তির ইচ্ছা এবং নিয়তের ওপর— এটাই হলো ব্যক্তির আচার-আচরণের প্রধান চালিকা শক্তি।

ষষ্ঠ অধ্যায়

আধ্যাত্মিক জীবন ঃ ইল্‌মে তাসাউফ

ইসলাম মানুষের সামগ্রিক জীবনের জন্য জাহিরী ও বাতিনী ইল্‌ম বিন্যস্ত করে দিয়েছে। কিন্তু এটা সত্য যে, ভিন্নতার কারণে নির্দিষ্ট কিছু ব্যক্তি একটা বিষয়ে পারদর্শিতা অর্জন করে, অন্য বিষয়গুলোতে পারদর্শিতা অর্জন করতে পারে না। কেউ আধ্যাত্মিক সাধনায় ব্যাপৃত থাকে তবু তাকে বৈষয়িক জীবনের বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি মনোযোগী হতে হয়। তার বেঁচে থাকার জন্য যে সমাজের সদস্য সে সেই সমাজের কল্যাণার্থে এবং অন্যান্য প্রয়োজনে বৈষয়িক জীবনের সাথে সম্পৃক্ত হতে হয়। আল্লাহর প্রতি নির্ভেজাল বিশ্বাস, অকৃত্রিম আনুগত্য এবং আত্মসমর্পণের সর্বোত্তম পন্থা সম্পর্কে বেশ কয়েকখানি হাদীস রয়েছে। আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণের সর্বোত্তম পন্থা সম্পর্কে প্রিয়নবী (স) বলেছেন—"তোমার পক্ষ থেকে উত্তম আচরণ ও স্বভাব এই যে, তুমি নিবিষ্ট মনে আল্লাহকে ডাকবে এভাবে যে, তোমার মনে হবে, তুমি যেনো তাঁকে দেখতে পাচ্ছ। অন্তত তোমার অন্তরে এ অনুভূতি থাকবে যে, তুমি তাকে দেখতে না পেলেও তিনি ঠিকই তোমাকে দেখছেন।"

এ হাদীসটির মধ্য দিয়ে মূলত ইসলামের আধ্যাত্মিক সাধনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর এটি হলো আল্লাহর ইবাদাত-বন্দেগী করার ও আনুগত্য প্রকাশের সর্বোত্তম ও চমৎকার মাধ্যম। "আল্লাহর ইবাদাত" শব্দটি অত্যন্ত ব্যাপক। শব্দটি কেবলমাত্র কোনো আচরণ বা বিশ্বাসের প্রতি দিকনির্দেশ করে না। বরং মানুষের গোটা জীবনের আচার-আচরণই এর অন্তর্ভুক্ত। যিনি সকল কাজকর্মে আল্লাহর ইচ্ছা ও বিধি-বিধান দ্বারা পরিচালিত হন, আধ্যাত্মিকতার বিচারে তার স্থান সবার ওপরে।

ইসলামী পরিভাষায় আধ্যাত্মিকতার কয়েকটি সমার্থক শব্দ রয়েছে। যেমন ইহ্‌সান, কুরব (আল্লাহর নৈকট্য), তরীকত, সুলুক, তাসাউফ। এ সমস্ত শব্দগুলোর মধ্যে তাসাউফ-এর ব্যবহারই সবচেয়ে বেশি। জীবন সম্পর্কে কতকগুলো মৌলিক প্রশ্নের সমন্বয়ে এর বিষয়বস্তু গড়ে উঠেছে।

প্রতিটি মানুষের ব্যক্তি স্বাতন্ত্র রয়েছে। একজনের সাথে আরেকজনের রয়েছে মেজাজ ও প্রকৃতিগত পার্থক্য। সর্বযুগের সকল সমাজের মানুষের জন্য একথা সত্য। মানুষে মানুষে মেজাজ ও প্রকৃতিগত এ পার্থক্য সত্ত্বেও

ইসলাম এমন কিছু নিয়ম-নীতি প্রবর্তন করেছে যেগুলো প্রতিটি মানুষের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। প্রত্যেকেরই এগুলো প্রতিপালন করতে হয় অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে। এ রীতিনীতিগুলো শুধুমাত্র আধ্যাত্মিকতার সাথেই সংশ্লিষ্ট নয়, বরং একই সময়ে এগুলোর সংযোগ রয়েছে বস্তুগত চাহিদার সাথে। সহজবোধ্যতার জন্য এখানে সাহাবীগণের প্রতি আলোকপাত করা যেতে পারে। এটা সর্বজন স্বীকৃত যে, সর্বোত্তম মুসলিম হচ্ছেন সাহাবায়ে কেরাম যারা প্রিয়নবী (স)-এর হাতে বায়আত করেছেন এবং তাঁর প্রত্যক্ষ সাহচর্যে ইসলামের শিক্ষা পেয়েছেন। তাঁদের জীবন-বৃত্তান্ত পর্যালোচনা করলেও দেখা যাবে যে, তাঁদের প্রত্যেকেই ছিলেন এক একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। তাঁদের মধ্যে ছিলেন মহাবীর খালিদ ইবনে ওয়ালীদ (রা)-এর মতো যোদ্ধা। রাসূলে করীম (স) তাঁর ওপর খুবই সন্তুষ্ট ছিলেন এবং খুশী হয়ে তাঁকে আল্লাহর তলোয়ার বা 'সাইফুল্লাহ' উপাধি দিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন হযরত উসমান (রা) এবং হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা)-এর মত ধনী ব্যবসায়ী। রাসূল (স) তাঁদেরকে জীবিতকালেই জান্নাতী বলে খোশ খবর দিয়েছেন। আবার তাঁদের মধ্যে আরো ছিলেন হযরত আবু যর গিফারী (রা) যিনি বিষয় সম্পদকে রীতিমত ঘৃণা করতেন। তিনি বেছে নিয়েছিলেন একটি চরম সংযমী জীবন। অর্থাৎ তাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন মেজাজ ও প্রকৃতিগতভাবে পরস্পর ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। অথচ তাঁরা ছিলেন প্রিয়নবী (স)-এর ঘনিষ্ঠ সহচর, আল্লাহর প্রিয় বান্দা, ইসলামের নিয়ম-নীতিগুলো প্রতিপালনের ব্যাপারে তাঁরা ছিলেন অকৃত্রিম এবং নিষ্ঠাবান।

এ প্রসংগে ইসলামের মৌলিক রীতিনীতিগুলোর প্রতি আলোকপাত করা যেতে পারে। একদিন এক বেদুঈন প্রিয়নবী (স)-এর নিকটে আসে এবং ন্যূনতম যে কাজগুলো করলে জান্নাতবাসী হওয়া যাবে সেগুলো সম্পর্কে জানতে চায়। জবাবে রাসূল (স) বলেন, এক আল্লাহর ওপর ঈমান আনবে, প্রত্যহ পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করবে, রমযান মাসে সিয়াম পালন করবে, হজ্জ করবে এবং যাকাত দেয়ার সামর্থ থাকলে যাকাত দিবে। অতপর বেদুঈন ইসলাম গ্রহণ করে এবং চিৎকার দিয়ে বলে ওঠে ঃ আল্লাহর কসম, আমি এর চেয়ে একটুও বেশি করব না, কমও করব না। বেদুঈন লোকটি দরবার থেকে চলে যাওয়ার পর রাসূলে করীম (স) বললেন—"কেউ যদি একজন জান্নাতীকে দেখতে চায়, তাহলে সে যেন এই বেদুঈনের দিকে তাকায়।"–বুখারী, মুসলিম

মহাবীর হযরত খালিদ (রা) অথবা অঢেল সম্পদের অধিকারী হযরত উসমান (রা) কেউ-ই ইসলামের রীতিনীতি এবং এর আধ্যাত্মিকতাকে কখনো অবহেলা করেননি। অনুরূপভাবে হযরত আবু যর গিফারী (রা), হযরত সালমান ফরসী (রা), হযরত আবুদ দারদা (রা)-এর মতো যে সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম কঠোর সংযমী জীবন পসন্দ করতেন। তাঁরা কখনো সন্ন্যাস জীবন যাপনের ব্যাপারে, সারা বছর সিয়াম পালনের ব্যাপারে অথবা জাগতিক সুখ-সম্ভোগমুক্ত জীবন যাপনের ব্যাপারে প্রিয় নবী (স)-এর অনুমতি চাননি। বরং রাসূলে করীম (স) তাঁদেরকে ঘর-সংসার, বিয়ে-শাদী করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি আরো বলেছেন যে, এমনকি তোমাদের শরীরের প্রতিও তোমাদের দায়-দায়িত্ব রয়েছে। (ইবনে হাম্বল) অর্থাৎ মেজাজ বা পদ্ধতিগতভাবে একজন ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য যাই হোক না কেন, সে কখনো নিজের জন্য বেঁচে থাকে না বরং সে বেঁচে থাকে আল্লাহর জন্য, আল্লাহর উদ্দেশ্যেই সে নিবেদিত। আল্লাহ তাআলা আমাদের মধ্যে যে নিয়ামত ও সম্পদ দিয়েছেন, তার অপব্যবহার করার অনুমোদন ইসলামে নেই।

সুফ্ফাহ

রাসূলে করীম (স)-এর আমলে মদীনার মসজিদে নববীতে সুফ্ফা নামে একটি নির্দিষ্ট স্থান ছিলো। এ জায়গাটি ছিলো সালাতের স্থান থেকে খানিকটা দূরে। প্রকৃতপক্ষে এটি ছিলো শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের একটি কেন্দ্র। কেন্দ্রটি পরিচালিত হতো নবী (স)-এর ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সাহাবায়ে কেরাম এখানে অবস্থান করতেন। তাঁরা তাদের সময়ের দিবাভাগের একটা অংশকে নিয়োজিত রাখতেন ইসলামী জীবন পদ্ধতি শেখার কাজে। তাঁরা যে শুধু আল্লাহর সাথে মানুষের সম্পর্ক সম্বন্ধে শিক্ষা গ্রহণ করতেন তা নয় লেনদেনের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কেও জ্ঞান অর্জন করতেন, অপরদিকে দৈনন্দিন জীবনের নিম্নতম চাহিদা পূরণের জন্য তাঁরা কায়িক পরিশ্রমও করতেন। তাঁদেরকে যাতে সমাজের বোঝা ও পরজীবী হিসেবে জীবন ধারণ করতে না হয় সেজন্যই তাঁরা কাজ করতেন। সারাটা রাত তাঁরা নফল ইবাদাত-বন্দেগী এবং আল্লাহর যিকর-আযকারে মশগুল থাকতেন, মুরাকাবা মুশাহাদা করতেন। তাঁদের ইবাদাত-বন্দেগীর সাথে কেবলমাত্র উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন সুফীয়ায়ে কেরামের মুরাকাবার তুলনা হতে পারে। ইসলাম চর্চা ও ইবাদাত-বন্দেগীর এ প্রতিষ্ঠানটিকে 'খানকা' 'তেককা' এবং এ জাতীয় অনেক নামেই সনাক্ত করা যেতে পারে। তবে এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, সুফ্ফায় অবস্থানরত সাহাবীগণ পার্থিব

জগতের কাজকর্ম অপেক্ষা আধ্যাত্মিক ধ্যান সাধনায় অধিক সময় অতিবাহিত করতেন এবং আধ্যাত্মিক আচার-অনুষ্ঠানের সাথে অধিকতর সম্পৃক্ত থাকতেন।

ইসলামের এই প্রাথমিক সূফীগণকে প্রিয়নবী (স) যে সমস্ত সবকের তা'লীম দেন তার বিস্তারিত তথ্য জানা না গেলেও হয়তো তিনি প্রত্যেকের মেজায প্রকৃতি ও ধারণ ক্ষমতার নিরিখে তা'লীম দিতেন। লক্ষ ও উদ্দেশ্য সুনির্দিষ্ট ও নির্ধারিত হবার কারণে অবাধ স্বাধীনতা ছিলো শরীআত সম্মত পদ্ধতি প্রক্রিয়া বা তরীকা বেছে নেবার। এ প্রসঙ্গে রাসূলে করীম (স)-এর একটি হাদীসের উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি বলেছেন, জ্ঞান হলো মু'মিনের হারানো সম্পদ। যেখানে সে এর সন্ধান পাবে, তার উচিত সেখান থেকেই তা সংগ্রহ করা।–তিরমিযী, ইবনে মাযা

ইলমে তাসাউফের গুরুত্ব

ইলমে তাসাউফের মাধ্যমে ইসলাম-ঈমান দৃঢ় করার, ইবাদাতে জান্নাতী সুখ আনয়ন করার ও প্রিয়নবী (স)-এর সুন্নত যথাযথভাবে পালন করার প্রেরণায় উদ্ভাসিত হওয়া যায়। বস্তুতপক্ষে মানব জীবনের সমস্ত কাজকর্ম ব্যক্তির আচার আচরণের উন্নয়ন, ধর্মীয় দায়িত্ব কর্তব্যগুলো পালন থেকে শুরু করে প্রতিটি ক্ষেত্রে রাসূল (স)-কে গ্রহণ করতে হয় আদর্শ হিসেবে।

ইলমে তাসাউফের (অতীন্দ্রিয়বাদ) সাথে অদৃশ্যকে জানা অথবা অলৌকিক কার্য সম্পাদন করার কোনো সম্পর্ক নেই। অথবা মনোজাগতিক প্রক্রিয়ায় একজনের ইচ্ছা অনিচ্ছাগুলোকে আরেক জনের ওপর চাপিয়ে দেয়ার রীতির সাথেও এর সংযোগ নেই। এমনকি কঠোর সংযম, রিপু দমন, নির্জনতা, গভীর ধ্যানমগ্নতা এবং সংবেদনশীলতার সাথে অতীন্দ্রিয়বাদের সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যাবে না। অবশ্য কখনো কখনো এগুলোর মাধ্যম বা প্রক্রিয়া হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে কিন্তু এগুলো কখনো লক্ষ্য হিসেবে বিবেচিত হতে পারে না। এমনকি সর্বেশ্বরবাদের মতো বিশ্বাসের সাথেও এর কোনো যোগসূত্র নেই। আমরা যেটাকে সর্বেশ্বরবাদ বলি—অর্থাৎ ঈশ্বর সবকিছুতেই আছেন এবং সবকিছুই ঈশ্বর এ জাতীয় বিশ্বাসের সাথেও অতীন্দ্রিয়বাদের কোনো যোগসূত্র নেই। কোনো জ্ঞান সাধনায় যারা অপরিপক্ক তারা এমন দাবীও করে থাকে যে, অতিন্দ্রীয়বাদ সকল প্রকার ইসলামী শরীয়াত ও বিধি বিধানের উর্ধে ইসলাম ধর্মের আরোপিত দায়-দায়িত্বের খুব সামান্য অংশই তাদের ওপর

বর্তায়। বস্তুতপক্ষে এ জাতীয় মতবাদের সাথেও অতিন্দ্রীয়বাদের কোনো সংযোগ নেই বরং শরীয়াতকে নিয়েই তাসাউফ বিজ্ঞান।

ইসলামী পরিভাষায় ব্যক্তির সর্বোত্তম আচরণ পদ্ধতিকে অতীন্দ্রিয়বাদ বলা যায়। এটা এমন একটি পদ্ধতি বা প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে ব্যক্তি তার নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে, প্রতিটি কর্ম ও চিন্তার সাথে অনুভব করে আল্লাহর সার্বক্ষণিক উপস্থিতি। এরা সারাক্ষণ আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ এবং সান্নিধ্য লাভের আকাঙ্ক্ষায় মশগুল থাকে।

ইসলামী বিধান মতে একজন মানুষের এমন কিছু দায়িত্ব কর্তব্য আছে যেগুলোকে 'বাহ্যিক' ইবাদাত হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে সালাত কায়েম করা, সিয়াম পালন করা, খারাপ এবং মন্দকাজ থেকে বিরত থাকা ইত্যাদি। আবার এমন কিছু কাজ আছে যেগুলো আভ্যন্তরীণ বলে চিহ্নিত। এর মধ্যে রয়েছে ঈমান, আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা, কর্তব্যের প্রতি নিষ্ঠা, অহংবোধ থেকে মুক্ত থাকা ইত্যাদি। অতীন্দ্রিয়বাদ এক ধরনের প্রশিক্ষণ। এ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ব্যক্তি শেষোক্ত দায়িত্বগুলো প্রতিপালনের জন্য চেষ্টা করে। তবু একথা সত্য যে, অন্তরকে পরিশীলিত করাই বাহ্যিক দায়িত্ব কর্তব্যগুলোর মূল উদ্দেশ্য এবং এটাই হলো শাশ্বত মুক্তির একমাত্র মাধ্যম।

মোটকথা একজন সূফী চিন্তা ও চেতনাকে খুবই উন্নততর পর্যায়ে নিয়ে যান। সাধারণ লোকদের কাছে এটাই প্রতিভাত হয় কারামত হিসেবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কোনো সূফী এ ধরনের অলৌকিক ক্ষমতা অর্জনের জন্য চেষ্টা করেন না। বরং তাঁরা এগুলোকে সযত্নে পরিহার বা উপেক্ষা করে থাকেন। বিশেষ সাধনা বলে কারো পক্ষে অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা হয়ত সম্ভব। কিন্তু অতীন্দ্রিয়বাদীরা কখনো এমনটি প্রত্যাশা করে না। কারণ অদৃশ্য বিষয় বা গায়েব একমাত্র আল্লাহর ফিতরাতের অন্তর্ভুক্ত এবং এগুলো প্রকাশের একটি সময়ও আছে। উপযুক্ত সময়ের পূর্বে এ অদৃশ্য বিষয়গুলো প্রকাশিত হলে মানুষের জন্য খারাপ পরিণতি বয়ে আনে। সে কারণেই সূফীগণের পক্ষে অদৃশ্যকে জানার ক্ষমতা আল্লাহর তরফ থেকে অর্জন করলেও তিনি কখনো তা প্রয়োগ করেন না। আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং নৈকট্য অর্জনের জন্য তাঁরা সবসময় আত্মার পরিশুদ্ধির প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখেন।

প্রকৃত মু'মিন মুসলমানের বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি সবসময় বাহ্যিক আচার-আচরণ পরিশীলিত করেন, দৃঢ় করেন অন্তরের বিশ্বাসকে।

সূফীয়ায়ে কেরামের ভাষায় এটাকে বলে শরীর এবং আত্মার শুদ্ধিকরণ-তাযকিয়ায়ে নফস। বাহ্যিক আচার-আচরণের জন্য রয়েছে ফিক্‌হ বা মুসলিম আইন। মানুষের গোটা জীবন জুড়ে এর ব্যাপ্তি। ধর্মীয় বিধি-বিধান, পারস্পরিক সম্পর্ক, শাস্তি, দণ্ডবিধি প্রভৃতি বিষয়গুলো এর অন্তর্ভুক্ত। এ বিষয়গুলোর একটি অভ্যন্তরীণ দিকও রয়েছে এবং এর সমন্বয়ে গড়ে ওঠে অতীন্দ্রিয়বাদের বিষয়বস্তু, যেমন সালাতের দুটি দিক রয়েছে একটি হলো সালাত আদায়ের নিয়ম-কানুন ও বিধি-বিধান সংক্রান্ত। অপরটি হলো সালাতের প্রতি নিষ্ঠা ও একাগ্রতা। এখানে প্রথমটি ইলমে ফিক্‌হ এবং দ্বিতীয়টি ইলমে তাসাউফের অন্তর্ভুক্ত। এ প্রসঙ্গে কুরআন মজীদের একটি আয়াত উল্লেখ করা যেতে পারে ঃ

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝ الَّذِيْنَ هُمْ فِىْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ ۝

"অবশ্যই সফলকাম হয়েছে মু'মিনগণ যারা বিনয়-নম্র নিজেদের সালাতে।"–সূরা আল মুমিনূন ঃ ১-২

আল্লাহ্ আরো বলেন ঃ

اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ ۚ وَاِذَا قَامُوْٓا اِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوْا كُسَالٰى ۙ يُرَآءُوْنَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ اِلَّا قَلِيْلًا ۝ - النساء : ١٤٢

"মুনাফিকগণ আল্লাহকে প্রতারিত করতে চায় বস্তুত তিনিই তাদেরকে প্রতারিত করে থাকেন এবং তারা যখন সালাতে দাঁড়ায় শৈথিল্যের সাথে দাঁড়ায় কেবলমাত্র লোক দেখনোর জন্য এবং আল্লাহকে তারা অল্পই স্মরণ করে।"–সূরা আন নিসা ঃ ১৪২

এখানে ইবাদাতের ভালো ও মন্দ দুটি দিকের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। বস্তুতপক্ষে জীবনের প্রতিটি স্তরে ইসলাম মুসলমানদের কাছে যা প্রত্যাশা করে তার প্রতি ইংগিত করা হয়েছে এ আয়াত দুটিতে।

আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন

সাধারণ মানুষ এ রকম একটি ধারণা পোষণ করে যে, আল্লাহ তাদের ভালোবাসেন অথচ তারা নিজেরা আল্লাহকে ভালোবাসে না। তারা আশা করে যে, আল্লাহ তাদের কল্যাণ করবেন, অথচ তারা আল্লাহর আনুগত্য করে না। বস্তুতপক্ষে এটা একটা একতরফা ভাবনা। এ ব্যাপারে কুরআনের স্পষ্ট শিক্ষা হলো ঃ

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ ط - البقرة : ١٦٥

"যারা ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি তাদের ভালোবাসা দৃঢ়তম।"
–সূরা আল বাকারা ঃ ১৬৫

অপরদিকে সর্বোত্তম ব্যক্তির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের প্রতি ইংগিত করে বলা হয়েছে ঃ

الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَنْ يَّرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَسَوْفَ يَاْتِى اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُّحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهٗٓ ۙ

"তোমাদের মধ্যে কেউ দীন হতে ফিরে গেলে আল্লাহ এমন এক সম্প্রদায় আনবেন যাদের তিনি ভালোবাসেন ও যারা তাঁকে ভালোবাসবে।"–সূরা আল মায়েদা ঃ ৫৪

আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের সাথে পার্থিব সুযোগ-সুবিধা এবং আরাম-আয়েশের কোনো সংযোগ নেই। অবশ্য কখনো কখনো আল্লাহ তাআলা ব্যক্তি বিশেষের কৃতজ্ঞতার স্বরূপ পরীক্ষা করার জন্য তাকে বিষয় সম্পদ, আরাম আয়েশ দিয়ে থাকেন। কখনো আবার এ সমস্ত সুযোগ-সুবিধা থাকে তার নাগালের বাইরে। বঞ্চিত অবস্থায় ব্যক্তির আনুগত্য ও সবর পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যেই আল্লাহ এমনটি করে থাকেন। বস্তুতপক্ষে উভয় অবস্থায়ই আল্লাহর প্রতি মানুষের নিষ্ঠা এবং আনুগত্য প্রদর্শন করা উচিত। এজন্য প্রয়োজন দুটি জিনিসের, প্রথমত আল্লাহর ইচ্ছার কাছে নিঃশর্তভাবে আত্মসমর্পণ এবং অহংবোধের বিলোপ সাধন। দ্বিতীয়ত সার্বক্ষণিক এ রকম একটা অনুভূতির লালন করা যে, আল্লাহ সর্বত্র বিরাজ মান এবং তিনি তাঁকে অবলোকন করছেন খুবই স্পষ্টভাবে।

এখানে উল্লেখ্য যে, বান্দা যতই আল্লাহর নৈকট্য লাভ করুক না কেন স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে অবশ্যই পার্থক্য ও দূরত্ব থাকবে। সাধনা বলে বান্দা তার অহংবোধকে বিলুপ্ত করতে পারে কিন্তু তার অস্তিত্বকে সে কোনোক্রমেই বিলীন করতে পারে না। একজন মু'মিন যতই উচ্চতর স্তরে পৌঁছবে ততই মনে হবে যে আল্লাহ ঐ ব্যক্তির জবান দিয়ে কথা বলছেন, তার হাত দিয়ে কাজ করছেন। ব্যক্তির অন্তরে আল্লাহর ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটবে এতদসংক্রান্ত একটি বহুল প্রচলিত হাদীস রয়েছে।

বান্দা সবসময় স্রষ্টার সান্নিধ্য প্রাপ্তির নিয়ত নিয়ে চলে। কখনো সাধনা বলে পৌঁছে যায় উচ্চতর স্তরে। কিন্তু বান্দা ও আল্লাহর মধ্যে কখনো মিলন ঘটে না। অথবা আল্লাহকে বান্দা বা বান্দাকে আল্লাহ বলে ভ্রম হয় না।

মুসলমানগণ আল্লাহর নৈকট্য প্রাপ্তির মত আধ্যাত্মিক সফরকে মি'রাজ বলে আখ্যায়িত করে থাকেন। মি'রাজের অর্থ সিঁড়ি বা আরোহণ। আরোহণ এবং এর প্রাপ্তি নির্ভর করে ব্যক্তির সাধনা ও সফলতার ওপর।

আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের ব্যাপারে মানুষের সর্বোচ্চ কল্পনারও একটা সীমা আছে। রাসূলে করীম (স) যতখানি আল্লাহর সান্নিধ্য অর্জন করেছিলেন, মানুষ ঠিক ততটুকু কল্পনা করতে পারে। এর বাইরে নয়। বলে রাখা আবশ্যক যে, রাসূলে করীম (স) আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের ক্ষেত্রে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন তাঁর নামকরণ করা হয়েছে মি'রাজ হিসেবে। মি'রাজের সময় রাসূলে করীম (স) জাগ্রত এবং সচেতন অবস্থায় জান্নাতে পৌঁছেন এবং দেখেন (রুয়া)। এটা ছিলো তার জন্য বিশেষ রহমত ও সম্মান। মি'রাজ স্থানিক এবং সময়ের পরিসীমার বাইরে অনুষ্ঠিত হয়। এমতাবস্থায়ও আল্লাহ এবং রাসূল (স)-এর মধ্যে দূরত্ব ও ব্যবধান থাকে। এ বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করে কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ

فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ۝ - النجم : ٩

"তাদের মধ্যে দুই ধনুকের ব্যবধান থাকলো, অথবা তার চেয়ে কম।"—সূরা আন নাজম ঃ ৯

বস্তুতপক্ষে এ বর্ণনার মধ্য দিয়ে উভয়ের মধ্যকার নৈকট্য এবং তারতম্যের বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। রাসূলে করীম (স)-এর বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, সাধারণ মুসলমানদেরও মি'রাজ রয়েছে এবং তা হলো সালাত। আর এটা নির্ভর করে তার যোগ্যতা ও সাধনার ওপর।

আধ্যাত্মিক সাধনার কতকগুলো স্তর রয়েছে। একজন সাধক একটি স্তর অতিক্রম করে পরবর্তী স্তরে গিয়ে পৌঁছে। রাসূলে করীম (স)-এর জীবনী থেকেও আমরা দেখতে পাই যে, তিনি শুরু করেন হেরা পর্বতের নির্জনতা থেকে প্রত্যাবর্তনের মধ্য দিয়ে। এরপর ওহী লাভের প্রত্যাশায় চরম সংযমের পরিচয় দেন। কেবলমাত্র হিজরতের পরই তিনি শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে যুলুম নির্যাতনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। এ সময় সর্বক্ষণের জন্য ওহী নাযিল হতে থাকে।

এমনটা হওয়া সম্ভব যে, একজন লোককে পোশাক-পরিচ্ছদে দরবেশ বলে মনে হলেও আসলে তার অবস্থা হলো ভেড়ার পালের মতো ছদ্মবেশী সিংহের মতো। আবার এমনও হতো পারে যে, একজন রাজা তার পুঞ্জীভূত

সম্পদ থাকা সত্ত্বেও তিনি এগুলো থেকে কোনো সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করেন না। কিন্তু দায়-দায়িত্ব পালন করে তিনি অদ্ভূত রকমের আত্মসংযমের পরিচয় দেন। সকল প্রকার বিলাস-বৈভব ও আরাম-আয়েশ পরিত্যাগ করে তিনি সহজ-সরল জীবন যাপন করেন। তিনিই আসল দরবেশ।

অহংকার থেকে উত্তরণের জন্য প্রয়োজন বিনয় ও নম্রতা। সাধনা বলে এটাকে অর্জন করতে হয়। অপরদিকে গর্ব বা অহংকারকে বিবেচনা করা হয় আল্লাহর সাথে গাদ্দারী হিসেবে এবং এটা মস্তবড় পাপ। ইমাম গাযালী (র)-এর ভাষায় জাঁকজমক ও বাহ্যাড়ম্বর হলো নিজের অহংবোধের দাসত্বের নামান্তর এবং সে কারণে এটাকে বলা যায় এক ধরনের বহুদেববাদ।

মানুষের মেজাজ ও প্রকৃতির মধ্যে পার্থক্য থাকার কারণেই আধ্যাত্মিক সাধনার পন্থা প্রক্রিয়ার মধ্যেও বিভিন্নতা রয়েছে। আধ্যাত্মিক সাধনার জন্য অনেকে পীর-মুর্শিদের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তাদের ধারণা মতে আধ্যাত্মিক সাধনার বিষয়টি চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়নের মতো। ব্যক্তিগত উদ্যোগে কেউ চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করলেও শিক্ষানবিশ হিসেবে একজন দক্ষ ও অভিজ্ঞ চিকিৎসকের অধীনে কিছুকাল অধ্যয়ন না করলে যেমন তাকে চিকিৎসা ব্যবস্থাপত্র দেয়ার সুযোগ দেয়া হয় না। আধ্যাত্মিক ব্যাপারটিও তদ্রূপ। কারণ নিজের দোষ-ত্রুটিগুলো নিজে দেখার এবং তাৎক্ষণিকভাবে তা সংশোধন করে নেয়া সম্ভব হয় না। সে কারণেই আমাদের দোষ-ত্রুটিগুলো ধরিয়ে দেয়ার জন্য প্রথমেই প্রয়োজন একজন পীর-মুর্শিদের। এ সমস্ত দোষ-ত্রুটিগুলো থেকে উত্তরণের পথও তিনি দেখিয়ে দেন।

বস্তুতপক্ষে প্রতিনিয়ত ব্যক্তির বিকাশ ঘটেছে এবং বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে সে গ্রহণ করছে একটি স্থায়ী পথ পরিক্রমা। এ বিবর্তন প্রক্রিয়ায় পীর-মুর্শিদ অপ্রয়োজনীয় কতকগুলো প্রচেষ্টাকে পরিহার করতে সাহায্য করেন। কেউ যদি অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিতে না চায় এবং প্রত্যেক নবজাতকই যদি সমস্ত কার্যক্রমগুলো গ্রহণ করতে চায়, নির্ভর করতে চায় সম্পূর্ণরূপে নিজের ওপর তাহলে সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশ ঘটতে পারে না। কারণ সভ্যতা ও সংস্কৃতি হলো আমাদের পূর্ব পুরুষগণের জ্ঞান কর্মের ফসল।

শিক্ষকের বিচার-বিবেচনার প্রতি একজন ছাত্রের অগাধ শ্রদ্ধা ও আস্থা থাকে। কিন্তু তার সহকর্মী ও সমপর্যায়ের লোকদের ওপর তা থাকে না।

যে কোনো বিষয় তাত্ত্বিক জ্ঞান লাভের পর প্রায়োগিক বিষয়ে জানার জন্য ছাত্রকে কিছুকাল শিক্ষানবীশ হিসেবে থাকতে হয়। জড় বিজ্ঞানের জন্য এ কথাটি যেমন সত্য তেমনি সত্য আধ্যাত্মিক সাধনার ক্ষেত্রে। ধরার বুকে এমন অনেক বিষয় আছে যা কেবলমাত্র অধ্যয়ন বা শ্রবণ করে শেখা যায় না। এজন্য প্রয়োজন একজন অভিজ্ঞ শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে থেকে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ। এ ধরনের প্রশিক্ষণ অবধারিত বলে বিবেচিত না হলেও অবশ্যই জরুরী এবং সবসময়ের জন্য একথা সত্য। উপরন্তু কেবলমাত্র জ্ঞান অর্জন করাটাই পর্যাপ্ত নয়। এটাকে আত্মস্থ করতে হয়, নিয়ে আসতে হয় নিজের উপলব্ধিতে। তাহলেই এটা পরিণত হয় মানুষের স্বভাবে। সূফীয়ায়ে কেরাম আচার-আচরণের চারটি মৌলিক নীতির ওপর গুরুত্ব আরোপ করে থাকেন। এর মধ্যে রয়েছে স্বল্প নিদ্রা, অল্প আহার, কম কথা এবং মানুষের সাথে কম মেলামেশা। এখানে সল্প বা কম বলতে উপরোক্ত বিষয়গুলোকে সম্পূর্ণরূপে পরিহার করা বুঝায়নি। কারণ এগুলো সম্পূর্ণরূপে পরিহার করাটা কেবলমাত্র অনাকাঙ্ক্ষিতই নয়। ক্ষেত্র বিশেষে মানুষের সাধ্যেরও বাইরে। উদাহরণ হিসেবে আহার ও নিদ্রার কথা বলা যেতে পারে। আসলে আহার, নিদ্রা, কথাবার্তা ও মেলা-মেশায় সবসময় মধ্যপন্থা অবলম্বন করতে হবে। স্মরণ রাখতে হবে যে, মানুষকে খেতে হবে বাঁচার জন্য কিন্তু খাওয়ার জন্য বেঁচে থাকবে না। আল্লাহর ইচ্ছা ও নির্দেশকে প্রতিপালনের জন্য প্রয়োজন শক্তির। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সে যদি খাবার গ্রহণ করে তখন সেটা বিবেচিত হবে ইবাদাত হিসেবে। অপরদিকে খাদ্য পরিহার করার কারণে যদি দুর্বল হয়ে পড়ে ও অপুষ্টিতে ভোগে এবং সে কারণে তার আধ্যাত্মিক সাধনার ক্ষমতা হ্রাস পায় তাহলে সেটা দোষের হবে। সুন্দর স্বাস্থ্যের জন্য প্রয়োজন নিদ্রার এবং সে কারণেই ঘুমকে মানুষের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু অলসতা করলে অবস্থা দাঁড়াবে ঠিক এর উল্টো। আলস্যে মানুষ যেনতেনভাবে শুয়ে বসে সময় কাটায়। এটা আধ্যাত্মিক সাধনাকে বাঁধাগ্রস্ত করে। স্বল্প নিদ্রার অর্থ এই নয় যে, ঘুমকে পরিহার করে জাগতিক কাজকর্মের মধ্যে ডুবে থাকবে। বরং নিদ্রার পরিমাণ হ্রাস পেলে আল্লাহর ইবাদাত বন্দেগী এবং সৎকাজ করার জন্য বেশী সময় পাবে।

কথা কম বলার অর্থ হলো অপ্রয়োজনীয় এবং নিরর্থক আলাপচারিতা থেকে বিরত থাকা। সম্ভব হলে সকল প্রকার খারাপ কথাবার্তা পরিহার করা। প্রায়ই দেখা যায় যে, আমরা অপরকে খুব ভাল ভাল পরামর্শ দেই, অথচ আমরাই আবার এগুলো প্রতিপালনের কথা ভুলে যাই। বস্তুতপক্ষে এটা আমাদের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে।

মানুষের সাথে কম মেলামেশার অর্থ হলো অনাবশ্যক যোগাযোগ বা অহেতুক হাসি-তামাশা থেকে বিরত থাকা। যে মেলামেশার মাধ্যমে অপরের উপকার করা যায়, ব্যস্ত থাকা যায়, এমন কোনো কাজের মধ্যে যার দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা সম্ভব তেমনি মেলামেশাই মানুষের জন্য কাঙ্খিত। অবশ্য আমাদের একথা ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, ব্যক্তির বিকাশের স্তর অনুসারে তার চাহিদার সাথে অন্যের চাহিদার তারমত্য ঘটে। যে কারণেই একজন অভিজ্ঞ শিক্ষকের জন্য যে উপদেশ প্রযোজ্য একজন শিক্ষানবিশের বেলায় তা খাটে না। স্মরণ রাখতে হবে যে, জাগতিক মেলামেশা অনেক সময় আমাদের মধ্যে প্রলোভনের উদ্রেক করে, মূল্যবান সময়ের অপচয় ঘটায়, আমাদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলোকে ঠেলে দেয় বিস্মৃতির অন্তরালে।

ওপরে উল্লেখিত চার ধরনের আচরণবিধির সাথে আরেকটি বিষয় সংযোগ করা যেতে পারে । সেটি হলো স্বল্প ব্যয়। এর অর্থ হলো কোনো জৌলুশ বা তুচ্ছ কারণে অথবা আত্মতৃপ্তির জন্য অর্থ ব্যয় থেকে বিরত থাকা। তা এমন কোনো কাজে ব্যয় করা উচিত যা সকলের জন্য পসন্দনীয় এবং কল্যাণকর।

উল্লেখিত এ পাঁচটি আচরণবিধিকে গ্রহণ করা যেতে পারে ইসলামের আধ্যাত্মিক এবং জাগতিক জীবনের ৫টি মৌল নীতি হিসেবে।

নফল ইবাদাত

প্রতিটি মুসলমানকে সর্বক্ষণের জন্য আল্লাহকে স্মরণ করতে হবে। এ স্মরণ হতে হবে অন্তর থেকে। কিন্তু দীর্ঘ সময় একাগ্রচিত্তে আল্লাহকে স্মরণ করার কাজটা বেশ কঠিন। এজন্য আধ্যাত্মিক সচেতনাকে জোরদার করতে হবে। চিন্তাকে নিবদ্ধ করতে হবে আল্লাহর প্রতি। এ কাজ দুটি করার জন্য তাকে শারীরিক নিয়মনীতি অনুসরণ করতে হয়। কুরআন মজীদে উল্লেখ আছে ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا ۝ وَّسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا ۝

"হে মু'মিনগণ! তোমরা অধিক পরিমাণে আল্লাহর যিকির কর এবং সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।"

—সূরা আল আহযাব ঃ ৪১-৪২

অন্যত্র এরশাদ হয়েছে ঃ

الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلاً ۚ سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝

"যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আকাশজগত ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করে এবং বলে, হে আমাদের রব! তুমি এগুলো অনর্থক সৃষ্টি করোনি, তুমি পবিত্র।"-সূরা আলে ইমরান ঃ ১৯১

এমন কিছু ইবাদাত পদ্ধতি রয়েছে যেখানে কতকগুলো সবক বার বার পুনরাবৃত্তি করতে হয়। আবার এমন কিছু ইবাদাত বন্দেগী আছে যেগুলো একজন মানুষ অভ্যাসগতভাবেই নিয়মিত আদায় করে থাকে। কখনো এগুলো সে আদায় করে উচ্চস্বরে, কখনো আবার নিম্নস্বরে। তবে ইবাদাত-বন্দেগীর ধরন যাই হোক না কেন, এগুলো অবশ্যই এক আল্লাহ জাল্লাশানুহুর পবিত্র গুণরাজির স্মরণে হতে হবে। কখনো এর ব্যতিক্রম হতে পারবে না। অথবা কখনো তা কোনো সৃষ্টির প্রতি নিবেদন করা যাবে না। এমনকি ভক্তি ও শ্রদ্ধার কারণে হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর কথা আমাদের স্মরণে আসলেও মহান আল্লাহ সম্পর্কে চিন্তা থাকা মুখ্য। আমাদের যা কিছু চাওয়ার তা একমাত্র আল্লাহর নিকট চাইতে হবে। রাসূলুল্লাহ (স)-এর উসীলা করে আল্লাহর নিকট মুনাজাত করা যেতে পারে। সে কারণেই আমরা এভাবে মুনাজাত করে থাকি যে, "হে আল্লাহ! তুমি রাসূলে করীম (স)-এর প্রতি সদয় হও এবং তাঁকে হিফাযত কর।" অথবা "হে আল্লাহ! মুহাম্মাদ (স)-কে দান করো সর্বোচ্চ সম্মানিত স্থান ও সুমহান মর্যাদা যার প্রতিশ্রুতি তুমি তাঁকে দিয়েছ এবং আমাদের পক্ষে তাঁর উসীলাকে তুমি কবুল কর।"

চিন্তায় স্থিরতা আনার জন্য সূফীয়ায়ে কেরাম বিশেষ পন্থা অবলম্বন করে থাকেন। যেমন তাঁরা কখনো নির্জনে নিভৃতে চলে যান। কখনো আবার চোখ বুজে ক্ষণিকের জন্য শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ রাখেন এবং আল্লাহর যিক্‌র-এ মগ্ন থেকে হৃদয়ের স্পন্দনের প্রতি দৃঢ়ভাবে মনোনিবেশ করেন। তাঁরা আরো বলে থাকেন যে, আল্লাহকে স্মরণ করার তিনটি স্তর রয়েছে (ক) কেবলমাত্র তাঁর নামের যিক্‌র করা। (খ) বিভিন্ন নাম বা সিফাতের মাধ্যমে তাঁর অস্তিত্বের যিক্‌র করা। সর্বোপরি (গ) কোনো সিফাত বা নামের উল্লেখ না করে একান্তভাবে তাঁর অস্তিত্বকে স্মরণ করা। রাসূলে করীম (স) নিজেও ইবাদাত-বন্দেগীর এ সমস্ত ব্যবস্থাদির ব্যাপারে

অনুমোদন দিয়েছেন। এ প্রসংগে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, হযরত আবু হুরায়রা (রা)-এর সূতার তৈরী একটি তসবীহ্ ছিলো। এতে ছিলো ২০০০ গিট। প্রতিটি গিট ব্যবহৃত হতো এক একটি পুতি হিসেবে। প্রতিদিন রাতে তিনি একটি বিশেষ ভঙ্গিমায় বার বার এই তসবীহ্ পাঠ করতেন।

অন্যান্য আমলসমূহের মধ্যে কেউ হয়তো বলবেন কৃচ্ছ্রতা সাধনের কথা, নিজের কামনা-বাসনা দমনের কথা, অনুধ্যানের কথা বিশেষ করে মৃত্যু ও শেষ বিচারের কথা চিন্তা করার কথা। ইসলামে এগুলোই শেষ নয়, এগুলো হচ্ছে খুদীকে নিয়ন্ত্রণ রাখার উপায় মাত্র।

আত্মসংযম, মদ্যপান পরিহার করা এবং অন্যান্য ধর্মীয় আচরণসমূহ বিশেষ কতকগুলো কর্ম ক্ষমতার বিকাশকে ত্বরান্বিত করে থাকে। তবু একথা সত্য যে, এ ধরনের কর্মক্ষমতাগুলো যত বিস্ময়করই হোক না কেন এগুলো কখনো একজন মু'মিন মুসলমানের লক্ষ হতে পারে না। তিনি কেবলমাত্র আরাধ্য কাজগুলো সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার প্রতি মনোনিবেশ করেন এবং বিস্ময়কর ঘটনাগুলোর উদ্ভব ঘটে তার সযত্ন সাধনার উপজাত হিসেবে। এমনকি স্বীয় সাধনা বলে একজন নাস্তিকও সাধকের কতকগুলো কর্মদক্ষতা হয়তো অর্জন করতে পারে। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, পরকালেও সে নাজাত পাবে, সূফী লাগাতার তাঁর লক্ষস্থলের দিকে পরিচালিত হন। এই দীর্ঘ সফরে তিনি কি পেলেন, কতটুকু অর্জিত হলো তা ভেবে দেখেন না।

একজন সূফী বা দরবেশের আধ্যাত্মিক জীবন শুরু হয় অনুশোচনার (তাওবা) মধ্য দিয়ে। তিনি অনুশোচনা করে থাকেন অতীতের পাপকর্ম, অন্যান্যদের প্রতি তার ক্ষতিকর আচরণ বা অন্যায় অপকর্মের জন্য। স্মরণ রাখতে হবে যে, আল্লাহর প্রতি বান্দার যে দায়িত্ব তা পালন না করলেও আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করে দিতে পারেন। কিন্তু অন্যান্য সৃষ্টিজীবের অধিকার হরণ করলে আল্লাহ তা ক্ষমা করেন না। এ ক্ষেত্রে শুধুমাত্র সৃষ্টিজীবই পারে তাকে ক্ষমা করতে। বস্তুতপক্ষে এ ধরনের অনুশোচনার মধ্য দিয়ে একজন মানুষ এমন একটি পথ পরিক্রমা দিয়ে অগ্রসর হয় যা তাকে পৌঁছে দিতে পারে আল্লাহর সান্নিধ্যে। এখানে কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর কোনো রকম একচ্ছত্র আধিপত্য নেই। বরং যে কোনো মানুষের জন্যই জীবন সাধনার এ ধারাটি উন্মুক্ত এবং প্রতিটি মানুষের এ পথে অগ্রসর হওয়া কর্তব্য। এ ধরনের আধ্যাত্মিক সাধনার ক্ষেত্রে দ্বিবিধ ব্যবস্থা রয়েছে। একটি আল্লাহর প্রতি নিরঙ্কুশ আনুগত্য, দ্বিতীয়টি সর্বাবস্থায় আল্লাহর

যিক্‌র করা। একজন মানুষকে কি করতে হবে এবং আল্লাহ কোন্‌টা পসন্দ করেন তা সে ভালোভাবেই জানে এবং সে কারণেই আনুগত্য করাটা তুলনামূলকভাবে সহজ। অপরদিকে আল্লাহ তাআলা তাঁর ইরাদা এবং নির্দেশগুলোকে মানুষের কাছে তুলে ধরেছেন। তাঁর মনোনীত নবী-রাসূলগণই এগুলো পৌঁছে দিয়েছেন সাধারণ মানুষের কাছে।

দুনিয়ায় আল্লাহ তাআলা অসংখ্য নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন। তাঁদের শিক্ষার বিষয়বস্তুর মধ্যেও কিছু পার্থক্য রয়েছে। কিন্তু সেটা এ কারণে নয় যে, আল্লাহ তাঁর মত পালটে ফেলেছেন। বরং সেটা এজন্য যে, মানুষের অধপতন বা বিকাশের কারণে তাদের আচরণবিধি ও শিক্ষার বিষয়বস্তুর মধ্যে এ ধরনের পরিবর্তন জরুরী ছিলো। বস্তুতপক্ষে নবী-রাসূলগণের শিক্ষার বিষয়বস্তুর মধ্যে বিশেষভাবে যে শিক্ষাগুলো স্রষ্টার সাথে সৃষ্টিজীবের সম্পর্ক সংক্রান্ত সেগুলোর ব্যাপারে কোনো মতপার্থক্য নেই। তবু একথা সত্য যে, আল্লাহর তরফ থেকে সর্বশেষ যে বিধান নাযিল হয়েছে, মানুষকে তা মেনে চলতে হয়। এটাও আল্লাহর আদেশ-নিষেধের প্রতি সৃষ্টিজীবের আনুগত্য প্রকাশের একটি অংশ এবং কুরআন মজীদে এ ব্যাপারে যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে যে, হযরত ইবরাহীম (আ)-এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা মানুষকে যে বিষয় শিক্ষা দিলেন মূসা (আ)-এর আমলের লোকেরা সে শিক্ষাকে পরিত্যাগ করলো এবং মূসা (আ)-এর ওপর নাযিলকৃত শিক্ষাকে গ্রহণ করলো। তা সত্ত্বেও এটাকে কোনোক্রমেই আল্লাহর আইনের প্রতি অবাধ্যতা বলা যাবে না। কারণ একই বিধানদাতা আল্লাহ তা'আলার সর্বশেষ ইচ্ছাগুলো মূসা (আ)-এর নিকট অবতীর্ণ হয়েছে। তার চেয়ে বড় কথা মূসা (আ)-এর ওপর অবতীর্ণ হয়েছে যে নির্দেশাবলী তা অবহেলা করা এবং ইবরাহীম (আ)-এর শিক্ষার ওপর অবিচল থাকাটা হবে অমার্জনীয় অপরাধ ও অবাধ্যতা। সে কারণেই যুগ যুগ ধরে নবী বা রাসূলগণ আল্লাহর যে বাণী নিয়ে এসেছেন তা মেনে চলতে হবে পরিপূর্ণভাবে আর নবী-রাসূলগণের মধ্যে হযরত মুহাম্মাদ (স) হলেন সর্বশেষ নবী। একজন মুসলমান পূর্ববর্তী সকল নবী রাসূলগণের ওপর অটল বিশ্বাস রাখবে। কিন্তু সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর মাধ্যমে যে বাণী আল্লাহ তাআলা মানুষের নিকট পৌঁছে দিয়েছেন তা পরিহার করে অন্য কোনো কিছুই করতে পারে না। একজন মুসলমান তাওরাত যাবুর ও ইঞ্জিলকে আল্লাহর কালাম হিসেবে পরিপূর্ণ ঈমান রাখে। একই সময়ে সে আল্লাহর সর্বশেষ কালাম আল কুরআনকে

মেনে চলে আন্তরিক নিষ্ঠার সাথে। কেউ যদি আল কুরআনকে বাদ দিয়ে পূর্বের কোনো বিধি-বিধান অনুসরণ করে, তাহলে কখনো সে আল্লাহর অনুগত ও বাধ্য বলে বিবেচিত হতে পারে না।

উপসংহার

মানুষ আত্মা ও শরীরের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে । প্রথমটির অস্তিত্ব অভ্যন্তরীণ দ্বিতীয়টি বাহ্যিক। খাঁটি মুসলমান হওয়ার জন্য প্রয়োজন এ দুটি বিষয়ের সুষম অগ্রগতি এবং পরিপূর্ণ বিকাশ। সে কারণেই প্রতিটি মানুষকে শারীরিক ও আত্মিক উভয়বিধ বিষয়ের ওপর সমান গুরুত্ব আরোপ করতে হয়। ইসলামে আধ্যাত্মিক সাধনার মধ্যে রয়েছে দুটি দিক—একদিকে সে আত্মচিন্তাকে নিয়ে আসবে সর্বনিম্নস্তরে। অর্থাৎ সে অহংবোধকে সংযত করবে, অপরদিকে সে আল্লাহর সান্নিধ্য বা উপস্থিতির অনুভূতিকে অবিরত জোরদার করবে। আল্লাহর ইচ্ছা ও বিধানের কাছে আত্মসমর্পণ করার অর্থ এই নয় যে, সে স্থবিরতায় আক্রান্ত হবে। অথবা তার মধ্যে বিরাজ করবে পূর্ণ অচলাবস্থা। বরং সে থাকবে স্থবিরতা মুক্ত। কুরআনুল কারীমের অসংখ্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা মানুষকে কর্মে প্রবৃত্ত হওয়ার জন্য উপর্যুপরি তাকীদ দিয়েছেন। এমনকি আমালে সালেহ-এর মধ্য দিয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। নিজের চিন্তা-ভাবনা ইচ্ছা অনিচ্ছাগুলোকে পরিহার করে কেবলমাত্র আল্লাহর ইচ্ছার ওপর নিজেকে সঁপে (তাওয়াক্কুল) দিতে হবে। আল্লাহর ইচ্ছার ওপর সঁপে দেয়ার অর্থ কর্মবিমুখ হওয়া নয়।

আল্লাহ তাআলা যা ইচ্ছা করেন, মানুষের জীবনে তাই ঘটে। কিন্তু মানুষ কখনো তাকদীর বা আল্লাহর নির্ধারণের কথা জানতে পারে না। এটা থাকে তার জ্ঞানের বাইরে। একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছার প্রচেষ্টায় বার বার সে ব্যর্থতায় পর্যবশিত হয়। তাকে বিরামহীনভাবে চেষ্টা করতে হয়। কারণ সে ভালোভাবেই জানে যে, এতে দোষের কিছু নেই এবং এটা আল্লাহর বিধানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

বস্তুতপক্ষে তাকদীর একটি রহস্যময় ব্যাপার। এটা মানুষকে কর্মে প্রবৃত্ত করে। আবার একই সময়ে আল্লাহর ইচ্ছার ওপর নিজেকে সঁপে দিয়ে সকল উদ্যোগ থেকে নিবৃত্ত রাখে। তাকদীরের এ তাৎপর্যটি কুরআনুল কারীমে রয়েছে। এরশাদ হয়েছে ঃ

مَآ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِىْٓ اَنْفُسِكُمْ اِلَّا فِىْ كِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ نَّبْرَاَهَا ط اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ۝

"পৃথিবীতে বা ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের ওপর যে বিপর্যয় আসে তা সংঘটিত করার পূর্বেই তা লিপিবদ্ধ থাকে, আল্লাহর পক্ষে তা খুবই সহজ।"–সূরা আল হাদীদ ঃ ২২

মানুষকে সবসময় আল্লাহর কুদরত ও মর্যাদা সম্পর্কে ভাবতে হবে। তাকে ভাবতে হবে মানুষের বিনয়-নম্র স্বভাব সম্পর্কে। তাকে আরো জানতে হবে যে, পুনরুত্থান দিবসে আল্লাহ তাআলা মানুষের কাছে তার কৃতকর্মের হিসেব চাবেন। আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন ঃ

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ط وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ ۝

"যারা আমার উদ্দেশ্যে সংগ্রাম করে আমি তাদেরকে আমার পথে পরিচালিত করবো। আল্লাহ অবশ্যই মুহসিনদের সাথে থাকেন।"
–সূরা আল আনকাবূত ঃ ৬৯

❒

সপ্তম অধ্যায়

নৈতিকতা

মানবজাতিকে তিনটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে ঃ

ক. প্রথমেই আসে এমন কিছু লোকের কথা যারা স্বভাবগতভাবেই ভালো। শত প্রলোভনের মুখেও তারা নীতি বিরোধী কাজ করে না। তাদের সহজাত প্রবৃত্তি তাদেরকে সবসময় ভালো ও কল্যাণের দিকেই পথনির্দেশ করে।

খ. এর পাশাপাশি এমন কিছু লোক পাওয়া যাবে যারা এর ঠিক উল্টো। তারা মূলত সংশোধনের অযোগ্য।

গ. তৃতীয় দলটির অবস্থান এর ঠিক মাঝামাঝি জায়গায়। কঠোর নিয়ন্ত্রণ এবং উপযুক্ত পরিচর্যা পেলে এরা আশানুরূপ আচার-আচরণ করে থাকে। এর অন্যথা হলেই এদের মধ্যে দেখা দেয় চরম খামখেয়ালীপনা। তখন তারা নানাবিধ অন্যায় করে ও অপকর্মে মেতে ওঠে।

প্রথম শ্রেণীর জনগোষ্ঠীকে মানবরূপী ফেরেশতা বলে আখ্যায়িত করা যায়। এদের জন্য কোনো রকম পথ-নির্দেশক বা নিয়ন্ত্রক দরকার হয় না। দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকেরা এর বিপরীত মেরুতে অবস্থান করে। এদেরকে বলা যেতে পারে মানবরূপী শয়তান। এদেরকে অন্যায় ও অপকর্ম থেকে বিরত রাখার জন্য কঠোর নিয়ন্ত্রণ এবং প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক। এ দুই শ্রেণীভুক্ত মানুষের সংখ্যা খুবই সামান্য। এদের মাঝা-মাঝিতে যারা অবস্থান করছে মানবজাতির মধ্যে তাদের সংখ্যাই সর্বাধিক।

মানবরূপী শয়তান শ্রেণীর লোকের সাথে কোনো কোনো ব্যাপারে পশু জাতির অদ্ভুত রকমের সাদৃশ্য দেখা যায়। যেমন স্বাভাবিক অবস্থায় তারা নিজেদের সম্পদ ও অবস্থান নিয়েই সন্তুষ্ট ও পরিতৃপ্ত থাকে। কিন্তু যখনই তারা অন্যের কাছে তুলনামূলকভাবে উন্নতমানের কোনো জিনিস দেখতে পায়, অথবা কারো মধ্যে কোনো রকম খারাপ মতলবের সন্ধান পায় তখনি তারা বেসামাল হয়ে পড়ে। এ জাতীয় প্রবৃত্তি মানুষকে নানাবিধ অন্যায় ও অপকর্মে প্রলুব্ধ করে। তখন সমাজের বুকে দেখা দেয় হাজার রকমের অশুভ তৎপরতা। বস্তুতপক্ষে যুগ যুগ ধরে মানব সমাজে এ ধারাটি অব্যাহত রয়েছে। আর সে কারণেই পিতা তার সন্তানের আচার আচরণকে

নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে। অনুরূপভাবে গোত্র, প্রতিষ্ঠান বা রাষ্ট্রের যিনি প্রধান তিনি নিয়ন্ত্রণ করেন তার অধীনস্থ লোকজনকে। এ নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য প্রধানত দুটি। প্রথমত যার যা আছে তাই নিয়ে তাকে পরিতৃপ্ত থাকতে অনুপ্রাণিত করা, দ্বিতীয়ত অন্যদের সৎ ও ন্যায়সংগতভাবে উপার্জিত সম্পদ যাতে কেউ তসরুফ না করে তা নিশ্চিত করা। সম্ভবত সে কারণেই মানব সমাজের মূল লক্ষ হলো অন্যায় ও অপকর্মের প্রতি মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতাকে নিয়ন্ত্রণ করা এবং ইতিমধ্যে যে অনিষ্ট সাধন করা হয়েছে তা সংশোধন বা শুধরানোর ব্যবস্থা করা।

স্মরণ রাখতে হবে যে, সমস্ত মানুষ এমনকি একই রাষ্ট্র বা গোষ্ঠীভুক্ত সবার মন-মানসিকতা এক রকম হয় না। এমনকি তাদের নৈতিকতার উন্নয়ন কখনো একই পর্যায়ের হয় না। যেমন সমাজের মধ্যে যাদের হৃদয়-মন উন্নত তারা স্বেচ্ছায় আত্মত্যাগ এবং জনহিতকর কাজ করে থাকে। অনুরূপভাবে যারা সচেতন ও বুদ্ধিদীপ্ত তারা পরিণামের কথা ভাবে। পরিণতির কথা চিন্তা করে তারা অন্যায় ও অপকর্ম করা থেকে বিরত থাকে। এমন কি এ জন্য তাদের ওপর কোনো নিয়ন্ত্রণ দরকার হয় না। বরং স্বেচ্ছায় এবং স্ব-উদ্যোগে তারা জনহিতকর কাজে লিপ্ত হয়। সমাজের সাধারণ মানুষের অবস্থা এর চেয়ে ভিন্নতর। তারা স্বেচ্ছায় এবং স্ব-উদ্যোগে জনহিতকর কাজে হাত দেয় না। অথবা কোনো রকম আত্মত্যাগ করতেও রাজী হয় না। বরং প্রয়োজনবোধে অপরের ক্ষয়ক্ষতির বিনিময়ে তারা নিজেকে নিয়ে ব্যাপৃত থাকে। যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের মনে এ ভীতি না আসে যে সেও ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি, সমাজ বা অন্যকোনো শক্তিশালী পক্ষ দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার আচরণের এ ধারা অব্যাহত থাকে। সমাজে আরেক শ্রেণীর লোক আছে যারা খুবই স্থূলবুদ্ধি সম্পন্ন। তাদের অবস্থা অন্যান্যদের চেয়ে একেবারে ভিন্নতর। কোনো রকম ভয়-ভীতি তাদেরকে অন্যায় ও অপকর্ম থেকে বিরত রাখতে পারে না। হাজারো বাধা বিপত্তির মুখে সর্বশক্তি দিয়ে সে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লক্ষে পৌঁছার জন্য চেষ্টা চালায়। যে পর্যন্ত তাকে এমন অবস্থায় ফেলা না হয় যে, সে আর খেয়াল খুশীমত কাজ করতে পারছে না, ততক্ষণ পর্যন্ত তার অসৎ প্রবণতা অব্যাহত থাকে। যেমন কারাদণ্ড বা মৃত্যুদণ্ড প্রদানের মাধ্যমে এ জাতীয় লোকদের নিষ্ক্রিয় করে দেয়ার মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি করা যায়।

সকল ধর্ম, নিয়ম-নীতি বা দর্শনের মূল লক্ষই হলো দুই মেরুর মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থানকারী বিশাল জনগোষ্ঠীকে প্রত্যাশিত আচার-

আচরণে অনুপ্রাণিত করা। এমন কি দুঃস্থ, দরিদ্র, অসহায় ও অভাবী লোকদের সাহায্যার্থে স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসতে উদ্বুদ্ধ করাটাও সকল ধর্ম ও দর্শনের একটি মৌলিক উদ্দেশ্য।

ইসলামের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বৈশিষ্ট্য

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। ইসলাম কেবলমাত্র ঈমান ও আকিদা সম্পর্কেই ধারণাই দেয় না, বরং সামাজিক আচার-আচরণের বিধি-বিধানসমূহ সন্নিবেশিত হয়েছে এর মধ্যে। তাছাড়া কত সুন্দর ও সার্থকভাবে আইনসমূহ বাস্তবায়ন করা যায়, এখানে তারও পথনির্দেশনা পাওয়া যাবে। মৃত্যুর সাথে সাথে যে জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে, যে জীবনের ব্যাপ্তি কেবলমাত্র পার্থিব জগতের মধ্যে সীমিত অথবা যেখানে দেহের সাথে আত্মার সংযোগ নেই, ইসলাম এমন কোনো জীবন ধারায় বিশ্বাস করে না।

বরং ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি এর ঠিক উল্টো। ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় ব্যক্তিকে আখেরাতে বিশ্বাস করতে হয়। এর উদ্দেশ্য হলো ভালো কাজকে উৎসাহিত এবং মন্দকে নিরুৎসাহিত করা। কুরআনুল কারীমে একথাটি এভাবে বিধৃত হয়েছে যে, "পৃথিবীতে যা সর্বোত্তম, আখেরাতেও তার জন্য থাকবে সর্বোত্তম প্রতিদান।" ইসলাম কেবল ভালকে প্রশংসা এবং মন্দকে নিন্দা করে না বরং পুরস্কার ও শাস্তিরও ব্যবস্থা করে। শাস্তি বা পুরস্কার বস্তুগত ও আত্মিক উভয়ভাবেই হতে পারে। মানুষ যাতে আল্লাহ্ তাআলার হুকুম তথা আদেশ-নিষেধগুলো যথাযথভাবে মেনে চলে, সেজন্য ইসলাম বার বার তাকে আল্লাহ্ভীতি, পুনরুত্থানের পর শেষ বিচার এবং জাহান্নামের ভয়ংকর শাস্তি সম্পর্কে স্মরণ করিয়ে দেয়। এর পাশাপাশি সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে ইসলাম বস্তুগত আরো কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করেছে। অন্যায় আচরণ বা অপরের অধিকারে হস্তক্ষেপ করা থেকে মানুষকে বিরত রাখাই এর উদ্দেশ্য। আর সে কারণেই একজন মু'মিন মুসলমান স্বেচ্ছায় সালাত আদায় করে, রমযান মাসে সিয়াম পালন করে, যাকাত প্রদান করে অথচ এজন্য কেউ তার ওপর জোর জবরদস্তি খাটায় না। এমন কি সরকার যাকাতের পরিমাণ নির্ধারণ করে দেয় না, অথবা শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে যাকাত আদায় করে না, অথচ তারা অতি নিষ্ঠার সাথে যাকাত আদায় করে।

নৈতিকতার ভিত্তি

কখনো কখনো বাহ্যিক দৃষ্টিতে কিছু কাজকে একই জাতীয় ও অভিন্ন বলে মনে হয়। কিন্তু কাজের উপলক্ষ বা পারিপার্শ্বিকতার বিবেচনায় কাজ গুলোর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। যেমন সন্ত্রাসী বা ডাকাতদের হাতে কেউ নিহত হতে পারে। একজন শিকারী ভুলক্রমে কাউকে হত্যা করতে পারে, আবার একজন নিহত হতে পারে একজন নির্বোধ বা শিশুর হাতে। এমনও হতে পারে যে, আত্মরক্ষা করতে গিয়ে একজন লোক অন্য একজনকে হত্যা করলো। অথবা বিচার সালিশী করে একজন গোত্রপতি অপারাধীকে মৃত্যুদণ্ড দিলো। এ সবগুলোই মূলত হত্যাকাণ্ড। কোনো কোনো হত্যাকাণ্ডের জন্য কঠোর শাস্তি প্রদান করা হয়। কখনো ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখা হয় আবার এটাকে দেখা হয় স্বাভাবিক কর্তব্য কর্ম হিসেবে। ক্ষেত্রবিশেষে হত্যাকারীকে শাস্তিও দেয়া হয় না। প্রশংসাও করা হয় না। আবার এমনও হতে পারে যে, এ হত্যাকাণ্ডই ব্যক্তির জন্য বয়ে আনে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ও বিরল সম্মান।

এসব কিছুই নির্ভর করে হত্যাকাণ্ডের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যের ওপর। বস্তুতপক্ষে এটা আপেক্ষিক ব্যাপার। সে কারণেই নবী করীম (স) স্পষ্ট ঘোষণা দিয়েছেন যে, "কাজের ফলাফল নিয়তের ওপর নির্ভর করে।"

ইসলামের বুনিয়াদে রয়েছে ওহীর ওপর গভীর বিশ্বাস। নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে এ প্রত্যাদেশ মানুষের নিকট পৌঁছেছে সে কারণেই ইসলামের আইন ও নৈতিকতা আসমানী হুকুম-আহকামের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। হতে পারে যে, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই মানুষ যুক্তিতর্কের মাধ্যমে যে সিদ্ধান্তে পৌঁছে তা আসমানী বিধি-নিষেধের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তবু একথা সত্য যে, দার্শনিক আইনবিশারদ বা নৈতিকতাবাদীদের যুক্তি-তর্ক অপেক্ষা আসমানী নির্দেশাবলীর গুরুত্ব ও তাৎপর্য অনেক বেশি। তাছাড়া এগুলোকে গ্রহণ করা হয় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হিসেবে। তা এ কারণেও যে বিভিন্ন যুক্তিতর্কগুলো সবসময় একই রকম হয় না। কখনো কখনো এগুলো সম্পূর্ণ পরস্পর বিরোধী হয়ে থাকে।

আল্লাহর আদেশ ও নিষেধের আলোকে মানুষের কার্যাবলীকে প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। একটি হলো ভালো, অপরটি মন্দ। আবার যে কাজগুলো থেকে বিরত থাকাটা মানুষের জন্য বাধ্যতামূলক সেগুলো মোটামুটি দু' ধরনের। প্রথমত এমন কিছু কাজ আছে যেগুলোর জন্য পার্থিব জগতের শাস্তি ছাড়াও শেষ বিচার দিবসের শাস্তি পেতে হয়।

দ্বিতীয়ত কিছু কাজ ইসলামের দৃষ্টিতে খুই নিন্দনীয়। এগুলোর জন্য ইহকালীন শাস্তির ব্যবস্থা না থাকলেও পরকালে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হয়।

কাযী ইয়াদ বর্ণিত নবী করীম (স)-এর একটি হাদীসের মধ্য দিয়ে ইসলামের দৃষ্টিতে মানব জীবনের স্বরূপ ফুটে উঠেছে। হাদীসটি এ রকমঃ

একদিন হযরত আলী (রা) প্রিয়নবী (স)-কে জিজ্ঞেস করেন ঃ আপনার সাধারণ আচার-আচরণ ব্যবহার কোন্ নীতিগুলো দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে ? প্রিয়নবী (স) বলেন, জ্ঞান আমার সম্পদ, যুক্তি আমার দীনের ভিত্তি, ভালোবাসা আমার বুনিয়াদ, ইচ্ছা আমার চালিকা শক্তি, আল্লাহর স্মরণ আমার নিত্য সহচর, বিশ্বাস আমার পুঁজি, উৎকণ্ঠা আমার সাথী, বিজ্ঞান আমার শক্তি, সবর আমার আবরণ, পরিতৃপ্তি আমার অমূল্য সম্পদ, সংযম আমার অহংকার, আরাম-আয়েশ পরিহার করাই আমার কাজ, বিশ্বাসের দৃঢ়তা আমার পাথেয়, আনুগত আমার পরিতৃপ্তি, জিহাদ আমার জীবনের বৈশিষ্ট্য, ইবাদাত আমার অন্তরের আলো।

আর একটি হাদীস থেকে জানা যায়, নবী করীম (স) বলেছেন, আল্লাহভীতি হলো জ্ঞানের সারকথা। আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদাত না করার মাধ্যমে, মানববতার জন্য যা কিছু অকল্যাণকর সেগুলোকে পরিহার করার মাধ্যমে ইসলামী নৈতিকতার সূত্রপাত ঘটে। আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর আরাধনার স্বরূপ বিভিন্ন রকম হতে পারে। যেমন—আত্ম বা অহংকারবোধের উপাসনা, প্রতিমা, কুসংস্কার বা কোনো হস্তশিল্পের আরাধনা ইত্যাদি। আবার মানবতার জন্য যেগুলো কলঙ্কময় সেগুলোও বিভিন্ন রকমের। যেমন নাস্তিকতা, অবিচার।

গোত্র, বর্ণ, ভাষা, বাসস্থানের ভিত্তিতে গড়ে উঠা বৈষম্যকে ইসলাম সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করেছে। তদস্থলে ইসলাম ঘোষণা দিয়েছে যে, ব্যক্তির শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপিত হবে এককভাবে তার নৈতিকতার নিরিখে এবং নৈতিকতা এমন একটি বিষয় যা সকলের জন্য উন্মুক্ত। এখানে পক্ষপাতিত্বের কোনো অবকাশ নেই। এ প্রসংগে কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَآئِلَ

لِتَعَارَفُوْا ط اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ○

"হে মানুষ! আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী হতে, পরে তোমাদের বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পারো। তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তি আল্লাহর নিকট অধিক মর্যাদা সম্পন্ন যে অধিক মুত্তাকী। আল্লাহ সব কিছু জানেন সমস্ত খবর রাখেন।"–সূরা আল হুজুরাত ঃ ১৩

মুসলিম উম্মাহর জন্য কুরআন মজীদে বিশেষে অনুশাসন প্রদান করা হয়েছে। এরশাদ হয়েছে ঃ

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلاَّ تَعْبُدُوْٓا اِلآَّ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ط اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَآ اَوْ كِلٰهُمَا فَلاَ تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيْمًا ○ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًا ○ رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا فِيْ نُفُوْسِكُمْ ط اِنْ تَكُوْنُوْا صٰلِحِيْنَ فَاِنَّهٗ كَانَ لِلْاَوَّابِيْنَ غَفُوْرًا ○ وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا ○ اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْٓا اِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِ ط وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِرَبِّهٖ كَفُوْرًا ○ وَاِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَآءَ رَحْمَةٍ مِّنْ رَّبِّكَ تَرْجُوْهَا فَقُلْ لَّهُمْ قَوْلاً مَّيْسُوْرًا ○ وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُوْلَةً اِلٰى عُنُقِكَ وَلاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوْمًا مَّحْسُوْرًا ○ ـ بنى اسرائيل : ٢٣ـ٢٩

"তোমার রব আদেশ দিয়েছেন তিনি ছাড়া কারো ইবাদাত না করতে, পিতামাতার প্রতি ইহ্সান করতে। তাদের একজন অথবা উভয়কেই তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হলে তাদেরকে উহ্ বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না তাদের সাথে সম্মানসূচক নম্রকথা বলবে। মমতাবশে তাদের প্রতি নম্রতার ডানা অবনমিত করবে এবং বলবে, হে আমার রব! তাদের প্রতি রহম করো যেভাবে শৈশবে তাঁরা আমাকে প্রতিপালন করেছেন। তোমাদের রব তোমাদের অন্তরে যা আছে তা ভালো জানেন, তোমরা সালেহীন হলে যারা সতত আল্লাহ অভিমুখী তাদের প্রতি আল্লাহ ক্ষমাশীল। আত্মীয়-স্বজনকে তার প্রাপ্য দেবে, দরিদ্র, মিসকীন ও মুসাফিরকেও প্রাপ্য দেবে। কিছুতেই অপব্যয় করো

না। যারা অপব্যয় করে তারা শয়তানের ভাই এবং শয়তান তার রব-এর প্রতি অতিশয় অকৃতজ্ঞ এবং যদি তাদের থেকে তোমার মুখ ফিরাতেই হয়। যখন তুমি তোমার রবের নিকট হতে রহমত লাভের প্রত্যাশায় থাক তখন ওদের সাথে নম্রভাবে কথা বলবে। তুমি তোমার হাত তোমার ঘাড়ে আবদ্ধ করে রেখো না এবং তা সম্পূর্ণ প্রসারিত করো না তাহলে নিন্দিত ও নিঃস্ব হবে।–সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ২৩-২৯

নবী করীম (স)-এর মি'রাজে আরোহণ কালে এ বাণীসমূহ অবতীর্ণ হয়। মূসা (আ)-এর ওপর যে সমস্ত নির্দেশাবলী অবতীর্ণ হয়েছিল এগুলো তার চেয়েও ব্যাপক ও পরিপূর্ণ।

কুরআন মজীদে উল্লেখিত সমস্ত আয়াতসমূহের বর্ণনা দিতে গেলে আলোচনা দীর্ঘায়িত হবে। মুসলমান সমাজের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যসমূহের প্রতি আলোকপাত করে কুরআন মজীদে আরো বলা হয়েছে ঃ

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ○ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ج

"মু'মিনগণ পরস্পর ভাই ভাই, সুতরাং তোমরা ভ্রাতৃগণের মধ্যে শান্তি স্থাপন কর, যাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হও। হে মু'মিনগণ কোনো পুরুষ যেনো অপর কোনো পুরুষকে উপহাস না করে কেননা যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে।"

–সূরা আল হুজুরাত ঃ ১০-১১

অপরাধ এবং অপরাধের জন্য প্রায়শ্চিত্তকরণ

উপরে বর্ণিত উপদেশগুলো এতটা বাস্তব ও বস্তুনিষ্ঠ যে, কেউ এগুলোকে অস্বীকার করতে পারে না। অথবা এগুলোর ব্যাপারে কোনো রকম দ্বিধাদ্বন্দ্ব থাকার কথা নয়। তবে একথা সত্য যে, মানুষের মধ্যে ভালো ও মন্দ দুটি উপাদানই পাশাপাশি বিরাজ করছে। স্বভাবজাত দুর্বলতার কারণে সে রেগে যায়, অসৎকর্মের দিকে প্ররোচিত হয়। কখনো আবার যারা দুর্বল যাদের আত্মরক্ষা করা কিংবা প্রতিশোধ নেয়ার মতো সামর্থ নেই, তাদের ক্ষতিসাধন করতে উদ্যোগী হয়। আবার পরবর্তীতে মহৎ অনুভূতিগুলো তার অনুতাপকে জাগিয়ে দেয়। তখন সে অনুতাপের

মাত্রা অনুসারে যে ক্ষতিটুকু করেছে তা সংশোধন বা ক্ষতিপূরণ করার চেষ্টা করে।

ইসলাম পাপাচারকে দুটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করেছে। প্রথমত কিছু পাপাচার হক্কুল্লাহ্ বা আল্লাহ্ তাআলার অধিকার-এর সাথে সম্পর্কিত। এর মধ্যে রয়েছে নাস্তিকতা, সালাতকে উপেক্ষা করা ইত্যাদি। দ্বিতীয় শ্রেণীর পাপাচারগুলো হক্কুল ইবাদ বা বান্দার অধিকার সংক্রান্ত।

কোনো ব্যক্তি অন্য কারো ওপর কোনো রকম যুলুম নির্যাতন করে থাকলে আল্লাহ্ সেজন্য তাকে ক্ষমা করেন না। বরং কেবলমাত্র মযলুম বা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিই তাকে ক্ষমা করতে পারে।

কেউ যখন অন্য কোনো ব্যক্তি, প্রাণী বা সৃষ্টি জীবের ক্ষতি করে, তখন সে মূলত দুটি অপরাধ করে থাকে। তার প্রথম অপরাধ ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা সৃষ্টি জীব সংক্রান্ত, দ্বিতীয় অপরাধটি স্রষ্টা আল্লাহ্ পাক সংশ্লিষ্ট। কারণ. আল্লাহ্ আচার-আচরণের যে বিধি-বিধান বাতলে দিয়েছেন তা ভঙ্গ করার অর্থ হলো আল্লাহর আদেশ অমান্য করা। সে কারণেই কোনো ব্যক্তি অন্য কোনো সৃষ্টি জীবের প্রতি কোনো রকম অন্যায় আচরণ করার পর সে ক্ষতিপূরণ দিয়ে অথবা অধিকার ফিরিয়ে দিয়েই ক্ষান্ত হয় না, বরং সে আল্লাহ্ তাআলার কাছেও ক্ষমা প্রার্থনা করে।

নবী করীম (স) মু'মিনদের সতর্ক করে বলেছেন যে, কিয়ামতের দিনে কিছুসংখ্যক লোককে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। কারণ, তারা রশি দিয়ে বিড়ালকে বেঁধে রেখেছিল, তারা বিড়ালকে খাদ্য পানীয় দেয়নি। আবার খাদ্য খাবার অন্বেষণের জন্য বিড়ালকে ছেড়েও দেয়নি। বিড়ালটি ক্ষুৎ পিপাসায় অসহায়ভাবে মারা গিয়েছিল।

আরেকটি হাদীস শরীফে এরূপ উল্লেখ আছে যে, যারা নিজেদের দায়িত্ব কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করা থেকে বিরত থাকবে, এমন কি পশুগুলোকে পর্যাপ্ত পরিমাণ খাবার দেবে না, তাদের সাধ্যের অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়ে দেবে, রোজ হাশরে তাদেরকে কঠিন শাস্তি দেয়া হবে। এমন কি নবী করীম (স) নিষ্প্রয়োজনে গাছের পাতা ছিড়তে পর্যন্ত নিষেধ করেছেন।

ইসলামের বিধান এই যে, আল্লাহ তাআলার সৃষ্টিরাজি থেকে মানব জাতিকে অবশ্যই উপকার গ্রহণ করতে হবে। তবে এটা হতে হবে

সমহারে এবং যুক্তিসঙ্গত উপায়ে। এ স্থলে সকল প্রকার অপচয় এবং ছলচাতুরীকে সযত্নে পরিহার করতে হবে।

কেউ যদি কারো কোনো ক্ষতি সাধন করে এবং পরবর্তিতে সে যদি এই ক্ষতিকে শুধরে নিতে চায়, তাহলে বিভিন্নভাবে সে তা করতে পারে। যেমন ক্ষেত্রবিশেষে শুধুমাত্র ক্ষমাপ্রার্থনা করেই এ ক্ষতিকে শুধরে নেয়া যায়। কখনো আবার যে অধিকার বা প্রাপ্য থেকে ব্যক্তিকে বঞ্চিত করা হয়েছে সে অধিকার বা প্রাপ্যকে ফিরিয়ে দিয়েও তা সম্ভব। কখনো কখনো এমন হয় যে, ব্যক্তির আসল পাওনাকে ফিরিয়ে দেয়া যায় না। তখন সেখানে নতুন কিছু প্রদানের মাধ্যমে এই ক্ষতিকে শুধরে নেয়া যায়।

অন্যের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করা এবং অন্যায় আচরণের জন্য কাউকে মাফ করে দেয়া একটি মহৎ গুণ। ইসলামে এ গুণটির প্রতি যথেষ্ট তাকীদ দেয়া হয়েছে। কুরআন মজীদে ঘোষণা দেয়া হয়েছে ঃ

وَسَارِعُوْٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ لا اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ ۝ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِى السَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ ط وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ۝ ـ ال عمران : ١٣٣ـ٣٤ـ

"তোমরা ধাবমান হও, স্বীয় রব-এর ক্ষমার দিকে এবং সেই জান্নাতের দিকে যার বিস্তৃতি আসমান ও যমীনের ন্যায়, যা প্রস্তুত করা হয়েছে মুত্তাকীদের জন্য। যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় ব্যয় করে এবং যারা ক্রোধ সংবরণকারী এবং মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল, আল্লাহ সৎকর্ম-পরায়ণদেরকে ভালোবাসেন।"—সূরা আলে ইমরান ঃ ১৩৩-১৩৪

ইসলাম ক্ষমাকে যেমনি উৎসাহিত করেছে, তেমনি প্রতিশোধ গ্রহণেরও অনুমোদন রয়েছে। এ প্রসঙ্গে কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ

وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ اِنَّ ذٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ۝ ـ الشورى : ٤٣

"অবশ্য যে ধৈর্যধারণ করে এবং ক্ষমা করে তা তো হবে দৃঢ় সংকল্পের কাজ।"—সূরা আশ শুরা ঃ ৪৩

আল্লাহ জাল্লাশানুহুর দয়া ও ক্ষমার সাথে কারো তুলনা হয় না। মহান গুণ ও সিফাত অনুসারে আল্লাহ জাল্লাশানুহুকে বিভিন্ন নামে ডাকা হয়। তিনি রহমান—পরম করুণাময়, তিনি তাওয়াব—পাপ মার্জনাকারী,

আফু—দোষ-ত্রুটি গোপনকারী, গাফফার—সবচেয়ে বেশি ক্ষমাশীল। আল্লাহ তাআলার হুকুম-আহকাম অমান্য করে কেউ কোনো পাপ করলে এবং পরে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হলে সে আল্লাহ তাআলাকে ক্ষমাশীল অবস্থায় দেখতে পাবে। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা তাকে সম্পূর্ণরূপে মাফ করে দেবেন। এ প্রসঙ্গে কুরআন মজীদে ঘোষণা দেয়া হয়েছে ঃ

إِنَّ اللّٰهَ لَايَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَادُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ ط وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلاً بَعِيْدًا ○ - النساء : ١١٦

"আল্লাহ তাঁর সাথে শরীক করার অপরাধ ক্ষমা করেন না, এছাড়া সবকিছু যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং কেউ আল্লাহর শরীক করলে সে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হয়।"—সূরা আন নিসা ঃ ১১৬

আল্লাহ তাঁর প্রিয় হাবীব (স)-কে নির্দেশ দেন ঃ

قُلْ يٰعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ لَاتَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ ط اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا ط اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ○ - الزمر : ٥٣

"বল (আমার একথা) হে আমার বান্দাগণ! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছ আল্লাহর অনুগ্রহ হতে নিরাশ হয়ো না, আল্লাহ সমুদয় পাপ ক্ষমা করে দেবেন। তিনি ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।"
—সূরা আয যুমার ঃ ৫৩

এমনকি কেউ যদি শিরক পরিত্যাগ করে আল্লাহ তাআলার দিকে প্রত্যাবর্তন করে এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে তাহলে তিনিও তাকে ক্ষমা করে দেবেন। মানুষের মধ্যে একটি সহজাত দুর্বলতা আছে প্রায়শই সে পাপকর্মে লিপ্ত হয়। কিন্তু আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হলে আল্লাহ তাআলার দয়া ও ক্ষমার দুয়ার সবসময় তার জন্য খোলা থাকবে এজন্য কোনো লিখিত আবেদন পত্র বা আনুষ্ঠানিকতার প্রয়োজন হয় না। আল্লাহর দয়া লাভের জন্য কারো মধ্যস্থতাও অনাবশ্যক। তবে শর্ত এই যে, তাকে আল্লাহ তাআলার দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে এবং আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর দরবারে নিবিষ্ট মনে মোনাজাত করতে হবে। কারণ তিনি ভালো-মন্দ, গোপন-প্রকাশ্য সবকিছু জানেন এবং কোনো কিছুই তাঁর কাছে গোপন থাকে না।

আল্লাহর রহমত সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে নবী করীম (স) বলেছেন, "একজন মাতা শিশুকে যতটুকু ভালোবাসে সৃষ্টিজীবের জন্য আল্লাহ্ তাআলার ভালোবাসা তার চেয়ে একশত গুণেরও বেশি। নবী করীম (স) আরো বলেছেন, আল্লাহ দয়াকে একশত ভাগে বিভক্ত করেছেন। তন্মধ্যে ৯৯ ভাগ রেখেছেন নিজে, বাকী একভাগ পেয়েছে পৃথিবীর সমস্ত সৃষ্টিরাজি। বিভিন্ন সৃষ্টিজীবের পরস্পরের মধ্যে যে দয়া-মমতা দেখা যায় তা এসেছে ঐ একশত ভাগের এক ভাগ থেকে।"

আল্লাহ্ তাআলা হাদীসে কুদসীতে বলেন, যে আমার দিকে এক কদম এগোয় আমি তার দিকে দশ কদম এগিয়ে যাই। যে দশ কদম এগোয়, আমি তার দিকে এগিয়ে যাই একশত কদম। আবার যে আমার দিকে হেঁটে আসে, আমি তার দিকে দৌড়ে যাই।

কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ

وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ ط اِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ ط ذٰلِكَ ذِكْرٰى لِلذّٰكِرِيْنَ ○ - هـود : ١١٤

"সালাত কায়েম করবে দিবসের দুই প্রান্তভাগে ও রজনীর প্রথমাংশে। সৎকর্ম অবশ্যই অসৎকর্ম মিটিয়ে দেয়। যারা উপদেশ গ্রহণ করে, এটা তাদের জন্য এক উপদেশ।"–সূরা হূদ ঃ ১১৪

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, ইসলামে দান-খয়রাত করাকে অতিমাত্রায় উৎসাহিত করা হয়েছে। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, দান-খয়রাতের কারণে সে স্বাভাবিক নিয়মেই পাপ থেকে ক্ষমা পেয়ে যাবে। কারণ পাপ ও পুণ্যের প্রত্যেকেরই নিজস্ব অস্তিত্ব রয়েছে। অবশ্য আল্লাহর ইচ্ছাই চূড়ান্ত। তিনি ইচ্ছা করলে যে কোনো পাপকেই ক্ষমা করতে পারেন।

বিশেষ নির্দেশাবলী

ভালো ও মন্দকে বুঝানোর জন্য কুরআন মজীদে প্রায়শই দুটি শব্দ ব্যবহৃত হয়। ভালো কাজের জন্য ব্যবহৃত হয় 'মারুফ' এবং মন্দ কাজের জন্য 'মুনকার'। নবী করীম (স)-এর একটি হাদীসে এরূপ উল্লেখ আছে যে, মন্দ কাজের ব্যাপারে সকলের মধ্যে কখনো ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। যদিও কিছু কিছু লোক মন্দ কাজে লিপ্ত হয়ে থাকে। কুরআন মজীদে মু'মিনদেরকে "সর্বোত্তম উম্মত" বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং সেটা এ কারণে যে—

تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ - ال عمران : ١١٠

"তারা ভালো কাজের জন্য আদেশ করে এবং মন্দ কাজের ব্যাপারে নিষেধ করে।"–সূরা আলে ইমরান ঃ ১১০

অন্য একটি আয়াতে আরো স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে ঃ

وَالْعَصْرِ ۝ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ ۝ اِلاَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۙ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۝ - العصر : ١-٣

"মহাকালের শপথ, মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত, কিন্তু তারা নয়, যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয় ও ধৈর্যের উপদেশ দেয়।"–সূরা আল আসর ঃ ১-৩

আবার বিশেষ কিছু মন্দ কাজের ব্যাপারে নির্দিষ্ট বিধি-বিধান আছে। যেমন পূর্বেই বলা হয়েছে যে, কিছু কিছু মন্দ কাজের জন্য সরাসরি এবং প্রকাশ্য শাস্তির বিধান রয়েছে। আবার এমন কিছু মন্দকাজ আছে, যেগুলোর জন্য পরকালের শাস্তির ব্যাপারে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। এ জাতীয় মন্দ কাজগুলো যদি ব্যাপক আকার ধারণ না করে তাহলে শাসক সম্প্রদায় এগুলো বড় একটা বিবেচনায় আনে না।

মানুষের অধিকারগুলোকে প্রধানত তিনভাগে বিভক্ত করা যায়। (১) জীব (২) সম্পদ ও (৩) মান-সম্মান সংক্রান্ত। বিদায় হজ্জের ভাষণে নবী করীম (স) মানুষের এ সমস্ত অধিকারের স্বপক্ষে স্পষ্ট ঘোষণা দিয়েছেন। ইসলামী দণ্ডবিধির মাধ্যমেও এ অধিকারগুলো নিশ্চিত করা হয়েছে এবং নিম্নোক্ত বিষয়গুলো অমার্জনীয় অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। যেমন ঃ (ক) ব্যক্তি সম্পর্কিত অপরাধের মধ্যে রয়েছে হত্যাকাণ্ড, মানহানি, অশালীন আচরণ, ব্যভিচার ইত্যাদি। (খ) বিষয় সম্পদ সম্পর্কিত অপরাধের মধ্যে রয়েছে চুরি-ডাকাতি, রাহাজানি, হাইজ্যাকিং ইত্যাদি। (গ) মান-মর্যাদা সম্পর্কিত অপরাধের মধ্যে রয়েছে মিথ্যা অপবাদ, পরনিন্দা, মদ্যপান ইত্যাদি—এ সবগুলোই শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

যে অপরাধ ব্যক্তির জীবনের সাথে সম্পর্কিত তার শাস্তিনীতি হলো কিসাস বা প্রতিশোধ গ্রহণ। অর্থাৎ এখানে জীবনের বদলে জীবন, রক্তের বদলে রক্ত, চোখের বদলে চোখ, দাঁতের বদলে দাঁত। তবে কিসাস বা প্রতিশোধ গ্রহণের পূর্বেই বিচার করে দেখতে হবে যে, কেন সে এ ধরনের

অন্যায় অপরাধে লিপ্ত হলো ? তার মূল উদ্দেশ্য কি ছিলো ? সে কি স্বেচ্ছায় এ ধরনের কাজে প্রবৃত্ত হয়েছে ? নাকি এটি একটি দুর্ঘটনা। তাছাড়া শাস্তি বিধানের ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি অথবা তার উত্তরাধিকারীরা ইচ্ছা করলে আর্থিক ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করতে পারে। আবার ইচ্ছা করলে সে অপরাধীদের বেকসুর ক্ষমা করে দিতে পারে। যদি বিচার-বিশ্লেষণ ও তদন্ত থেকে এটা প্রতীয়মান হয় যে, অপরাধটা ইচ্ছাকৃত তখন সরকারের এ অপরাধ ক্ষমা করে দেয়ার কোনো অধিকার থাকে না। তখন ক্ষমা করে দেয়ার বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে।

ব্যভিচারের বিষয়টি সম্পূর্ণ আলাদা। এখানে নারী ও পুরুষ উভয়ের সম্মতিতেও যদি ব্যভিচার সংঘটিত হয় তবুও এ অপরাধের জঘন্যতাকে হালকাভাবে দেখা যায় না।

বস্তুতপক্ষে নবী করীম (স) সাহাবায়ে কেরামের নৈতিকতাকে এমন এক স্তরে সমুন্নত করতে সমর্থ হয়েছিলেন যে, তারা আখেরাতের শাস্তি অপেক্ষা দুনিয়ার বুকেই কঠোরতম শাস্তি পেতে অধিক আগ্রহী ছিলেন। তারা স্বেচ্ছায় নবী করীম (স)-এর নিকট ধরা দিতেন, অকপটে অপরাধগুলো স্বীকার করতেন এবং কঠোরতম শাস্তিকেও হাসিমুখে গ্রহণ করে নেয়ার জন্য তৈরি থাকতেন। আর এটা জানা কথা যে, নারী ও পুরুষের সম্মতির ভিত্তিতে যদি ব্যভিচারের মত অন্যায় অপকর্ম সংঘটিত হয়ে থাকে এবং যদি স্বেচ্ছায় অপরাধকে স্বীকার না করে তাহলে এ জাতীয় অপরাধকে প্রমাণ করা খুবই দুষ্কর।

এ জাতীয় অপরাধ প্রবণতাকে হ্রাস করার জন্য ইসলাম কিছু সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। যেমন ছেলেমেয়েদের মধ্যে অবাধ মেলামেশা এবং নিকটাত্মীয় ছাড়া অন্যান্যদের মধ্যে দেখা সাক্ষাতের উপর বিধি-নিষেধ আরোপ করেছে। মহিলারা যখন বাইরে যাবে অথবা অপরিচিত জনদের সাথে সাক্ষাত করবে, তখন বোরখা ব্যবহারের জন্য তাকীদ দেয়া হয়েছে। পুরুষদের লোলুপ দৃষ্টি থেকে নিজেদের মুক্ত রাখার এবং নিজেদের সৌন্দর্যকে আড়াল করে রাখা মহিলাদের একটি পবিত্র দায়িত্ব। বোরখা এক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে।

মহিলাদের বোরখা ব্যবহারের আরো কিছু সুবিধা আছে। যেমন যেসব মহিলা রোদের মধ্যে বাইরে যায় না বা বেশি ঘোরাফেরা করে না তাদের সাথে অফিসে ময়দানে কর্মরত মহিলাদের বিরাট পার্থক্যকে তুলনা করা হয়েছে একটি পাখির ভিতর ও বাইরের পলকের সাথে। বস্তুতপক্ষে

বোরখা বা আবরণ ত্বকের সজীবতা ও কমনীয়তাকে দীর্ঘ সময় ধরে রাখতে সাহায্য করে। খুব বেশি একটা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে না গিয়ে আমাদের শরীরের কিছু অংশ ঢেকে রাখি। একটু খেয়াল করলেই দেখতে পাব যে, আবৃত করে রাখা অংশের সাথে উন্মুক্ত অংশের ত্বকের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে।

বলে রাখা আবশ্যক যে, বোরখা ব্যবহারের অর্থ নির্জনতা বা বিচ্ছিন্নতা নয় বরং অপরিচিতজনদের লোলুপ দৃষ্টিকে সংযত রাখাই এর উদ্দেশ্য।

এটা খুবই দুঃখজনক যে, সমাজে কিছু লোক আছে যারা অভিমত পোষণ করে যে, বোরখা দ্বারা মুখাবয়ব আবৃত করে রাখার কারণে যক্ষ্মা রোগ হয়। অথচ সাম্প্রতিক কালের গবেষণার ফলাফল থেকে জানা যায় যে, আফ্রিকার যে সমস্ত কৃষাঙ্গ মহিলা কোনো দিন বোরখা ব্যবহার করেনি তারাও যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। এমনকি ইতালী, ফিনল্যাণ্ড ও পাশ্চত্যের উন্নত দেশের মহিলারাও এ রোগ থেকে মুক্ত নয়।

পরিশেষে বলে রাখা আবশ্যক যে, পর্দা করা বা বোরখা ব্যবহার করা কুরআন মজীদের একটি অনুশাসন বা নির্দেশ। কিন্তু এ আদেশ অবহেলা করার কারণে কুরআন মজীদে কোনো আইনগত শাস্তির উল্লেখ নেই।

চুরি-ডাকাতি, রাহাজানি, সন্ত্রাস বা বিষয়-সম্পদ তসরুফ করার জন্যও বিধি-বিধান রয়েছে। কিন্তু এখানে সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না।

ইসলামের একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য এই যে, মহিলাদের চরিত্র সম্পর্কে কলঙ্ক রটানোর জন্য কঠোর শাস্তি দেয়া হয়। প্রতিবেশি বা মহিলাদের সম্পর্কে কেউ যাতে কোনো কল্পকাহিনী তৈরি না করে অথবা বন্ধু-বান্ধবদের আসরে বসে কারো বিরুদ্ধে কোনো রকম যথেচ্ছা অপবাদ না দেয়, সে জন্য ইসলামে এ ব্যবস্থা রয়েছে। আর এ বিধান রাখা হয়েছে সুস্থ সমাজ গড়ে তোলার স্বার্থে। কেউ যদি কোনো মহিলাকে দোষী সাব্যস্ত করতে চায় তাহলে অবশ্যই তাকে আইনগত প্রমাণ উপস্থাপন করতে হবে, নতুবা তাকে মিথ্যা অপবাদের জন্য কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হবে।

মদ্যপান বন্ধ করাটাও ইসলামের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তবে রাতারাতি এটা বন্ধ করা হয়নি। বরং এটি কার্যকর করা হয়েছে পর্যায়ক্রমে। যেমন কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ط قُلْ فِيْهِمَآ اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ز

"(হে রাসূল)! লোকে আপনাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বলুন, উভয়ের মধ্যে মহাপাপ।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২১৯

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكٰرٰى - النساء : ٤٣

"হে মু'মিগণ! নেশাগ্রস্ত অবস্থায় সালাতের নিকটবর্তী হয়ো না।"–সূরা আন নিসা ঃ ৪৩

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْآ اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ - المائدة : ٩٠

"হে মু'মিনগণ! মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণায়ক শর ঘৃণ্যবস্তু ও শয়তানের কাজ।"–সূরা আল মায়েদা ঃ ৯০

লক্ষণীয় বিষয় এই যে, শেষ আয়াতটিতে মদ্যপান ও পুতুল পূজাকে এক পর্যায়ভুক্ত বলে ঘোষণা দেয়া হয়েছে। নবী করীম (স)-এর যামানায় এ আদেশ লংঘন করার জন্য ৪০টি বেত্রাঘাত করা হতো। খলীফা উমর (রা) এ শাস্তির পরিমাণকে দ্বিগুণ করে দেন। তিনি যুক্তি দেন যে, মদপান মাতলামির দিকে নিয়ে যায়। তখন সে অশালীন আচরণে লিপ্ত হয়, মহিলাদের সম্পর্কে হাজারো রকমের অপবাদ দিতে শুরু করে। এ জাতীয় অপরাধের জন্য কুরআন মজীদের নির্দেশ অনুসারেও ৮০টি বেত্রাঘাত প্রাপ্য। পরিশেষে বলা আবশ্যক যে, মদ্যপান করাটা যেমন স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর তেমনি এটা নৈতিকতা বিরোধী। মদ্যপান পরিহার করলে বিপুল অর্থের অপচয় বন্ধ হবে, পরিবারে ও সমাজে ফিরে আসবে শান্তি ও পরিতৃপ্তি।

নৈতিকতা বিরোধী এমন কিছু কাজ আছে যেগুলোর জন্য শাস্তির পরিমাণ বা ধরন নির্ধারিণ করা হয়নি। এসব ক্ষেত্রে বিচারক নিজের বিচার বিশ্লেষণ অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকেন। এ জাতীয় কাজের মধ্যে রয়েছে লটারী, জুয়া প্রভৃতি।

জুয়া লটারীর দুর্যোগ যে কত ভয়াবহ, কত সংসার যে এই অবৈধ প্রাপ্তির তাড়নায় ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে তা কে না জানে? তাছাড়া জাতীয় পর্যায়ের লটারীগুলো দেশের সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টন ব্যবস্থাকে বিঘ্নিত করছে।

দেশের অর্থনীতিতে সৃষ্টি হচ্ছে কতগুলো দুষ্ট ক্ষত। তাছাড়া এ জাতীয় কাজগুলো রাজনীতির উপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে।

নবী করীম (স) দুর্নীতিকে কঠোর ভাষায় নিন্দা করেছেন। সমাজ তথা শাসনব্যবস্থাকে দুর্নীতিমুক্ত রাখার ব্যাপারে তিনি ছিলেন খুবই যত্নবান। ছোট একটি হাদীস থেকে এর স্বাক্ষর মেলে। নবী করীম (স) বলেছেন, "যে ঘুষ নেয় এবং যে ঘুষ দেয়, তারা দুজনেই জাহান্নামী।"

একবার একজন যাকাত আদায়কারী নবী করীম (স)-এর নিকট যাকাত আদায়ের হিসেব দিয়ে বললেন, "এ হলো সরকারী সম্পদ। আর এগুলো জনগণের তরফ থেকে আমাকে দেয়া উপহার উপঢৌকন। তার কথায় নবী করীম (স) ভীষণ অসন্তুষ্ট হলেন। মিহরাবে দাঁড়িয়ে সাহাবীদেরকে লক্ষ করে বললেন, যাকাত আদায়কারীদেরকে নিজেদের ঘরে মায়েদের কাছে থাকতে দাও এবং দেখ, কে তাদের উপহার দেয়।"

একবার খলীফা উমর (রা)-এর দরবার থেকে একজন দূত রোমান সম্রাটের কাছে যাচ্ছিলেন। খলীফা উমর (রা)-এর অজান্তে তাঁর বেগম সাহেবা একজন দূতের মাধ্যমে রোমান সম্রাজ্ঞীর কাছে কিছু উপহার পাঠালেন। রোমান সম্রাজ্ঞীও খলীফার বেগম সাহেবার জন্য একটি মূল্যবান নেকলেস পাঠালেন। এক সময় বিষয়টি খলীফার গোচরীভূত হলো। অমনি তিনি নেকলেসটি বাজেয়াপ্ত করলেন। নেকলেসটি জমা দিলেন সরকারী কোষাগারে। সম্রাজ্ঞীকে উপহার প্রদান বাবদ স্ত্রী যে পরিমাণ অর্থ খরচ করেছে, ঠিক সেই পরিমাণ অর্থ তাকে ফেরত দেয়া হলো। তাফসীরে তাবারীতে বিষয়টির উল্লেখ রয়েছে।

সর্বসাধারণের নৈতিকতার উন্নয়নকল্পে নবী করীম (স) বলেছেন ঃ "তোমরা সময়ের অপচয় করো না। সময়ের অপচয় করলে মূলত আল্লাহর সাথে গাদ্দারী করা হয়। কারণ রাত ও দিনের পর্যায়ক্রমিক আগমন আল্লাহর হুকুমেই হয়ে থাকে।" বস্তুতপক্ষে এ হাদীসের মাধ্যমে নবী করীম (স) মানব জাতির জন্য এমন একটি উপদেশ রেখে গেছেন যা বর্তমান সময়েও সমান গুরুত্বের সাথে বিবেচনার দাবী রাখে।

যা কিছু অসম্ভব, যা কিছু সাধ্যের বাইরে মানুষের কাছে তা দাবী করে না, বরং ইসলামের দাবী এই যে, মানুষ জীবনের সর্বক্ষেত্রে এবং সর্বতোভাবে নৈতিকতার উন্নয়নে সচেষ্ট থাকবে। এজন্য তাদেরকে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে উদ্যোগী হতে হবে। তবে নৈতিকতা সংক্রান্ত

দায়দায়িত্ব নিরূপিত হবে ব্যক্তি পর্যায়ে। বিষয়টির প্রতি আলোকপাত করে কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ

لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَاكْتَسَبَتْ ط - البقرة : ٢٨٦

"সে (ভালো) যা উপার্জন করে তা তারই এবং সে (মন্দ) যা উপার্জন করে তাও তারই।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২৮৬

আন্যান্যরা মন্দ কাজে প্রবৃত্ত হয়েছে বলেই আমিও মন্দ কাজে লিপ্ত হব —ইসলামে এমন যুক্তির স্থান নেই। অন্যান্যদের মন্দ আচরণের অনুকরণ না করে সে বরং অন্যদের জন্য উন্নত চরিত্রের নজীর স্থাপন করবে এটাই ইসলামের দাবী। এখানে সামাজিক আচরণের উপর সাধারণভাবে আলোকপাত করা যেতে পারে। সৎ ও নিষ্ঠাবান প্রতিবেশীদের অধিকার সম্পর্কে নবী করীম (স) বলেছেন, "জিবরাঈল (আ) প্রতিবেশীদের অধিকার সম্পর্কে এতো বেশি তাকীদ দিতেন যে, আমার মনে হত মৃত ব্যক্তির সম্পদে নিকট আত্মীয়দের যেমন অধিকার থাকে তেমনিভাবে পাড়া-প্রতিবেশীরাও উত্তরাধিকারীদের তালিকায় এসে যাবে।"

জানা যায়, নবী করীম (স)-এর মদীনায় অবস্থানকালে কাছাকাছি কোথাও এক ইয়াহুদী বাস করতো। ইয়াহুদী লোকটি কখনো অসুস্থ হয়ে পড়লে প্রিয়নবী (স) তাকে দেখতেন এবং নানাভাবে সাহায্য করতেন। একজন অমুসলিম প্রতিবেশীর সাথে একজন মুসলমানের আচরণ কেমন হওয়া উচিত উপরোক্ত ঘটনার মধ্যে প্রিয়নবী (স) তারই শিক্ষা প্রদান করেছেন।

দৈনন্দিন জীবনে একজনের আচার-আচরণ কেমন হবে, অন্যান্যদের সাথে কিরূপ ব্যবহার করতে হবে, নবী করীম (স) সে সম্পর্কেও স্পষ্ট দিকনির্দেশনা দিয়ে গেছেন। তিনি বলেছেন ঃ তুমি নিজের জন্য যেটা পসন্দ কর, সেটা যদি তোমার ভাইয়ের জন্য পসন্দ না কর তাহলে তুমি মু'মিন হতে পারবে না। তিনি আরো বলেছেন ঃ সেই হলো উত্তম ব্যক্তি যে অন্যদের কল্যাণ করে।

এ বিষয়ে কুরআন মজীদে এরশাদ হয়েছে ঃ

وَيُؤْثِرُونَ عَلَى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ط - الحشر : ٩

"তারা অপরকে নিজেদের উপর প্রাধান্য দেয় নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও।"–সূরা আল হাশর ঃ ৯

মক্কার মুহাজিরগণকে মদীনার মুসলমানগণ খুবই আন্তরিকতার সাথে গ্রহণ করেন। তাঁরা এমনভাবে মুহাজিরদের প্রতিবেশী হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন, এমন এক ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করেছিলেন যা বিশ্বমানবের জন্য এক মহানজীর সৃষ্টি করে।

কুরআন মজীদে এরশাদ হয়েছে ঃ

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ ج اِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَا قف

"হে মু'মিনগণ ! তোমরা ন্যায়বিচারে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকবে আল্লাহর সাক্ষী স্বরূপ। যদিও তোমাদের নিজেদের অথবা পিতামাতা এবং আত্মীয়-স্বজনদের বিরুদ্ধে হয়, সে বিত্তবান হোক অথবা বিত্তহীন হোক আল্লাহ উভয়েরই যোগ্যতর অভিভাবক।"

–সূরা আন নিসা ঃ ১৩৫

অষ্টম অধ্যায়

ইসলামে রাষ্ট্রনীতি

ইসলামের দৃষ্টিতে দেহ ও আত্মার সমন্বয়ে মানুষের জীবন গড়ে ওঠে। সুতরাং এটা খুবই স্বাভাবিক যে, ধর্ম ও রাষ্ট্রনীতির মধ্যে একটি গভীর সম্পর্ক থাকবে। ইসলাম এমন সমাজব্যবস্থা কায়েম করে যেখানে ইবাদাত-বন্দেগী সমষ্টিগত এবং একটি জামায়াতবদ্ধভাবে আদায় করে। সালাতের সময় সবাই কিবলামুখী হয়। আবার বিশ্বের সকল মুসলমান একই সময়ে সিয়াম পালন করে। বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে তারা কা'বাঘর তাওয়াফ করে। বিশ্বের নারী-পুরুষ সকল মুসলমানের জন্য এটি অন্যতম ফরয।

ইসলাম ব্যক্তির উন্নয়ন ও ব্যক্তিগত দায়-দায়িত্বের ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করলেও বিশ্বের সকল মুসলমানকে এক সত্তা হিসেবে বিবেচনা করে। এ সত্তার নামকরণ করা হয়েছে উম্মাহ্ হিসেবে। মানুষের আচরণ ও চালচলনকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ইসলামে নির্দিষ্ট নিয়ম-কানুন রয়েছে। সে নিয়ম-কানুনগুলো দেশ-গোত্র-বর্ণ-নির্বিশেষে সকলের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। বিশ্বের প্রতিটি মু'মিন মুসলমান নিষ্ঠার সাথে এ নিয়ম-কানুনগুলো অনুসরণ করে থাকে।

জাতীয়তা

পর্যালোচনা করলে মানব সমাজে পরস্পর বিরোধী দুটি ধারা লক্ষ করা যাবে। একটিকে বলে কেন্দ্র প্রসারী অপরটি কেন্দ্রমুখী । একদিকে দেখা যাবে যে, বিচ্ছিন্ন মানুষগুলোর মধ্যে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। নিজেরা দলবদ্ধ হয়ে পরিবার, গোত্র, রাষ্ট্র এমনকি সাম্রাজ্য গড়ে তোলে। অবশ্য কখনো স্বেচ্ছায়, কখনো আবার বাধ্য হয়ে এভাবে দলবদ্ধ হয়। অপরদিকে একই পিতামাতা বা পূর্বপুরুষের বংশধর হয়েও তারা বৃহত্তর দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। পৃথক এবং স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করার জন্য আত্মীয়-স্বজন থেকে সরে এসে ছোট ছোট দল গঠন করে। একটি জনগোষ্ঠীর এভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার ঘটনাটিও দুটি কারণে হতে পারে। প্রথমত জীবিকার সন্ধানে অর্থাৎ একটি এলাকার ওপর জনসংখ্যার অতিরিক্ত চাপ বাড়ার কারণে তারা আন্তরিক পরিবেশেই পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে। দ্বিতীয় ভাবাবেগ, ঝগড়া-বিবাদ এবং অন্যান্য কারণেও বিচ্ছিন্ন হওয়ার ঘটনা ঘটতে পারে।

এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, সকল মানুষের সৃষ্টি আদম (আ) ও বিবি হাওয়া (আ) থেকে। এতদসত্ত্বেও প্রধানত দুটি কারণে মানবজাতির মধ্যে যথেষ্ট বিভিন্নতা বিরাজ করছে তাহলো মৃত্যু এবং দূরত্ব। প্রবৃত্তিগত-ভাবে মানুষ নিকটাত্মীয় এবং পূর্বপুরুষদের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রেখে চলে। কিন্তু পিতা-মাতার ইন্তিকালের পর এ বন্ধন শিথিল হয়ে পড়ে। যারা বেঁচে থাকে তাদের সংখ্যাও দিন দিন বাড়তে থাকে এবং এমন একটা সময় আসে যখন ব্যক্তির আত্মীয়তার কোনো প্রভাব থাকে না। বলতে গেলে এ বন্ধন অকার্যকর হয়ে পড়ে।

অপরদিকে দূরত্বজনিত কারণেও আমরা আত্মীয়তার বন্ধনের কথা ভুলে যাই। এমন কি ইতিহাসের আলোকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে দূরত্বের কারণে কখনো কখনো আত্মীয়দের মধ্যে কতকগুলো অপ্রতিরোধ্য প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়। যেমন তারা একই ভাষায় কথা বলতে পারে না, তাদের উদ্দেশ্য ও লক্ষের মধ্যে পার্থক্য থাকে, তাদের মধ্যে বিরাজ করে রীতিনীতি ও মূল্যবোধের বিভিন্নতা।

সপ্তম শতাব্দীতে ইসলামের আবির্ভাবকালে বর্ণ, ভাষা, জন্মগত এবং জাতীয় বৈষম্য ও কুসংস্কারগুলো ছিলো খুবই ব্যাপক ও প্রকট। বিশেষ কোনো গোষ্ঠী বা এলাকার জন্য এটা কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছিলো না। বরং এটাই বিবেচিত হতো সাধারণ নিয়ম হিসেবে। এ ধারণাগুলো সকলের মধ্যে এত বদ্ধমূল ছিলো যে, কালক্রমে এগুলো তাদের সহজাত বিশ্বাসে পরিণত হয়। আরব, ইউরোপ, আফ্রিকা, এশিয়া ও আমেরিকাসহ বিশ্বের সর্বত্র বিরাজ করছিলো একই অবস্থা । ইসলাম এগুলোকে মানবতা বিরোধী বলে আখ্যা দেয় এবং এ অবস্থা থেকে উত্তরণের প্রচেষ্টা চালায়।

অহমিকাবোধ এবং ধনলিপ্সা বলতে গেলে সমাজের প্রতিটি ব্যক্তিকে পরস্পরের বিরুদ্ধে বাদ বিসংবাদে লিপ্ত রেখেছে। পরিবার, গোষ্ঠী বা গোত্রীয় বন্ধন তাদেরকে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা প্রদান ও প্রতিরক্ষা করতে ব্যর্থ হচ্ছে। এ অবস্থার উত্তরণকল্পে কখনো কখনো যোদ্ধা ও রাজা সম্রাটগণ জোর করে বৃহত্তর জনগোষ্ঠী গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চালিয়েছে। কিন্তু তাদের মধ্যে কখনো অভিন্ন উদ্দেশ্য ও লক্ষ গড়ে ওঠে না। ফলে বৈশিষ্ট্যগতভাবে কৃত্রিমতার ওপর গড়ে ওঠা সংগঠনগুলো ক্রমশ ভেঙে টুকরো টুকরো হতে থাকে।

হাজার বছর পূর্ব থেকেই মানবসমাজে জাতীয়তার ধারা চলে আসছে। এ স্থলে জাতীয়তার ক্রমবিকাশের ইতিহাস সম্পর্কে পর্যালোচনা অনাবশ্যক

বরং বর্তমানে জাতীয়তার ধারণা যেভাবে আছে তা আলোচনা করলেই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

জাতীয়তা যদি ভাষা, ধর্ম অথবা জন্মস্থানের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে তাহলে স্বভাবিকভাবেই সে জাতি হবে খুবই সংকীর্ণ। এখানে বিদেশীরা স্থায়ীভাবে বহিরাগত হিসেবে বসবাস করবে। এমন জাতীয়তা কখনো বিশ্বের সমস্ত জনগোষ্ঠীকে একীভূত করতে পারবে না। এখানে বিদেশীরা স্থায়ীভাবে বহিরাগত হিসেবে চিহ্নিত হবে। এ স্থলে সবসময় পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ, এবং যুদ্ধ বাধার সমূহ সম্ভাবনা থাকবে। তার চেয়ে বড় কথা জাতীয়তা কখনো পরস্পরের মধ্যে স্থায়ী বন্ধনের নিশ্চয়তা দেয় না। কারণ কখনো দুই সহোদর ভাই পরস্পরের শত্রুতে পরিণত হতে পারে, কখনো আবার আদর্শের ঐক্যের কারণে দুই অপরিচিত ব্যক্তির মধ্যে গড়ে উঠতে পারে আত্মীয়তার দৃঢ় বন্ধন।

কুরআনুল করীমে ভাষা, গোত্র বা বর্ণগত কৌলিন্যের জন্য মানুষের শ্রেষ্ঠত্বকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। কিন্তু যে ব্যক্তি ইবাদাত-বন্দেগীতে উত্তম, ইসলাম কেবলমাত্র তাঁর শ্রেষ্ঠত্বকে স্বীকার করে।

মুসলমানদের জাতীয়তার ভিত্তি হলো একটি আদর্শ ধর্ম। আর সেটি হলো ইসলাম। বর্তমানে দুনিয়াতে প্রচলিত ও সর্বজন স্বীকৃত ধর্মগুলোর মধ্যে ইসলাম একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্টে রয়েছে। তা এদিক থেকে যে, ইসলাম পার্থিব জীবনকে পরিহার করে না বরং এখানে দেহ ও আত্মা উভয়ের রয়েছে সমান গুরুত্ব। ইসলাম একই সময়ে আধ্যাত্মিক চর্চার পাশাপাশি পার্থিব জীবনের সমৃদ্ধ এবং কার্যকারিতার ওপর জোর দিয়ে থাকে। অতীতে দেখা গেছে যে, মুসলমানগণ খুবই সাফল্যের সাথে বর্ণ ও গোত্রীয় ভেদাভেদ এবং আঞ্চলিকতার বন্ধনকে উপেক্ষা করতে পেরেছিলেন। তারা নিজেদের মধ্যে সৃষ্টি করেছিলেন অদ্ভুত রকমের এক ভ্রাতৃত্ব এবং বর্তমান সময় পর্যন্ত তা মুসলমানদের মধ্যে বিরাজ করছে।

বর্তমান বিশ্বে সকল জাতিই দেশীয়করণ প্রক্রিয়াকে অনুমোদন করে। কিন্তু নতুন কোনো ধর্ম বা আদর্শ গ্রহণ করা যেমন সহজসাধ্য ব্যাপার নয় তেমনিভাবে ভাষা, বর্ণ বা আঞ্চলিকতার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা জাতীয়তার আওতাভুক্ত হওয়াটাও খুব কঠিন । বলে রাখা আবশ্যক যে, ইসলামের দৃষ্টিতে কোনো ব্যক্তির মুসলিম উম্মার অন্তর্ভূক্ত হবার বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে তার ইচ্ছা ও পসন্দের উপর নির্ভর করে।

ইসলামের সার্বজনীনতার নীতি ও পদ্ধতিসমূহ

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, বিশেষ কতকগুলো নীতি ও পদ্ধতির ভিত্তিতে ইসলামে জাতীয়তা গড়ে ওঠে। এর মধ্যে রয়েছে সকলের সমানভাবে প্রযোজ্য কতকগুলো আইন—সালাত আদায়ের সময়ে কেবলামুখী হওয়া, পবিত্র হজ্জ পালনের জন্য সকলের এক জায়গায় একত্রিত হওয়া ইত্যাদি। এছাড়া জাতীয়তার ভিত্তিকে দৃঢ় করার জন্য খেলাফত ব্যবস্থা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

কুরআনুল করীমে ঘোষণা দেয়া হয়েছে ঃ

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلاَّ كَآفَّةً لِّلنَّاسِ ـ سبا : ٢٨

"হে নবী! আমরা তোমাকে সমগ্র মানবজাতির জন্যই প্রেরণ করেছি।"–সূরা সাবা ঃ ২৮

وَخَاتَمَ النَّبِيّنَ ط ـ الاحزاب : ٤٠

"এবং তিনি সর্বশেষ নবী।"–সূরা আল আহযাব ঃ ৪০

সুতরাং তাঁর পর আর কোনো নবী আসবেন না। তাঁর শিক্ষা সকল প্রকার শ্রেণী এবং বর্ণ বৈষম্যকে নির্মূল করে দিয়েছে। তিনি মদীনায় যে নগর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন তা ছিলো খুবই সুসংগঠিত। সে রাষ্ট্রের আধ্যাত্মিক, জাগতিক এবং অন্যান্য সমুদয় ক্ষমতা ছিলো তাঁর হাতে।

নবী করীম (স)-এর হাতে নেতৃত্বের যে ধারা গড়ে উঠেছিলো তাঁর ওফাতের পর সে ধারা উত্তরাধিকার সূত্রে খলীফাগণের ওপর ন্যস্ত হয়। শুধু পার্থক্য এই যে, উত্তরাধিকারীগণ খলীফামাত্র, তাঁরা নবী ছিলেন না। ফলে তাঁদের ওপর কোনো ওহী নাযিল হতো না।

নবী করীম (স) সবসময় সমাজবদ্ধ জীবনের তাকীদ দিতেন। বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে তিনি এমনও বলেছেন যে, "কেউ ইন্তেকাল করলো, কিন্তু ইমাম বা খলীফাকে চিনলো না সে যেনো বিধর্মী হিসেবেই ইন্তেকাল করলো।" তাছাড়া নবী করীম (স) মুসলিম উম্মাহর মধ্যে একতা এবং দৃঢ়তা প্রতিষ্ঠার জন্য তাকীদ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "যে কেউ উম্মাহ হতে বিচ্ছিন্ন হলো সে যেনো জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করলো।"–মুসলিম, তিরমিযী

নবী করীম (স)-এর আমলেও বেশ কিছু সংখ্যক মুসলমান নগর রাষ্ট্র মদীনার বাইরে বসবাস করতেন। উদাহরণ হিসেবে আবিসিনিয়া ও

মক্কার কথা বলা যেতে পারে। কখনো স্বেচ্ছায় কখনো বাধ্য হয়ে, কখনো একাকী, কখনো আবার দলবদ্ধভাবে তারা এ সমস্ত অঞ্চলে বসবাস করতেন। কোনো কোনো অমুসলিম অঞ্চলের লোকদের মধ্যে ধর্মীয় সহিষ্ণুতার অভাব প্রচণ্ডভাবে ছিলো। তারা নির্বিচারে মুসলমানদের নির্যাতন করত। নগর রাষ্ট্র মক্কা এবং রোমান সাম্রাজ্যে বিরাজ করছিলো এ অবস্থা। আবার খৃস্টান রাজ্য আবিসিনিয়ার মতো কতকগুলো দেশ ধর্মীয় ব্যাপারে খুবই উদার নীতি অনুসরণ করতো।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, খলীফা উত্তরাধিকার সূত্রে নবীজীর নিকট থেকে দ্বিবিধ ক্ষমতা লাভ করতেন। একটি আধ্যাত্মিক, অপরটি জাগতিক। তিনি রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে মসজিদে সালাতের ইমামতি করতেন আবার রাষ্ট্রের যাবতীয় পার্থিব কাজকর্মে নেতৃত্ব দিতেন।

রাসূল (স)-কে নবী হিসেবে স্বীকার করে নেয়ার সাক্ষী হিসেবে একজনকে তাঁর নিকট বায়আত গ্রহণ করতে হয়। বায়আত হলো আনুগত্য করার শপথ। এটা এক ধরনের চুক্তি। অনুরূপভাবে খলীফা নির্বাচনের সময়ও বায়আত গ্রহণ করতে হয়। বস্তুতপক্ষে শাসক এবং শাসিতের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তিই হলো রাষ্ট্রীয় সংগঠনের ভিত্তি।

ক. বলে রাখা আবশ্যক যে, বাস্তব ক্ষেত্রে সমস্ত জনগোষ্ঠী ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক খলীফার নিকট বায়আত গ্রহণ করেন না। যারা জনগণের প্রতিনিধিত্ব করেন, শুধুমাত্র তারাই জনগণের পক্ষ হতে আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করে থাকেন। এভাবে চুক্তি সম্পাদন বা আনুগত্য প্রকাশের মাধ্যমে যে মনোনয়ন দেয়া হয়, তার মধ্যে এ ইংগিতও থাকে যে, অবস্থার প্রেক্ষিতে এ চুক্তি বাতিল বা আনুগত্য প্রত্যাহারের সম্ভাবনাও রয়েছে। অর্থাৎ যে সমস্ত প্রতিনিধি দ্বারা খলীফা বা শাসক নির্বাচিত হন, আবার তাদের দ্বারাই খলীফা পদচ্যুত হতে পারেন।

খ. হযরত মুহাম্মাদ (স) আল্লাহর রাসূল হওয়ার সুবাদে তাঁর উম্মাতকে বিভিন্ন বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি জারি করেছেন কতকগুলো বিধি-বিধান ও নিয়ম-কানুন। ভবিষ্যত বংশধরদের জন্য তা যথাযথভাবে সংরক্ষিত হয়েছে। বস্তুতপক্ষে এসব কিছুই আসমানী প্রত্যাদেশের মতো গুরুত্বপূর্ণ। পৃথিবীর বুকে বিরাজ করছে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব এবং এটা চিরন্তন সত্য। অপরদিকে নবীজীর উম্মাতদের মধ্যে রয়েছে যোগ্যতার তারতম্য। বস্তুতপক্ষে তারা তাদের যোগ্যতা অনুসারে আল্লাহর রাসূলের উত্তরাধিকারী হিসেবে কাজ করে থাকে। কিন্তু কস্মিনকালেও তাদের ওপর

কোনো ওহী নাযিল হবে না। ফলে স্বাভাবিকভাবেই আইন-কানুনের ব্যাপারে তাদের ক্ষমতা খুবই সীমিত হয়ে পড়েছে। তারা আল্লাহ্ তাআলার তরফ থেকে নবী করীম (স) যে আইন জারী করেছেন, তা রহিত করতে পারে না।

গ. তাঁরা কেবলমাত্র নিয়ম-কানুনগুলোর বিশ্লেষণ দিতে পারেন। আর যদি বিশেষ কোনো বিষয়ের ওপর নবী করীম (স) কোনো বিধান জারী না করে থাকেন তাহলে সেসব ক্ষেত্রে আল্লাহর দেয়া বিধি-বিধানের সাথে সংগতি রেখে আরো নতুন নিয়ম-কানুন জারী করতে পারেন।

ঘ. অন্য কথায় বলা যেতে পারে যে, খলীফা কখনো আইন-কানুনের ব্যাপারে স্বেচ্ছাচারী হতে পারেন না। তিনি হলেন সাংবিধানিক প্রধান। রাষ্ট্রের একজন নাগরিকের মতো রাষ্ট্রপ্রধানের ওপরও দেশের আইন-কানুন, বিধি-বিধানসমূহ সমানভাবে প্রযোজ্য। নবী করীম (স) নিজে যে নযীর স্থাপন করে গেছেন তা থেকে এটা সুপ্রমাণিত যে, মুসলিম রাষ্ট্রের প্রধান আইনের ঊর্ধে হতে পারেন না।

ইতিহাস সাক্ষ দেয় যে, দেশের একজন নিরীহ নাগরিক এমন কি একজন অমুসলিমের অভিযোগের প্রেক্ষিতেও খলীফাকে বিচারালয়ে হাযির হতে হয়। বস্তুতপক্ষে মুসলিম জাহানের প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর (রা)-এর যামানা থেকে আজ পর্যন্ত এ ধারা অব্যাহত রয়েছে।

অবশ্য একথা সত্য যে, খেলাফতের ধারণা ও তার বাস্তবায়ন সবসময় অভিন্নরূপে হয় না। বরং এ দুয়ের মাঝে বিস্তর ব্যবধান থাকে। খেলাফতের ইতিহাসের ওপর সংক্ষেপে আলোকপাত করলেই এর বাস্তব অবস্থা স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

খেলাফত

কুরআন মজীদে ভালোমন্দ সব ধরনের রাজা-বাদশাহদের বিবরণ রয়েছে। কিন্তু সেখানে প্রজাতন্ত্র বা এ জাতীয় কোনো সরকার কাঠামো সম্পর্কে কোনো উল্লেখ নেই। নবী করীম (স)-এর ওফাতের পর উত্তরাধিকার নির্বাচনের ব্যাপারে সাহাবীগণের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দেয়। এ ঘটনা থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, উত্তরাধিকার নির্বাচনের ব্যাপারে তিনি সুস্পষ্ট কোনো নির্দেশ রেখে যাননি। কিছু সংখ্যক সাহাবী অভিমত ব্যক্ত করেন যে, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা তাঁর বংশের কারো ওপর অর্পণ করা উচিত। আর নবী করীম (স)-এর যেহেতু কোনো পুত্র-সন্তান নেই

সেহেতু চাচা আব্বাস (রা) অথবা চাচাতো ভাই আলী (রা) হতে পারেন তাঁর উত্তরাধিকারী।

বেশির ভাগ সাহাবী সাময়িকভাবে একজন উত্তরাধিকারী নির্বাচনের ইচ্ছা পোষণ করেন। তাঁদের মধ্যেও আবার কাকে প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন দেয়া হবে—সে ব্যাপারে মতপার্থক্য ছিলো। তবে অধিকাংশ সাহাবীই সাধারণ নির্বাচনের পক্ষে ছিলেন। এভাবে নির্বাচনের মাধ্যমে যে সরকার প্রতিষ্ঠিত হলো সেটা উত্তরাধিকার ভিত্তিক রাজতন্ত্র ছিলো না। আবার প্রজাতন্ত্রও নয়। বরং এটি ছিলো দুয়ের মধ্যবর্তী একটি সরকার ব্যবস্থা। নির্বাচিত খলীফার কার্যকাল ছিলো তাঁর গোটা জীবনব্যাপী। এখানে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতো প্রজাতন্ত্রের অনুকরণে, কিন্তু তাঁর ক্ষমতার মেয়াদকাল ছিলো রাজা-বাদশাহ্দের মত।

শুরু থেকেই নির্বাচিত খলীফাদের ভিন্নমতাবলম্বী কিছু লোক ছিলো। এমন কি তাদের কেউ কেউ খলীফা পদের দাবীদার হয়ে ওঠে। তারই ফলে মুসলমানদের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে ঝগড়া ফ্যাসাদ ও রক্তপাতের সূত্রপাত ঘটে। পরবর্তী সময়ে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কিছু সংখ্যক রাজবংশের হাতে চলে যায়। প্রথমে আসে উমাইয়া বংশ। পরে হাত বদল হয়ে এ ক্ষমতা চলে যায় আব্বাসীয়দের কাছে কিন্তু আব্বাসীয় খলীফাগণ স্পেনের মতো দূরবর্তী প্রদেশের আনুগত্য লাভে সমর্থ হলেন না। সেখানে নতুন রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হলো। তারা নিজেদের স্বাধীন সার্বভৌম বলে দাবী করলো। অবশ্য তারা খলীফা উপাধি গ্রহণ করা হতে বিরত থাকলো। এরও বহু পরে (প্রায় দুইশত বছর) মুসলিম সাম্রাজ্যে একাধিক খেলাফতের আবির্ভাব ঘটে। স্বাধীন ও স্বতন্ত্র খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হলো বাগদাদ, কর্ডোভা এবং কায়রোকে কেন্দ্র করে।

ইসলামের ইতিহাসে নতুন মাত্রা সংযুক্ত হলো তুর্কীদের ইসলাম গ্রহণের পর। শুরুতে তাদের আগমন ঘটে সাধারণ সৈনিক হিসেবে। পরে তারা অধিনায়ক হিসেবে প্রতিষ্ঠা এবং প্রকৃত অর্থে তারাই রাষ্ট্রের শাসক সম্প্রদায়ে পরিণত হয়। কালক্রমে খলীফাগণের পাশাপাশি অধিনায়কগণের মধ্য হতে একজন প্রধান অধিনায়ক হলেন এবং তার নামকরণ হলো সুলতান হিসেবে। এরপর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বিভক্ত হয়ে গেলো। প্রশাসন চলে সুলতানের হাতে। তারা মূলত খলীফার পক্ষ হতে শাসন কাজ চালিয়ে গেছেন। এখান থেকেই তাদের মধ্যে লোভ এবং হিংসার সূত্রপাত ঘটে। পরবর্তীতে বিভিন্ন প্রদেশে সুলতানরা স্বাধীনভাবে কাজ করতে শুরু করে এবং বংশানুক্রমে তারা শাসনকার্য চালাতে থাকে।

কখনো আবার দুঃসাহসী উচ্চাভিলাসীরা ক্ষমতাসীন সুলতানকে পরাভূত করে নিজেরা সুলতানের মসনদ গ্রহণ করত। এসব ক্ষেত্রে খলীফাদের নিজস্ব কোনো পসন্দ বা অভিমত ছিলো না। যা কিছু ঘটতো বা যেই ক্ষমতায় আসত, খলীফাগণ শুধুমাত্র সেটাকেই অনুমোদন দিতেন।

খেলাফতসমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম মিসরের ফাতেমীয় খেলাফতের পতন ঘটে। একটি তুর্কী রাজবংশ সেখানে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয় এবং তারা আব্বাসীয় খেলাফতের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে। তাদের হাতে বাগদাদ ধ্বংস হওয়ার পর খেলাফত কায়রোয় স্থানান্তর করা হয়। পরবর্তী অটোমান তুর্কীরা মিসর দখলের পর আব্বাসীয় খেলাফতের পতন ঘটে। এরও কিছুকাল পর খৃষ্টানদের কাছে স্পেনের খলীফার পতন ঘটলে তারা মক্কায় নতুনভাবে খেলাফত পুনর্গঠন করে। ইস্তাম্বুল, তুর্কী এবং দিল্লিতে মোঘলরাও খেলাফতের অনুকরণে ক্ষমতার দাবীদার হয়ে ওঠে। কিন্তু সাম্রাজ্য বিশাল ও বিরাট হলেও তাদের সে দাবি নিজেদের সাম্রাজ্য সীমানার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে।

গোড়ার দিকে এটাকে একটি আবশ্যকীয় শর্ত হিসেবে ধরে নেয়া হয়েছিলো। যিনি খলীফা হবেন তাকে অবশ্যই কুরাইশ বংশীয় হতে হবে। কিন্তু এর ব্যতিক্রম ঘটে তুর্কী ও মোঘলদের বেলায়। অপরদিকে তুর্কী জনগণের হাতেই তুর্কী খলীফা ক্ষমতাচ্যুত হয়। তারা সেখানে প্রতিষ্ঠা করলো প্রজাতান্ত্রিক সরকার কাঠামো। এমন কি খলীফার যে মর্যাদা ও ক্ষমতা ছিলো, রাষ্ট্রপ্রধানের ওপরও তা ন্যস্ত করলো না। তদস্থলে খলীফার অধিকার ও ক্ষমতাকে জাতীয় সংসদের ওপর ন্যস্ত করা হলো। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ সংসদ এ অধিকার ও ক্ষমতা দাবিও করলো না। অথবা তা প্রয়োগ করলো না।

তুরস্কে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠাকালে দ্বিতীয় আবদুল মজীদ খলীফা ছিলেন। নবী করীম (স)-এর পর থেকে হিসেব করলে তিনি ছিলেন একশততম খলীফা। ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর তিনি প্যারিসে আশ্রয় নেন এবং সেখানেই ইন্তেকাল করেন। স্পেনের খেলাফতের পতনের পর মরক্কোয় যে খেলাফত পুনর্গঠন করা হয়েছিলো ততদিনে তাও ফরাসীর আশ্রিত রাজ্যে পরিণত হয়।

খেলাফত প্রসংগে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিশেষ গুরুত্বের সাথে বিবেচনার দাবি রাখে। নবী করীম (স) ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে, তাঁর পর খেলাফতের

স্থায়ীকাল হবে মাত্র ত্রিশ বছর। এরপরেই আসবে বিবদমান রাজতন্ত্র।-(ইবনে কাছীর, তিরমিযী, আবু দাউদ) আরেকটি বর্ণনায় এরূপ উল্লেখ আছে যে, নবী করীম (স) বলেছেন, খেলাফতের বিষয়টি কুরাইশ গোত্রের লোকদের অধিকারভুক্ত। নবী করীম (স)-এর এ উক্তির প্রেক্ষাপট জানা যায়নি। তাছাড়া যোগ্যতা অর্জনের জন্য কুরাইশ বংশীয় হওয়ার ব্যাপারে যে শর্ত দেয়া হয়েছে নবী করীম (স)-এর গৃহীত ব্যবস্থা থেকে তা প্রমাণিত হয় না। ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, নবী করীম (স)-এর মদীনায় উপস্থিতি এবং সেখানে নগর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার পর বিভিন্ন কাজে অন্তত পক্ষে ২৫ বার তাঁকে রাজধানীর বাইরে যেতে হয়েছিলো। এর মধ্যে রয়েছে রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষার জন্য সামরিক অভিযান পরিচালনা, চুক্তি সম্পাদন, হজ্জ পালন ইত্যাদি। প্রতিবারেই তিনি একজন প্রতিনিধি মনোনয়ন করে গেছেন। মদীনার অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে পরিচালনা করাই ছিলো তাঁর প্রধান কাজ। কিন্তু সবসময় একই ব্যক্তিকে এ কাজে নিয়োগ করেননি। মনোনয়ন প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে ছিলেন মদীনা, কুরাইশ, কিনান এবং অন্যান্য গোত্রের লোকজন। এমনকি একবার একজন অন্ধ সাহাবীও এ দায়িত্ব লাভ করেছিলেন। নবী করীম (স)-এর ওফাতের মাত্র তিন মাস পূর্বে তিনি যখন হজ্জ উপলক্ষে মক্কায় যান, তখন অন্ধ সাহাবীর ওপর মদীনার শাসনভার ন্যস্ত করেন।

প্রসংগক্রমে আরো উল্লেখ করা আবশ্যক যে, হযরত আবু বকর (রা)-কে খলীফা হিসেবে নির্বাচনের সময় একই সাথে দুজন খলীফার সমন্বয়ে যৌথ শাসনব্যবস্থার প্রস্তাব দেয়া হয়েছিলো। কিন্তু কতগুলো বাস্তব কারণে এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা হয়। তবু একথা সত্য যে, এটাও মুসলিম সরকার কাঠোমোর একটি সম্ভাব্য পদ্ধতি। কুরআন কারীমেও এ ধরনের সরকার কাঠামোর উল্লেখ রয়েছে। বলা হয়েছে যে, وَاَشْرِكْهُ فِىْ اَمْرِىْ "এবং তাকে আমার কাজে শরীক বানিয়ে দাও।"–সূরা ত্বাহা ঃ ২০ অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও প্রশাসন ব্যবস্থায় 'হারুন' ছিলেন মূসা (আ)-এর একজন সহযোগী। তাছাড়া জাফর এবং আবদ যৌথভাবে ওমান শাসন করতেন। তাঁদের ইসলাম গ্রহণের পর নবী করীম (স) ওমানের শাসন ব্যবস্থায় পূর্বের নিয়ম চালু রাখেন।

ইসলামী পরিভাষায় খলীফা বলতে যা বুঝায় বর্তমানে মুসলিম সমাজে তার কোনো অস্তিত্ব নেই। তবু একথা সত্য যে, মুসলমানরা এখনো খেলাফত প্রতিষ্ঠার আশা পোষণ করে। বর্তমান দুনিয়ায় মুসলমানরা বিভিন্ন জনগোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে বসবাস করছে। সার্বজনীন

খেলাফত প্রতিষ্ঠার পূর্বে তাদেরকে সংঘবদ্ধ করতে হবে। এজন্য সম্ভাব্য একটি পথ এ রকম যে, নবী করীম (স)-এর আমলে যে অবস্থা ছিলো তারা ঠিক সে অবস্থায় ফিরে যাবে। আঞ্চলিক কোন্দল ও বৈরিভাবকে পরিহার করার জন্য এটা প্রয়োজন। আরো ব্যাখ্যা করে বলা যেতে পারে, এখানে সমস্ত মুসলিম রাষ্ট্রের প্রধানগণের সমন্বয়ে একটি "খেলাফত পরিষদ" গঠিত হবে। শিয়া, সুন্নী, কুরাইশ বা অন্য কোনো স্বাধীন জনগোষ্ঠীর প্রধানগণ এর সদস্য হতে পারবে। তাছাড়া পর্যায়ক্রমে প্রত্যেক সদস্যই এক বছর বা নির্দিষ্ট একটি সময়ের জন্য পরিষদের সভাপতি হিসেবে কাজ করবে।

রাষ্ট্রের দায়িত্ব

একটি মুসলিম রাষ্ট্রের কাজ প্রধানত চারটি (ক) নির্বাহী-এর মধ্যে রয়েছে সামরিক ও বেসামরিক প্রশাসন (খ) আইন প্রণয়ন (গ) বিচার সংক্রান্ত কার্যাবলী, (ঘ) সাংস্কৃতিক কার্যাবলী।

'নির্বাহী' সম্পর্কে সবারই মোটামুটি ধারণা আছে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা অনাবশ্যক। দুনিয়ার সকল রাষ্ট্রই অন্য তিনটি কার্য সম্পাদন করে থাকে। মূলকথা হলো, সার্বভৌমত্ব একমাত্র মহান আল্লাহর। আল্লাহ তাআলার তরফ হতে এটা মানুষের জন্য মস্তবড় একটা আমানত। কোনো রকম পক্ষপাতিত্ব না করে মানুষ সকলের কল্যাণের জন্য এ আমানত যথাযথভাবে ব্যবহার করে থাকে।

মুসলিম রাষ্ট্রের বিধি-বিধান প্রণয়নের ক্ষেত্রে মানুষের ক্ষমতারও একটি মাত্রা রয়েছে। সেটা এ কারণে যে, মুসলমানদের জন্য রয়েছে আল্লাহর কালাম বা আল কুরআনুল করীম। কুরআনই হলো মুসলমানদের যাবতীয় আইনের উৎস। এর ব্যাপ্তি রয়েছে জাগতিক ও আধ্যাত্মিক বিষয়াবলী থেকে শুরু করে মানব জীবনের প্রতিটি অংগনে।

বিচার-আচারের মূল কথা এই যে, আইনের চোখে সবাই সমান। এমন কি যিনি রাষ্ট্রের প্রধান, যার হাতে ক্ষমতার চাবি তিনিও একজন সাধারণ নাগরিকের মতো আইনের শাসনের আওতাভুক্ত। কুরআন মজীদের বিধান অনুসারে ইসলামী রাষ্ট্রের অমুসলিম জনগণ বিচার-আচারের ক্ষেত্রে স্বাধীকার ভোগ করে থাকে। সেখানে প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীদের জন্য থাকে নিজস্ব বিচারালয় এবং বিচারকমণ্ডলী। তাদের ফৌজদারী, দেওয়ানী এবং অন্যান্য বিষয়সমূহ নিজস্ব আইন-কানুন দ্বারা পরিচালিত হয়। কুরআন

মজীদ বলে দেয় যে, ইহুদীরা তাওরাত এবং খৃস্টানরা ইনজিলের আইন দ্বারা পরিচালিত হবে।

একথা স্বতন্ত্রভাবে বলার অপেক্ষা রাখে না যে, কখনো কখনো বিবাদে লিপ্ত ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী হতে পারে। আবার তাদের আইন-কানুনগুলোর মধ্যে অসামঞ্জস্যতা ও সংঘাত দেখা দিতে পারে। সেক্ষেত্রে বিচার-আচারের জন্য যে কোনো একটি ধর্মের আইনকে বেছে নেয়া যেতে পারে। তাছাড়া বিচারকও এ ব্যাপারে নিজ থেকে ব্যবস্থা নিতে পারেন। বস্তুতপক্ষে এ জাতীয় পরিস্থিতিতে আইন-কানুনগুলো অনানুষ্ঠানিকভাবে হলেও আন্তর্জাতিক আইনের বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করে।

রাষ্ট্রের মৌলিক কার্যাবলীর মধ্যে সাংস্কৃতিক কার্যক্রম অন্যতম। যে কুরআন ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা তা তুলে ধরাই সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য। অর্থাৎ এ কার্যক্রমের মাধ্যমে একথাই বলে দেয়া হয় যে, পৃথিবীতে শুধুমাত্র আল্লাহ তাআলার বাণী ও তাঁর হুকুমই বিরাজ করবে অন্য কিছু নয়। প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর এ দায়িত্ব পালন করতে হবে। তাছাড়া মুসলিম সরকারকে কেবলমাত্র কুরআনের বিধান অনুসারে দৈনন্দিন শাসন কার্যাবলী পরিচালনা করলে চলবে না। বরং বিদেশে মিশন প্রেরণের জন্য ব্যবস্থা করাও সরকারের একটি দায়িত্ব। কেন ইসলামের আবির্ভাব, ইসলামের মর্মবাণী কি তা অন্যান্যদের কাছে তুলে ধরাই হবে মিশন প্রেরণের মূল উদ্দেশ্য। ইসলামের একটি মৌলনীতি সম্পর্কে কুরআন পাকে বলা হয়েছে, لَآ اِكْـرَاهَ فِى الدِّيْنِ "ধর্মের ব্যাপারে কোনো জোর-জবরদস্তি নেই।"—(সূরা আল বাকারা ঃ ২৫৬)। বস্তুতপক্ষে আল্লাহ্ পাকের এ ঘোষণা দ্বারা একথাই বলে দেয়া হয়েছে যে, এখানে নির্জীব এবং উদাসীন থাকার কোনো অবকাশ নেই। বরং অন্যান্যদেরকে ইসলামের সুমহান শিক্ষার প্রতি আহবান করার দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছে। এটা করতে হবে নিয়মিত এবং নিশ্চিতভাবে।

সরকার কাঠামো

দেশে কি ধরনের শাসন ব্যবস্থা চালু আছে, সরকার কাঠামো কেমন হবে সে বিষয়ের ওপর ইসলাম কোনো গুরুত্ব দেয় না। বরং সরকার কাঠামো মানুষের কতটুকু ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণ সাধন করছে এবং সেখানে আল্লাহর আদেশের বাস্তবায়ন হচ্ছে কিনা—এটাই বড় কথা। আর সে কারণেই এখানে সাংবিধানিক বিষয়টি একান্তই গৌণ। তাই দেখা যায় যে, ইসলামী সমাজে প্রজাতন্ত্র, রাজতন্ত্র বা যৌথ শাসন ব্যবস্থা প্রভৃতি যে কোনো সরকার কাঠামো বৈধ।

কোনো একক নেতৃত্ব যদি উল্লেখিত উদ্দেশ্য অর্জনে সক্ষম হয় তখন একজন মুসলমান তার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে। তবে একটি বিশেষ সময়ে এবং পরিস্থিতিতে ব্যক্তি বিশেষের মধ্যে খলীফা হওয়ার জন্য অত্যাবশ্যকীয় গুণাবলী নাও থাকতে পারে। তখন সরকারকে অধিকতর কার্যকর করার জন্য স্বাভাবিকভাবেই ক্ষমতার ভাষাকে মেনে নিতে হবে। অর্থাৎ যিনি যে কাজের জন্য বেশি উপযুক্ত, তার হাতে সে কাজটি ন্যস্ত করতে হয়। এ প্রসংগে কুরআন মজীদে সূরা আল বাকারার ২৪৬-২৪৭ আয়াতে উল্লেখিত একটি প্রসিদ্ধ ঘটনার উদ্ধৃতি দেয়া যেতে পারে। একবার একটি জনগোষ্ঠী নিজেদের বাড়ীঘর ও আবাসভূমি হতে শত্রুদের দ্বারা বিতাড়িত হয়। তখন তারা তাদের জন্য একজন রাজা নির্বাচন করে দেয়ার ব্যাপারে তৎকালীন নবীর নিকট সনির্বন্ধ অনুরোধ জানায়। এ রাজার নবুওয়াত সম্পর্কিত কোনো গুণাবলী থাকবে না। কিন্তু রাজা এমন হবেন যাঁর নেতৃত্বে তারা সেই শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজন করতে পারে যারা তাদেরকে বাড়ীঘর হতে উৎখাত করেছে। এখানে রাজা মনোনীত হলেন নবীর উপস্থিতিতে। এতে আধ্যাত্মিক বা ধর্মীয় কার্যাবলীর মধ্যে একটি বিভাজন সৃষ্টি হয়। তাই বলে এখানে কোনো পক্ষেরই কোনো রকম স্বেচ্ছাচারিত বা খামখেয়ালীপনা লক্ষ করা যায় না। নবী এবং ধর্মীয় বিধি-ব্যবস্থাসমূহ যেমন আসমানী নিয়ম-নীতি দ্বারা পরিচালিত হয়, রাজা এবং রাজনীতিও তেমনিভাবে আসমানী বিধি-বিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। উভয়ের ক্ষমতার উৎস আল্লাহ। উভয়ের আচরণ বিধিও এক ও অভিন্ন, শুধু পার্থক্য এই যে, একজনে নির্দেশ দেন আধ্যাত্মিক বিষয়ে, অন্যজন জাগতিক কাজকর্মের ব্যাপারে। এখানে মানব জীবনের দুটি ধারার মধ্যে কোনো সংঘাত বা বিভেদ নেই এবং স্পেশিয়ালাইজেশন বা বিশেষ দায়িত্ব পালনে বিশেষ নৈপুণ্য ও দক্ষতাই হলো মুখ্য বিষয়।

পরামর্শের ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণ

পরামর্শের গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিস্তারিত বলা আবশ্যক। কুরআন মজীদে মুসলমানদেরকে যে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে পরামর্শ করার জন্য বার বার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ব্যক্তিগত জীবনে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের বেলায় যেমন পরামর্শ নিতে হবে, তেমনি পরামর্শ নিতে হবে সমষ্টিগত বিষয়ে। নবী করীম (স) যেভাবে এ হুকুমটি আমল করেছেন, তাতে পরামর্শ করার এ বিধানটি আরো তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। কারণ নবী করীম (স) ওহীর মাধ্যমে পথনির্দেশ পেতেন এবং এটা ছিলো

তাঁর একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য। তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে পরামর্শ গ্রহণের এ রীতিটি দৃঢ়ভাবে অনুসরণ করতেন।

কুরআন মজীদ পরামর্শ গ্রহণের জন্য ধরাবাধা কোনো নিয়মপদ্ধতি ও কৌশল বাতলে দেয়নি। বরং পরামর্শ প্রদানকারীর সংখ্যা, নির্বাচনের ধরন, প্রতিনিধিবর্গের কার্যকাল প্রভৃতি বিষয়গুলো দেশের বিশেষ সময়ের নেতৃবৃন্দের ইচ্ছার ওপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে। তবে এ স্থলে যে বিষয়টি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ তা এই যে, দেশের যিনি প্রধান তাঁর অবশ্যই জনপ্রতিনিধিগণের সমন্বয়ে একটি পরিষদ থাকবে। আর এই প্রতিনিধিগণ হবেন জনগণের খুবই আস্থাভাজন ব্যক্তিত্ব। তাদের চরিত্র হবে খুবই উন্নত এবং কালিমামুক্ত।

বৈদেশিক নীতি

আন্তর্জাতিক আইন-কানুন হলো বহির্বিশ্বের সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার মূল ভিত্তি। তবে একথা সত্য যে, এ জাতীয় আইন-কানুনগুলো বিকাশের ধারা খুবই শক্ত। সে তুলনায় একটি রাষ্ট্র বা দলের মধ্যকার পারস্পরিক আচার-আচরণের নিয়ম-নীতিগুলো খুবই দ্রুত বিকাশ লাভ করে। ইসলাম পূর্বযুগে আন্তর্জাতিক আইন বলতে কোনো কিছুর অস্তিত্ব ছিলো না। এটা ছিলো রাজনীতির একটি অংশ। গোটা বিষয়টি দেশের যিনি প্রধান তার ইচ্ছা এবং খেয়াল খুশীর ওপর নির্ভর করতো। বন্ধুসুলভ দেশগুলোর জন্য স্বীকৃত সুযোগ-সুবিধার পরিমাণ ছিলো খুবই সামান্য। আর শত্রুভাবাপন্ন দেশগুলোর জন্য বলতে গেলে কোনো সুযোগ-সুবিধাই ছিলো না।

এটা একটা ঐতিহাসিক সত্য যে, মুসলমানদের হাতেই আন্তর্জাতিক আইনের বিকাশ ঘটে। বিশ্বের মধ্যে তারা সর্বপ্রথম আন্তর্জাতিক আইনকে একটি স্বতন্ত্র ডিসিপ্লিন হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন। এমনকি আন্তর্জাতিক আইনকে রাজনীতির আওতামুক্ত করে এটাকে আইনের অংশ হিসেবে দাঁড় করান। সিয়ার শিরোনামে তারা এ বিষয়ের ওপর অসংখ্য প্রবন্ধ রচনা করেন। এমনকি সাধারণ আইন সম্পর্কে আলোচনাকালে তাঁরা আন্তর্জাতিক আইন বিষয়টিও এর অন্তর্ভুক্ত করেন।

হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দী অর্থাৎ ৮ম শতাব্দীতেই আন্তর্জাতিক আইনের প্রবক্তাগণ এ বিষয়ে লেখালেখি শুরু করেন। তখনই যুদ্ধ সংক্রান্ত বিষয়টিকে শাস্তি আইনের অংশ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। আর সে কারণেই আইনবেত্তাগণ যে সমস্ত চুরি-ডাকাতি, লুণ্ঠন বা রাহাজানির সাথে

স্থানীয় জনগণ সম্পৃক্ত, সেগুলো সম্পর্কে আলোচনার পাশাপাশি তারা যুক্তিসংগতভাবেই বিদেশীদের দ্বারা সংগঠিত অনুরূপ কার্যাবলী সম্পর্কে আলোচনা করেন। এসব ক্ষেত্রে তারা আইন শৃংখলা রক্ষার স্বার্থে সেনাবাহিনী তলব করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। কিন্তু যুদ্ধ সংক্রান্ত বিষয়টি শাস্তি আইনের অন্তর্ভুক্ত করায় এটা সুস্পষ্ট যে, আইনগতভাবেই এর নিষ্পত্তি করতে হবে। এখানে অভিযুক্ত ব্যক্তি বিচারালয়ে আত্মপক্ষ সমর্থন করার অধিকার পাবে।

ইসলামে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিষয়ে একটি মৌলিক নীতি এই যে, পার্থিব জগতে শান্তি ভোগের ক্ষেত্রে মুসলমান ও অমুসলমান সবাই সমান। কিন্তু প্রাচীনকালের অবস্থা ছিলো ভিন্নতর। যেমন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করার জন্য গ্রীকরাও কিছু আইন-কানুন তৈরী করেছিলো। কিন্তু গ্রীককেন্দ্রীক রাষ্ট্রগুলোর মধ্যকার সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করার জন্য এক ধরনের আন্তর্জাতিক আইন ছিলো। আর জাতিতে গ্রীক নয় তাদের জন্য ছিলো অন্য ধরনের আইন। এরিস্টটলের ভাষায় প্রকৃতির ইচ্ছাতেই গ্রীকদের দাস হিসেবে অন্যদের সৃষ্টি । আর সে কারণেই তাদের সাথে গ্রীকদের আচার-আচরণ ছিলো স্বেচ্ছাচারিতায় ভরা। তাদের মধ্যকার সম্পর্ক নির্ধারিত হতো সে অনুসারে। বস্তুতপক্ষে এটা কোনো আইন ছিলো না।

প্রাচীনকালের হিন্দুরাও অনুরূপ দৃষ্টিভংগী পোষণ করতো। গোঁড়ামীর কারণে তারা মানব সমাজের মধ্যে কতকগুলো বর্ণ বা শ্রেণীর সৃষ্টি করে। এর সাথে যুক্ত হয় অস্পৃশ্যতার ধারণা। এর ফলে পশ্চাৎপদ লোকগুলোর অবস্থা আরো করুণ হয়ে ওঠে। রোমানরা বিদেশী বন্ধুদের কিছু কিছু অধিকারকে স্বীকার করে নিয়েছিলো। কিন্তু বিশ্বের আর কারো অধিকারকে মেনে নেয়নি। বরং অন্যান্যদের সাথে তারা নিজেদের খেয়াল খুশী মত ব্যবহার করতো। অবশ্য এক এক সময়ে এক এক জন অধিনায়কের খেয়ালীপনা এবং অভিরুচি অনুসারে আচরণের ধারায় পার্থক্য হতো।

ইহুদী আইনের দাবী এ রকম ছিলো যে, প্যালেস্টাইনে যে সমস্ত আরব বসবাস করে যাদের পরিচিতি আমালিক হিসেবে, আল্লাহ তাআলা তাদের ধ্বংস নির্ধারণ করে রেখেছেন। অন্যত্র যারা আছে তারা বেঁচে থাকবে ইহুদীদের দাস হিসেবে। তাছাড়া কর প্রদান পূর্বক ইহুদীদের অধীনস্থ হিসেবেও তাদের বেঁচে থাকার সুযোগ দেয়া যেতে পারে।

১৮৫৬ সালের পূর্ব পর্যন্ত পশ্চিমারা কেবলমাত্র খৃস্টান জনগণের জন্য আন্তর্জাতিক আইন প্রয়োগ করতো। পরবর্তী সময়ে তারা মানবজাতিকে সভ্য ও বর্বর নামে দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করে ফেলে এবং বর্বর শ্রেণীর লোকেরা কোনো অধিকার বা সুযোগ সুবিধা ভোগ করতে পারতো না।

আন্তর্জাতিক আইনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, মুসলমানরাই সর্বপ্রথম বিদেশীদের অধিকারকে স্বীকার করে নিয়েছে। যুদ্ধ অথবা শান্তি কোনো অবস্থাতেই এ অধিকার প্রদানের ব্যাপারে কোনো রকম তারতম্য করেনি, অথবা তাদের অধিকারকে ক্ষুণ্ন করেনি।

নবী করীম (স) ছিলেন প্রথম মুসলিম রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ছিলেন এর শাসক। নগররাষ্ট্র মদীনাকে কেন্দ্র করে এটা গড়ে ওঠে। বস্তুতপক্ষে স্বায়ত্বশাসিত কতকগুলো গ্রামের সমন্বয়ে কনফেডারেশনের আদলে রাষ্ট্রটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সমস্ত গ্রামের অধিবাসীদের মধ্যে ছিলেন মুসলমান, ইহুদী ও পুতুল পূজারী। সম্ভবত এ সমস্ত গ্রামগুলোতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক খৃস্টানও বসবাস করতো। ফলে ধর্মীয় সহিষ্ণুতা রাষ্ট্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয় এবং রাষ্ট্রের সংবিধানের মধ্যে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

নবী করীম (স) কর্তৃক এ রাষ্ট্রের সাথে অমুসলিমদের সর্বপ্রথম প্রতিরক্ষা চুক্তি সম্পাদিত হয়। মুসলমানগণ অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে এ চুক্তিপত্র মেনে চলতেন। কুরআন করীমেও ওয়াদা পালন করাকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে এবং এ ব্যাপারে নিষ্ঠাবান হবার জন্য জোর তাকীদ রয়েছে। অন্যথায় পরকালে কঠোর শাস্তির হুশিয়ারী দেয়া হয়েছে।

আন্তর্জাতিক আইন-কানুনের উপকরণসমূহ বিভিন্ন সূত্রে সংগৃহীত হতে পারে। এর মধ্যে রয়েছে অভ্যন্তরীণ আইন, বিদেশীদের সাথে সম্পাদিত চুক্তিপত্রসমূহ ইত্যাদি।

ইসলামী আইনবিদগণও ওয়াদা পালনের ওপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। নিম্নের বক্তব্য হতে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয়ে উঠবে। একজন বিদেশী হয়তো পূর্ব অনুমতিক্রমে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কোনো মুসলিম রাষ্ট্রে এলো। ইতিমধ্যে হঠাৎ করেই কোনো কারণে হয়ত মুসলিম রাষ্ট্রের সাথে উক্ত বিদেশী যে দেশের অধিবাসী সে দেশের সাথে যুদ্ধ বেঁধে গেলো। সেক্ষেত্রেও ঐ বিদেশীর নিরাপত্তা কোনোভাবেই বিঘ্নিত হবে না। ভিসার মেয়াদকালীন সময় পর্যন্ত সে নিশ্চিন্তে থাকতে পারবে। ভিসার

মেয়াদ শেষে সে পূর্ণ নিরাপত্তার সাথে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করতে পারবে। এমনকি সে তার মালামাল এবং যা অর্জন করছে তাও সাথে নিতে পারবে। উপরন্তু শান্তিকালীন সময়ে বিদেশী যেভাবে কোর্টের আশ্রয় নিতে পারতো, যুদ্ধ বেঁধে যাবার পরও তার অনুরূপ সুবিধা অব্যাহত থাকবে।

একজন রাষ্ট্রদূত এবং তার সহকর্মীগণ সকল প্রকার বাদ-বিসংবাদ থেকে মুক্ত। এমনকি তিনি যদি অপ্রীতিকর এবং অপ্রত্যাশিত কোনো বার্তা নিয়ে আসেন তবু তাঁর এ মর্যাদা অক্ষুণ্ন থাকে। তিনি ধর্মীয় ব্যাপারে পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করেন, নির্ধারিত সময় অবস্থানের জন্য তিনি পূর্ণ নিরাপত্তা লাভ করেন। অবশেষে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের সুযোগ পেয়ে থাকেন।

মুসলিম রাষ্ট্রের কর্তৃত্বের কতগুলো বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। ইসলামী রাষ্ট্রে যে সমস্ত বিদেশীরা বসবাস করে তারা মুসলমানদের কর্তৃত্বের প্রতি অনুগত থাকে। কিন্তু মুসলিম আইন মেনে চলতে বাধ্য নয়। কারণ ইসলামী হুকুমত নিজ রাজ্যসীমানার অভ্যন্তরে বহুবিধ আইনের পাশাপাশি সহাবস্থানকে স্বীকার করে নেয়। এখানে প্রত্যেকটি ধর্মীয় গোষ্ঠীরই নিজস্ব ও স্বাধীন বিচারালয় থাকবে। আর সে কারণেই একটি মুসলিম রাষ্ট্রে একজন বিদেশী প্রকারান্তরে তার নিজস্ব ধর্মের বিধি-বিধান দ্বারা পরিচালিত বিচারালয়ের আশ্রয়ে বসবাস করে।

কোনো বিবাদে বাদী এবং বিবাদী উভয় পক্ষ ইহুদী খৃস্টান বা অন্য যে কোনো ধর্মাবলম্বীই হোক না কেন, তাদের নিজস্ব বিধি-বিধান দ্বারাই তাদের বিবাদের ফয়সালা হবে। তারা মুসলিম রাষ্ট্রের নাগরিক বা বিদেশী যাই হোক না কেন উভয় ক্ষেত্রেই একই বিধান প্রযোজ্য। এ ব্যাপারে ফৌজদারী এবং দেওয়ানী মামলার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। আর বিবদমান পক্ষ বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী হলে তাদের ব্যাপারে যে ব্যবস্থা নেয়া হবে সে বিষয়ে পূর্বেই আলোচনা হয়েছে। অবশ্য একজন অমুসলিম ইচ্ছা করলে বিচারের জন্য ইসলামী বিচারালয়ে যেতে পারে। মুসলিম আইনেও তার অনুমোদন রয়েছে। তবে শর্ত এই যে, বিবাদে লিপ্ত প্রতিটি দলের এ ব্যাপারে সম্মতি থাকতে হবে। কেবলমাত্র সে অবস্থাতেই অমুসলিম হওয়া সত্ত্বেও তাদের ওপর ইসলামী বিধান প্রয়োগ করা যেতে পারে।

ইসলামী বিচারালয়ের আরো একটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। মুসলমান বিচারক ইচ্ছা করলে বিবাদে লিপ্ত ব্যক্তিদের ব্যক্তি আইন অথবা অন্য কোনো বিদেশী আইনের আশ্রয় নিতে পারে। নবী করীম (স)-এর হাদীস থেকেই

এর প্রমাণ মেলে। বুখারী শরীফে উল্লেখ আছে, একবার দুজন ইহুদী ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। অন্যান্য ইহুদীরা তাদেরকে নবীজীর নিকট নিয়ে আসে। নবীজী তাওরাত নিয়ে এলেন এবং ইহুদী আইন অনুসারে তাদের বিচার করলেন।

প্রসংগক্রমে এখানে বৈদেশিক নীতির আরেকটি বৈশিষ্ট্যের প্রতি আলোকপাত করা যেতে পারে। কোনো মুসলমান রাষ্ট্রের একজন নাগরিক হয়তো বিদেশে অবস্থানকালে যে দেশের কোনো লোকের হাতে নির্যাতিত হলো। পরবর্তীতে কোনো কারণে হয়তো সেই নির্যাতনকারী বিদেশী মুসলমান রাষ্ট্রে এলো। তখনও কিন্তু ইসলামী আদালতে তার কোনো বিচার হবে না। আসলে ঐ বিদেশী নাগরিকের বিচার করার মতো মুসলমান বিচারালয়ের ন্যায়সঙ্গত কোনো অধিকার নেই। কারণ অপরাধটি ইসলামী আদালতের কর্ম এলাকার মধ্যে সংঘটিত হয়নি। সকল মুসলিম আইনবিদই এ ব্যাপারে অভিন্ন মত পোষণ করেছেন।

ইমাম আবু হানীফার একজন খ্যাতিমান ছাত্রের নাম আশ-শায়বানী। উপরোক্ত আইনের স্বপক্ষে তিনি একটি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। হাদীসটি এ রকম, নবী করীম (স) থেকে আতিয়াহ ইবনে কায়েস কিলাবী (রা) সূত্রে বর্ণিত আছে যে, কোনো ব্যক্তি হত্যা, ব্যভিচার বা চুরি-ডাকাতি করার পর হয়তো শত্রুভাবাপন্ন অন্য কোনো দেশে গিয়ে আশ্রয় নিলো। পরবর্তীতে সচ্চরিত্রবান হয়ে আবার সে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে তখন তাকে ঐ অপকর্মের জন্য শাস্তি প্রদান করা হবে না।–সারাকশী, সিয়ার আল করীম, ৪র্থ ১০৮।

রাষ্ট্রের যিনি প্রধান তাকেও ইসলামী আইন কোনো রকম ছাড় দেয়নি। রাষ্ট্রের একজন সাধারণ নাগরিকের মতো প্রয়োজনবোধে তাঁকেও বিচারকের নিকট জবাবদিহি করতে হয়। বস্তুতপক্ষে মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধান স্বদেশে আইনের ব্যাপারে কোনো বিশেষ সুবিধা না পান, তাহলে অন্য কোনো রাষ্ট্রপ্রধান বা রাষ্ট্রদূতকে কোনো রকম ছাড় দেয়া হবে এমনটি প্রত্যাশা করা একান্তই অনুচিত। মূলকথা হলো মেহমানকে তাঁর পদমর্যাদা ও যোগ্যতা অনুসারে সম্মান দেখাতে হবে। কিন্তু কোনোক্রমেই তাঁরা দেশের নিয়ম-শৃংখলা বা আইন-কানুনের উর্ধে থাকতে পারে না।

প্রাচীনকালের ঘটনাবলী থেকে ইসলামী ন্যায়বিচারের আরেকটি বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানা যায়। তৎকালীন সময়ে চুক্তিপত্রের বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার জন্য চুক্তিভুক্ত পক্ষসমূহ পরস্পরের পক্ষ থেকে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের যামিন রাখতো। সেক্ষেত্রে চুক্তিভুক্ত কোনো পক্ষ যদি জামিনে রাখা অন্য পক্ষের

কোনো লোককে হত্যা করতো, তাহলে দ্বিতীয় পক্ষও যামিনে রাখা প্রথম পক্ষের ব্যক্তির ওপর সে হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার অধিকার পেতো। হযরত মুআবিয়া (রা) এবং আল মনসুরের আমলেও চুক্তিভুক্ত পক্ষগুলোর মধ্যে যামিন রাখার অনেক ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু মুসলিম আইন বিশারদগণ এ ব্যাপারে অভিন্ন মতপোষণ করেন যে, যামিন রাখা শত্রুপক্ষের কোনো লোককে হত্যা করা যাবে না। কারণ এখানে যামিনে রাখা ব্যক্তি কোনো রকম বিশ্বাসঘাতকতা করেনি বরং বিশ্বাসভংগ করেছে সংশ্লিষ্ট রাজা-বাদশাহ বা রাষ্ট্রপ্রধান। কুরআন মজীদে একজনের অপরাধের জন্য অপরের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ এবং একজনের বদলে আরেকজনকে শাস্তি দেয়া অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছে।

যুদ্ধ সম্পর্কিত মুসলিম আইনগুলো মানবিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত। এখানে যোদ্ধা এবং যুদ্ধরত পক্ষ এ দুটির মধ্যে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। এখানে শিশু, মহিলা, বৃদ্ধ, অসুস্থ এবং ইবাদাতখানায় বসবাসরত ব্যক্তিদেরকে হত্যা করার অনুমোদন নেই। যুদ্ধ ঘোষণা দ্বারা যুদ্ধে লিপ্ত দেশের জনগণের উপর কোনো প্রকার হস্তক্ষেপ করা চলে না। যে হত্যা বা ধ্বংস সাধন একান্ত আবশ্যক সেগুলো ছাড়া অন্য সকল প্রকারের হত্যা বা ধ্বংস সাধন নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আবার এ হত্যাকাণ্ড বা ধ্বংস হতে হবে সর্বনিম্নমাত্রায়।

যোদ্ধাদের সাথে ভালো ব্যবহার করতে হবে। বিজয়ী সেনাদের আচরণকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য এ ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে যে, গনীমতের মাল হিসেবে যুদ্ধ ময়দান থেকে যিনি যা সংগ্রহ করবেন, তিনি তা পাবেন না। বরং এগুলো জমা হবে সরকারী কোষাগারে। যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সৈন্যদের মধ্যে পাঁচ ভাগের চার ভাগ বিলি-বন্টন করা হবে। সেনাপতি ও সাধারণ সৈন্যরা একই হারে পাবেন। অবশিষ্ট এক-চতুর্থাংশ সরকারী কোষাগারে জমা থাকবে।

কুরআন মজীদে শান্তি প্রতিষ্ঠার হুকুম দিয়ে বলা হয়েছে ঃ

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا - الانفال : ٦١

"তারা যদি সন্ধির দিকে ঝুঁকে পড়ে, তুমিও সন্ধির দিকে ঝুকবে।"

–সূরা আল আনফাল ঃ ৬১

নবী করীম (স) মক্কা বিজয়কালে কুরআন মজীদের এ নির্দেশের উপরই আমল করেছিলেন। তিনি মক্কাবাসীদের বলেছিলেন, "যাও তোমরা মুক্ত তোমরা স্বাধীন।"

কুরআন করীমে ওয়াদা পালনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ওয়াদা পালন করার কারণে যদি মুসলমানরা কোনো প্রকার বস্তুগত ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়, সে অবস্থাতেও ওয়াদা পালনের বিষয়টি অগ্রাধিকার পাবে। ইসলামী আইনের গুরুত্বপূর্ণ একটি শিক্ষা হলো নিরপেক্ষতা এমন কি ধর্মীয় কারণে চরম নির্যাতনের মুকাবিলায়ও ইসলাম আমাদেরকে নিরপেক্ষতার নীতি অবলম্বন করার মহান শিক্ষা দেয়। এরশাদ হচ্ছে ঃ

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يُهَاجِرُوْا مَالَكُمْ مِّنْ وَّلَايَتِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ حَتّٰى يُهَاجِرُوْا ۚ وَاِنِ اسْتَنْصَرُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ اِلَّا عَلٰى قَوْمٍۭ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۝

"যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে কিন্তু (ইসলামী রাষ্ট্রে) হিজরত করেনি, তাদের হিফাযতের ব্যাপারে তোমার কোনো দায়িত্ব নেই। কিন্তু যদি তারা দীনের নামে তোমার সাহায্য চায় তাহলে তাদেরকে সাহায্য করা তোমার দায়িত্ব। আর যাদের সাথে তোমার শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হয়েছে তাদের ব্যাপারে আলাদা। তোমরা যা কর আল্লাহ তা দেখেন।"

–সূরা আল আনফাল ঃ ৭২

উপসংহার

সংক্ষেপে বলা যেতে পারে যে, ইসলাম সকল মানুষের মধ্যে সাম্যের নীতিতে একটি বিশ্বসমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চায়। সেখানে বর্ণ, শ্রেণী বা দেশে দেশে কোনো ভেদাভেদ থাকবে না। এখানে বুঝিয়ে শুনিয়ে ধর্মান্তরের অবকাশ থাকবে। কিন্তু ধর্মীয় ব্যাপারে কোনো রকম জোরজবরদস্তি করা যাবে না। এখানে প্রত্যেককেই ব্যক্তিগতভাবে আল্লাহ তাআলার নিকট জবাবদিহি করতে হবে। ইসলামের দৃষ্টিতে সরকার হলো জনগণের আস্থাভাজন একটি প্রতিষ্ঠান। সেবা করাই এর মূল লক্ষ। এখানে প্রত্যেককেই জনগণের খাদেম হিসেবে কাজ করতে হয়। ইসলামের দৃষ্টিতে ভালো কাজের আদেশ এবং অন্যায়ের প্রতিরোধ করা প্রতিটি মানুষের একটি সার্বক্ষণিক দায়িত্ব। আর আল্লাহ তাআলা আমাদের বিচার করবেন আমাদের আমল ও নিয়ত অনুসারে।

❑

নবম অধ্যায়

বিচার ব্যবস্থা

স্মরণাতীতকাল থেকে মানব সমাজে আইন চালু রয়েছে। প্রতিটি জাতি বা গোষ্ঠীই এ ব্যাপারে কিছু না কিছু অবদান রেখেছে। তবে মুসলমানদের অবদান সবচেয়ে বেশি এবং তাৎপর্যপূর্ণ।

আইনের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি

প্রাচীনকালের প্রতিটি সভ্য জাতিরই কতগুলো নির্দিষ্ট আইন ছিলো। তবে কোনো আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়নি। ইসলামই আইনকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর সংস্থাপন করেছে যা ফকীহগণের দ্বারা বিন্যস্ত হয়েছে। ইমাম শাফেঈ রচনা করেন 'রিসালা'। এ গ্রন্থের বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিকে বলা হয়েছে 'উসূলে ফিক্হ। এর অর্থ আইনের মূলসূত্র। 'উসূলে ফিক্হ' হতেই মানুষের আচার-আচরণ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিধি-বিধান ও আইন-কানুনের উৎপত্তি। তাছাড়া আইনের দর্শন, উৎস, আইন প্রণয়ের নীতি ও কৌশলের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, প্রয়োগ-পদ্ধতি প্রভৃতি বিষয়গুলো 'উসূলে ফিক্হ'-এর অন্তর্ভুক্ত। এটা স্পষ্ট যে, আইন প্রণেতাগণ কুরআনুল করীমের এ আয়াত দ্বারা বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন ঃ

وَأُدْخِلَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ

خٰلِدِيْنَ فِيْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ ط تَحِيَّتُهُمْ فِيْهَا سَلٰمٌ ○ - ابرهيم : ٢٣

"যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদেরকে দাখিল করা হবে জান্নাতে যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা স্থায়ী হবে তাদের রব-এর অনুমতিক্রমে। সেখানে তাদের অভিবাদন হবে সালাম।"

আল্লাহ আরো বলেন ঃ

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ اَصْلُهَا ثَابِتٌ وَّفَرْعُهَا

فِى السَّمَاءِ ○ - ابرهيم : ٢٤

"তুমি কি লক্ষ কর না আল্লাহ কিভাবে উপমা দিয়ে থাকেন ? সৎবাক্যের তুলনা উৎকৃষ্ট বাক্য যার মূল সুদৃঢ় আর শাখা-প্রশাখা ঊর্ধে বিস্তৃত।"–সূরা ইবরাহীম ঃ ২৪

নিয়ত

বিভিন্ন সময়ে আইনের মৌলিক ধারণার সাথে কতকগুলো নতুন বিষয় যুক্ত হয়েছে। তন্মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হলো, "প্রতিটি কাজের পশ্চাতে রয়েছে একটি উদ্দেশ্য ও লক্ষ। এ ধারণাটি খুবই স্পষ্টভাবে বিধৃত হয়েছে রাসূলে করীম (স)-এর একটি হাদীসের মধ্যে। নবী করীম (স) বলেছেন যে, প্রতিটি কাজ বা আমলকে বিচার করা হবে নিয়ত অনুসারে।এ কারণেই মুসলমান বিচারক উদ্দেশ্য প্রণোদিত অপরাধ ও অনিচ্ছাকৃত অপরাধকে কখনো একই পর্যায়ের বলে মনে করে না।

রাষ্ট্রের লিখিত সংবিধান

লক্ষণীয় বিষয় এই যে, ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মাদ (স) ছিলেন উম্মী। তাঁর ওপর প্রথম যে ওহী নাযিল হয়েছিলো সেখানে কলমের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করা হয়েছে। কলমকে ঘোষণা করা হয়েছে অজানা বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের মাধ্যম এবং আল্লাহ্ তাআলার বিশেষ রহমত হিসেবে। এতে বিস্মিত হবার কিছু নেই যে, রাসূলে করীম (স) যখন জনগণকে একটি রাষ্ট্রীয় সংগঠনের মধ্যে নিয়ে এলেন তখন তিনি একটি লিখিত সংবিধান জারী করলেন। শুরুতে মদীনা ছিলো একটি নগর রাষ্ট্র। কিন্তু মাত্র দশ বছর পর নবীজির ইন্তেকালের সময়ে সমগ্র আরব ভূখণ্ড, ইরাকের দক্ষিণাংশ ও ফিলিস্তিন ইসলামী হুকুমতের আওতাভুক্ত হয়। পরবর্তী ১৫ বছরের মাথায় খলীফা উসমান (রা)-এর শাসনকালে ইসলামের ইতিহাসে ঘটে গেলো আরো বিস্ময়কর ঘটনা। মুসলিম বাহিনী একদিকে আন্দালুসিয়া (স্পেন) অভিযান চালায় অপরদিকে তারা চীন অধ্যুষিত তুর্কীস্তানে ঢুকে পড়ে এবং উভয় সীমান্তের মধ্যবর্তী অঞ্চল চলে আসে মুসলিম শাসনে।

রাসূলে করীম (স)-এর দেয়া লিখিত সংবিধানটি এখন পর্যন্ত হুবহু সংরক্ষিত আছে। সেই সংবিধানের মোট ধারার সংখ্যা ৫২টি। সংবিধানের আলোচ্য সূচিও খুবই ব্যাপক ও বিস্তৃত। শাসক ও জনগণের দায়িত্ব ও কর্তব্য, আইন প্রণয়ন ও প্রশাসন ব্যবস্থা, বিচার ব্যবস্থা, প্রতিরক্ষা, অমুসলিমদের সাথে আচরণ বিধি, সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং তৎকালীন সমাজের চাহিদা প্রভৃতি বিষয়গুলো ছিলো এর অন্তর্ভুক্ত। এ সংবিধানটি জারী করা হয়েছিলো হিজরী প্রথম বর্ষে ৬২২ খৃস্টাব্দে।

সার্বজনীন আন্তর্জাতিক আইন

দুর্ভাগ্যবশত মানবসমাজ বার বার যুদ্ধ বিবাদে লিপ্ত হয়েছে এবং যুদ্ধের সময় কোনো পক্ষের নিকট থেকেই যুক্তিসংগত ব্যবহার আশা করা যায়

না। সে নিজের প্রতিও ইনসাফ করে না, প্রতিপক্ষের প্রতি সুবিচার করে না। বস্তুতপক্ষে যুদ্ধ মানেই অস্তিত্বের লড়াই এর সাথে জড়িয়ে আছে জীবন মৃত্যুর প্রশ্ন। সামান্য ভুল বা বিচ্যুতির কারণে যুদ্ধের ফলাফল খুবই ভয়াবহ হয়ে থাকে। সে কারণেই স্বাধীন নরপতি বা রাষ্ট্র প্রধানগণ যুদ্ধের সময় শত্রু সেনাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের এখতিয়ার নিজেদের হাতে রাখেন। তাঁরা ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকেন নিজেদের বুদ্ধি বিবেচনা অনুসারে।

মুসলমানগণই সর্বপ্রথম এ বিষয়গুলোকে একটি আইনগত ভিত্তি দিয়েছেন, এগুলোকে প্রতিষ্ঠা করেছেন আন্তর্জাতিক আইনের কাঠামোর ওপর। ফলে আইন-কানুন বা বিধি-ব্যবস্থাগুলো মুক্তি পেয়েছে রাজ-রাজাদের নিত্য পরিবর্তনশীল খেয়ালীপনা থেকে। তাছাড়া তারা আন্তর্জাতিক আইনকে প্রতিষ্ঠা করেন একটি স্বতন্ত্র বিজ্ঞান হিসেবে এবং এ জাতীয় লেখালেখিগুলো যত প্রাচীনই হোক না কেন, ভবিষ্যত বংশধরদের জন্য তারা এগুলো রেখে গেছেন অতি যত্নের সাথে। এ সমস্ত খ্যাতিমান লেখকদের মধ্যে ইমাম আবু হানীফা, ইমাম মালিক, ইমাম আবু ইউসুফ, মুহাম্মাদ আশ-শায়বানী, ইমাম জা'ফর, ওয়াকিদী বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ। তাঁদের ভাষায় এ বিষয়গুলোকে বলা হয় 'সিয়ার'। এর অর্থ রাষ্ট্রনায়ক বা রাষ্ট্রপতির আচরণ। সাধারণ আইন-কানুনগুলোর প্রাচীন রচয়িতাগণের মধ্যে যায়েদ ইবনে আলীর নাম বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ। তাঁর রচনাগুলো এখনো সংরক্ষিত আছে। তিনি ১২০/১২২ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। বস্তুতপক্ষে পরবর্তীকালের প্রত্যেক আইন রচয়িতাই এ বিষয়টিকে দেশের আইন কাঠামোর অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে উল্লেখ করেন। চুরি ডাকাতি, রাহাজানি, হাইজ্যাকিং সংক্রান্ত বিধি-বিধান সম্পর্কে আলোচনার পর যুদ্ধ-বিগ্রহ সংক্রান্ত নিয়ম-কানুনগুলোকে স্থান দেন। এর ফলে বিবাদে লিপ্ত সকল পক্ষেরই কতকগুলো অধিকার ও কর্তব্য নির্ধারিত হয়ে গেছে। ফলে কেউ এখন আর একতরফাভাবে কোনো কাজ করতে পারে না।

মুসলিম আইনের সাধারণ বৈশিষ্ট্যসমূহ

ইসলামী আইন সম্পর্কে অধ্যয়ন করলে প্রথমেই এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, ইসলামী আইনের ব্যাপ্তি রয়েছে মানব জীবনের সমগ্র অংশ জুড়ে। আধ্যাত্মিক এবং জাগতিক উভয় জীবনই এর অন্তর্ভুক্ত। আইন গ্রন্থের আলোচ্যসূচির শুরুতেই আসে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের রীতিনীতি সম্পর্কে। এমন কি সার্বভৌমত্বের মতো সাংবিধানিক বিষয়গুলোও এ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়। কারণ রাষ্ট্রের যিনি প্রধান তিনিই মসজিদের নামাযের ইমামের দায়িত্ব পালন করে থাকেন। সুতরাং এতে বিস্মিত

হওয়ার কিছু নেই যে, ইসলামী আইন গ্রন্থে ইবাদাত-বন্দেগী বা সালাত সম্পর্কে আলোচনা স্থান পাবে। কুরআনুল করীমের বহু স্থানে সালাত এবং যাকাতের কথা একই সাথে বলা হয়েছে।

সালাত হলো শারীরিক ইবাদাতের মাধ্যম। যাকাত এক ধরনের আর্থিক ইবাদাত।

আইন গ্রন্থের পরবর্তী আলোচ্যসূচির মধ্যে থাকে চুক্তিপত্রের নীতি ও এতদসংক্রান্ত খুঁটিনাটি বিষয়গুলো। এর পরেই আসে অপরাধ এবং শাস্তি সম্পর্কিত বিষয়। যুদ্ধ এবং বিদেশের সাথে শান্তি চুক্তির বিষয়টিও এর অন্তর্গত । উত্তরাধিকার বা উইল সম্পাদিত বিষয়াদি আসে সবার শেষে।

দেহ ও আত্মার সমন্বয়ে গড়ে ওঠে মানুষ। মানুষ যদি কেবলমাত্র বিষয় সম্পদ নিয়ে ব্যস্ত থাকে, অথবা সরকারের হাতে যে সম্পদরাজি রয়েছে সেগুলো কেবলমাত্র পার্থিব কাজেই ব্যবহার করা হয়, তাহলে মানুষের আধ্যাত্মিক জীবন এমনিতেই ম্লান হয়ে আসে। বস্তুতপক্ষে দেহ ও আত্মার এমন অসম অবস্থা মানুষের স্বাভাবিক ভারসাম্যকে বিপন্ন করে তোলে। পরিণতিতে তা মানব সভ্যতার ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। দেহ এবং আত্মার উন্নতি হতে হবে সমতালে এবং সামগ্রিকভাবে তার অর্থ এই নয় যে, যার যে বিষয়ে অভিজ্ঞতা নেই তিনিও সে বিষয়ে বিধি-বিধান জারি করা শুরু করবেন। স্মরণ রাখতে হবে যে, একজন কবি যতই ভালো কবিতা লিখুক না কেন, তাঁকে দিয়ে কখনো অস্ত্রোপাচার চলবে না। তেমনি মানব জীবনের প্রতিটি বিষয়ের জন্য অবশ্যই এক একজন একেক বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ও পারদর্শী লোক থাকবেন।

ইসলামী আইনের আরেকটি বৈশিষ্ট্য এই যে, এখানে অধিকার এবং দায়িত্ব পরস্পরের সাথে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত। শুধুমাত্র মানুষের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেই নয় বরং স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির সম্পর্কের বিষয়টি এই নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। ইসলামের ধর্মীয় প্রথা পদ্ধতিগুলো তদানুসারে নির্ধারণ করা হয়েছে। আল্লাহপাক মানুষকে পার্থিব জগতের বিষয়-সম্পদ ভোগ করার যে অধিকার দিয়েছেন এবং তার প্রেক্ষিতে সে যে দায়িত্ব পালন করে, সেটাই হলো ধর্মীয় আচার আচরণ। বস্তুতপক্ষে অধিকারের পাশাপাশি দায়িত্বের প্রশ্নটি উচ্চারিত না হলে মানুষ আর মানুষ থাকে না। সে তখন হয়ে যায় একটি হিংস্র জন্তু, একটি নেকড়ে অথবা শয়তান।

আইনের দর্শন

মুসলিম আইনবিদগণ আইনকে ভালো-মন্দ বা পাপ-পুণ্যের ভিত্তি হিসেবে স্থাপন করেছেন। যে কাজটি ভালো একজন মানুষের তা করা উচিত। আবার মন্দকাজ থেকে বিরত থাকা তার কর্তব্য। কোন কাজটি ভালো আর কোনটি মন্দ, তা কখনো খুবই সুনিশ্চিত ও স্পষ্ট থাকে। আবার ক্ষেত্র বিশেষে এটা থাকে খুবই আপেক্ষিক এবং অস্পষ্ট। এ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে বিচার সংক্রান্ত সমস্ত আদেশ-নিষেধগুলো পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে।

ক. এমন কতগুলো কাজ আছে সেগুলো সন্দেহাতীতভাবে ভালো। সেগুলো মানুষের জন্য অবশ্য কর্তব্য হিসেবে বিবেচিত এবং যে কোনো ব্যক্তিকে এগুলো আদায় করতে হয়।

খ. যে সমস্ত কাজ জরুরী এবং গুরুত্বপূর্ণ, সেগুলো পালন করার ব্যাপারেও তাকীদ রয়েছে এবং এগুলো খুবই উপকারী বলে বিবেচিত।

গ. আবার এমন কতগুলো কাজ আছে সেগুলোর ক্ষেত্রে ভালো ও মন্দের বিষয়টি সমান সমান অথবা এগুলোর সাথে ভালো-মন্দের কোনো সংযোগ নেই, এ কাজগুলো পালন করা বা না করার বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তির ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। এ জাতীয় কাজের ক্ষেত্রে ইসলামী আইনে বিশেষ কোনো নির্দেশ থাকে না।

ঘ. পক্ষান্তরে যে কাজগুলো সম্পূর্ণরূপে এবং নিশ্চিতভাবেই খারাপ ও অনিষ্টকর সেগুলো করার ব্যাপারে মানুষকে নিষেধ করা হয়েছে।

ঙ. আবার এমন কতগুলো কাজ আছে যেগুলো প্রকারান্তরে মানুষকে খারাপের দিকে নিয়ে যায়, এ জাতীয় কাজগুলোকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। ইসলামী আইনমতে এগুলো তিরস্কার বা নিন্দাযোগ্য। বিধান অথবা আইনের উল্লেখিত পাঁচটি বিভাগকে ইচ্ছা করলে আরো কতগুলো বিভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে এ বিভাজনগুলোর মধ্যে পার্থক্য থাকবে খুবই সামান্য।

এ প্রসংগে ভালো ও মন্দের সংজ্ঞা সম্পর্কে দুটি কথা বলা আবশ্যক। কুরআনুল করীমের বহু স্থানে এ বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, মানুষকে অবশ্যই মা'রুফ বা ভালো কাজ করতে হবে এবং বিরত থাকতে হবে মুনকার বা মন্দ কাজ থেকে। মা'রুফ বা ভালো কাজটি হলো মঙ্গলজনক এবং প্রত্যেকের দৃষ্টিতেই তা কল্যাণকর। বিচার-

বিবেচনা এবং যুক্তির নিরিখেও এটা মঙ্গলজনক এবং সে কারণেই এ কাজ গুলো করার ব্যাপারে নির্দেশ রয়েছে। আর মুনকার বা মন্দ কাজগুলো নিন্দনীয়। প্রত্যেকের দৃষ্টিতে এগুলো খারাপ ও অকল্যাণকর। যে কোনো বিচার-বিবেচনার মাপকাঠিতে এগুলো পাপতুল্য। তাই এ কাজগুলো করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।

ইসলামের নৈতিকতার বিষয়টি প্রধানত মা'রুফ-মুনকার বা ভালো-মন্দের উপর ভিত্তি করে রচিত। পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, কুরআন মজীদে এমন বিষয় খুবই কমই আছে যেগুলোর ব্যাপারে কুরআনুল করীমে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে অথচ মানুষ সেগুলোকে নিষেধযোগ্য মনে করে না। উদাহরণ হিসেবে জুয়া-লটারী বা মদ্যপান প্রভৃতি বিষয়ের উল্লেখ করা যেতে পারে। তবু একথা সত্য যে পরিপক্ক মন দিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করলে এ সমস্ত আইনের অস্তিত্বের কারণ ও যৌক্তিকতা মানুষের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে। বস্তুতপক্ষে এটা হচ্ছে আইন প্রণেতা মহান আল্লাহর উপর মানুষের বিশ্বাসের গভীরতার ব্যাপারে। বলাবাহুল্য জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে তাঁর নির্দেশাবলী যে শুধুমাত্র কার্যকরই রয়েছে তাই নয়, এগুলো শাশ্বত এবং অনন্তকালের জন্য স্থিরীকৃত।

শাস্তি বা পুরস্কার

সকল মানুষের মেজাজ বা প্রকৃতি এক রকম নয়। রয়েছে বিরাট তারতম্য। ব্যাপক অর্থে মানুষের মেজাজকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে।

ক এক শ্রেণীর লোক আছে যারা খুবই ভালো এবং সকল প্রকার অসৎ চিন্তাকে পরিহার করে চলতে পারে। এরা খুব কম সময়ই অন্য কারো দ্বারা কোনো অসৎ কাজে প্ররোচিত বা বাধ্য হয়।

খ. আরেকটি দল আছে যারা এর ঠিক উল্টো এবং খুবই খারাপ। এমনকি তারা কঠোর নিয়ন্ত্রণ বা তত্ত্বাবধানকে পর্যন্ত সর্বতোভাবে পরিহার করার জন্য সচেষ্ট থাকে।

গ. তৃতীয় দলটির অবস্থান ঠিক মাঝামাঝি জায়গায়। যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের অন্তরে প্রতিশোধ বা পাল্টা আঘাতের ভীতি থাকে। ততক্ষণ তাদের আচার-আচরণ, চাল-চলন ভালো থাকে। কিন্তু যখনই তাদের অন্তরে এ চিন্তা জাগে যে, ধরা পড়ার বা চিহ্নিত হবার তেমন একটা সম্ভাবনা নেই। তখনই তারা অন্যায় ও অপকর্মে লিপ্ত হয়।

দুঃখজনক হলেও সত্য যে, মানব সমাজে প্রথম শ্রেণীর লোকের সংখ্যা খুবই কম। তাদের জন্য কোনো পথ প্রদর্শন অনাবশ্যক। তাছাড়া আইন অমান্য বা আইন ভংগের ব্যাপারে কোনো শাস্তিরও প্রয়োজন পড়ে না। অন্য দুটি শ্রেণীর জন্য শাস্তির ব্যবস্থা থাকা খুবই জরুরি এবং সমাজের বৃহত্তর স্বার্থেই এটা প্রয়োজন। একজন মানুষ বিভিন্ন কারণে অন্য কারো সাথে অসদাচরণ বা ক্ষতিকর কাজে লিপ্ত হতে পারে। এ কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে অসুস্থতা, মানব মনের পশুত্বের প্রভাব ও কুশিক্ষা ইত্যাদি।

আমার কথা এই যে, যারা খারাপ এবং অসৎ কাজে লিপ্ত, সমাজে তাদের সংখ্যা খুব বেশি নয়। তাদের আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণ এবং ক্ষতিকর কাজগুলো অবশ্যই প্রতিকার করার চেষ্টা করতে হবে। বেশিরভাগ লোক বিরাজ করছে ভালো ও মন্দের মধ্যবর্তী স্থানে। এখানে এদের চিহ্নিত করা হয়েছে তৃতীয় শ্রেণী হিসেবে। বস্তুত তারাই সমাজের বৃহদাংশ। তাদের নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজন শাস্তি। কিন্তু প্রশ্ন হলো শাস্তিটা কি ধরনের হবে ?

একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, যিনি নেতা বা প্রধান তার অন্তরে যদি কোনো কুমতলব থাকে এবং নিষিদ্ধ কোনো কাজে লিপ্ত হয়, তাহলে অনুরূপ কোনো কাজের জন্য অন্য কাউকে নিন্দা বা ভর্ৎসনা করার মতো তেমন একটা সাহস থাকে না। সে কারণেই ইসলাম এ জাতীয় অন্যায় অপকর্মের উৎস মূলেই আঘাত হেনেছে। স্পষ্টভাবে ঘোষণা দেয়া হয়েছে যে, রাষ্ট্রপতি বা নবী-রাসূল কেউ-ই আইনের শাসন থেকে মুক্ত নন। হযরত মুহাম্মাদ (স) যে শিক্ষা এবং আদর্শ আমাদের জন্য রেখে গেছেন, পরবর্তীকালে তার উত্তরাধিকারীগণ তাই অনুসরণ করেছেন অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে। এ থেকে এটা স্পষ্ট যে, রাষ্ট্রীয় আদালত বা বিচারকগণ রাষ্ট্রপ্রধানকে প্রয়োজনবোধে কৈফিয়ত তলব করতে পারবে এবং এ ব্যাপারে কোনো বাধা থাকবে না। ইসলামের ইতিহাসে দেখা গেছে যে, অপরাধী সাব্যস্ত হলে তাকে শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে বিচারকগণ কখনো কোনো রকম কুণ্ঠাবোধ করেননি।

•

অন্যান্য সভ্যতার মতো ইসলামেও দৈহিক বা বৈষয়িক শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে। এ প্রসংগে এখানে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেয়া আবশ্যক। এ ব্যবস্থা অনুসারে এমন কতগুলো কর্মসূচি ও প্রতিষ্ঠান রয়েছে যার মাধ্যমে দেশে আইন-শৃংখলা প্রতিষ্ঠা, নগরে ও শহরে দিন ও রাতে প্রহরার ব্যবস্থা, দেশের জনগণের পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে শান্তি ও সমতা সংরক্ষণ

ব্যবস্থাকে নিশ্চিত করা হয়। এখানে কেউ কোনো রকম উৎপীড়ন ও অনিষ্টের শিকার হলে অনায়াসেই সে আইন বা আদালতের আশ্রয় নিতে পারে। আর পুলিশ অভিযুক্তকে আদালতের সামনে হাযির হতে বাধ্য করবে এবং আদালতের রায়ই চূড়ান্তভাবে কার্যকর হবে।

কিন্তু ইসলামে সমাজের যে রূপরেখা দেয়া হয়েছে এবং নবী করীম (স) যে সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছেন, সেখানে আরেক ধরনের শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে যা দৈহিক বা বৈষয়িক শাস্তি অপেক্ষা অধিকতর কার্যকর ও ফলপ্রসূ। আর তাহলো আধ্যাত্মিক শাস্তি। বিচার সংক্রান্ত সমস্ত বিধিব্যবস্থা গ্রহণের সাথে সাথে ইসলাম তার অনুসারিদের মধ্যে জাগিয়ে দিয়েছে মৃত্যুর পর পুনরুত্থান, শেষ বিচার দিবস এবং পরকালের মুক্তি বা শাস্তির চিন্তা। সে কারণেই একজন মু'মিন নিজ থেকেই তাঁর দায়িত্ব কর্তব্যগুলো সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করে থাকেন। এমন কি অন্যায় আচরনে লিপ্ত হওয়ার মত অবাধ সুযোগ এবং ধরা পড়ার বা শাস্তিভোগ করার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা যখন ক্ষীণ, তখনো তিনি তাঁর দায়িত্ব ও কর্তব্যের ব্যাপারে যত্নশীল থাকেন। এমনকি হাজারো প্রলোভন এবং পূর্ণ নিরাপত্তার মধ্যে থেকেও অপরের প্রতি কোনো রকম অনিষ্ট করা থেকে বিরত থাকেন।

অর্থাৎ ইসলামে শাস্তির ব্যাপারে রয়েছে তিনটি ব্যবস্থা (ক) দৈহিক বা বৈষয়িক শাস্তি, (খ) আইন-কানুনগুলোর নিকট শাসক গোষ্ঠীর জবাবদিহি এবং (গ) আধ্যাত্মিক শাস্তি। বস্তুতপক্ষে এ ব্যবস্থাগুলো পরস্পরকে অধিকতর কার্যকর ও ফলপ্রসূ করে থাকে, নিশ্চিত করে থাকে আইন প্রতিপালনকে, সহজতর করে থাকে সকলের দায়িত্ব পালন ও অধিকার ভোগের বিষয়টিকে। যে সমাজে এ তিনটি ব্যবস্থা চালু আছে, সে সমাজ অন্য যে কোনো সমাজ অপেক্ষা অবশ্যই অধিকতর প্রগতিশীল ও সফলকাম।

আইন প্রণয়ন

আল্লাহকে মহান এবং সর্বোত্তম আইন প্রণেতা হিসেবে মেনে নেয়ার তাৎপর্য অত্যন্ত ব্যাপক ও বিস্তীর্ণ। এটা বুঝতে হলে আমাদেরকে কতগুলো প্রাসঙ্গিক বিষয় সম্পর্কে জানতে হবে।

আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়। তিনি কেবল স্রষ্টাই নন, তিনি সৃষ্টিরাজি প্রতিপালনও করেন, অর্থাৎ কোনো কিছু সৃষ্টি করার পর আল্লাহ সেই সৃষ্টির ব্যাপারে নির্লিপ্ত থাকেন না বা সেখান থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন না।

বস্তুতপক্ষে বিশ্বজগতের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্য এটা অত্যাবশ্যক। আল্লাহ্ তাআলা বিশ্বজগতের অতীত এবং চর্মচক্ষু দিয়ে কখনো তাঁকে দেখা যায় না। তিনি সর্বত্র বিরাজমান, সর্বশক্তিমান, দয়ালু এবং অতিশয় ন্যায়পরায়ণ। তাছাড়া তিনি মানুষকে বিবেক ও বিবেচনা শক্তি দিয়েছেন। সেই সাথে পরম অনুগ্রহ করে তাদের মধ্য থেকে তাদের জন্য পাঠিয়েছেন পথপ্রদর্শক। আল্লাহর মনোনীত এ পথ প্রদর্শকরাই হলেন নবী-রাসূল। মানব সমাজের জন্য যেটা সবচেয়ে বেশি উপকারী, যেটা অধিক গ্রহণযোগ্য সে বিষয়ে তাঁরা মানুষকে পথনির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ্ তাআলা বিশ্বজগতের অতীত, তিনি অশরীরী ও নিরাকার। তিনি বার্তাবাহক জিবরাঈল (আ)-এর মাধ্যমে তাঁর পবিত্র বাণী তাঁর মনোনীত নবী-রাসূলদের নিকট পাঠান।

আল্লাহ্ তাআলা কারো মুখাপেক্ষী নন, সবাই তাঁর মুখাপেক্ষী। তিনি অনাদি ও অনন্তকালব্যাপী বিরাজমান। অপরদিকে অব্যাহত বিবর্তন মানবজীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ্ তাআলার সিদ্ধান্ত ও উদ্দেশ্য অনড় এবং অপরিবর্তনীয়। একজন ব্যক্তির সাধ্যের মধ্যে যতটুকু কুলায় তিনি ঠিক সে পরিমাণ দায়িত্ব তার উপর ন্যস্ত করেন। ইসলামের সকল বিধানই ওহীর উপর প্রতিষ্ঠিত। আইনের ব্যাপারে এটা সর্বজন স্বীকৃত যে, সর্বশেষ যে আইন জারি করা হয়, তা পূর্ববর্তী আইনসমূহকে বাতিল করে দেয় এবং শেষের আইনটি পূর্ববর্তী আইনসমূহের স্থলাভিষিক্ত হিসেবে গণ্য হয়। অনুরূপভাবে সর্বশেষ যে ওহী নাযিল হয়েছে তা পূর্ববর্তী প্রত্যাদেশসমূহকে অকার্যকর করে দিয়েছে।

আরবী ভাষায় অবতীর্ণ কুরআনুল করীম হলো আল্লাহর কালাম। ওহীর মাধ্যমে এ কিতাব রাসূলে করীম (স)-এর উপর নাযিল হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে পথনির্দেশ। উপরন্তু আল্লাহ্ তাআলার প্রেরিত পুরুষ হিসেবে রাসূল (স) কুরআনের আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কখনো সংযোজন করেছেন আরো কতগুলো নির্দেশাবলী। রাসূলে করীম (স) প্রদত্ত ব্যাখ্যা এবং নির্দেশাবলীকে বলা হয় সুন্নাহ। অন্য কথায় রাসূলে করীম (স)-এর প্রিয় সাহাবীগণের মাধ্যমে তাঁর কথা ও কাজের যে বিবরণ পাওয়া গেছে তাই হলো হাদীস।

একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, কোনো কর্তৃপক্ষ যদি কোনো আইন জারী করে, তাহলে সে আইন কেবলমাত্র ঐ কর্তৃপক্ষ অথবা তাঁর চেয়ে উর্ধতন কোনো কর্তৃপক্ষ বাতিল করতে পারেন। সুতরাং কোনো আসমানী

প্রত্যাদেশ কেবলমাত্র পরবর্তী কোনো আসমানী প্রত্যাদেশ দ্বারাই রহিত করা সম্ভব। অনুরূপভাবে রাসূলে করীম (স) যে নির্দেশাবলী আমাদের জন্য রেখে গেছে, তা কেবলমাত্র তিনি সংশোধন করতে পারেন। আর সংশোধনের ইখতিয়ার রাখেন আল্লাহ্ তাআলা নিজে। কিন্তু প্রিয়নবী (স)-এর কোনো অনুসারী অথবা অন্য কারো পক্ষে রাসূলে করীম (স)-এর হাদীসসমূহের সংশোধনের ইখতিয়ার নেই।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, কোনো আইন বা নির্দেশ সংশোধন বা রহিত করার ক্ষেত্রে উপরে বর্ণিত বিধানকে তত্ত্বগতভাবে খুবই কঠোর মনে হবে। কিন্তু ব্যবহারিক জীবনের দিকে তাকালে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গী খুবই উদার বলে প্রতীয়মান হবে। কঠোরতার স্থলে সেখানে ফুটে উঠবে নমনীয় ভাব। বাস্তব পরিস্থিতি এবং সংকটের সাথে খাপ খাইয়ে চলার সুবিধার্থে ইসলাম মানুষকে এ ধরনের ছাড় দিয়েছে যেমন—

ক. আইনের ভিত্তি কুরআনুল করীম বা হাদীস যাই হোক না কেন, সমস্ত আইন-কানুন একই পর্যায়ের নয়। বিচার করলে দেখতে পাব যে, ইসলামের বিধি-বিধানগুলো মোটামুটি তিন শ্রেণীর। প্রথম শ্রেণীর বিধি-বিধানগুলো বাধ্যতামূলক। দ্বিতীয় শ্রেণীর বিধি-বিধানগুলো বাধ্যতামূলক নয়। এগুলোর ব্যাপারে শুধু তাকীদ রয়েছে। তৃতীয় শ্রেণীর বিধি-বিধানগুলো প্রতিপালনের বিষয়টি প্রধানত ব্যক্তির ইচ্ছার উপর নির্ভর করে।

প্রথম শ্রেণীর বিধি-বিধানের সংখ্যা খুবই সামান্য। দ্বিতীয় শ্রেণীর বিধি-বিধানের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশি। তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত বিধি-বিধানগুলোর সংখ্যা অগণিত।

খ. অধস্তন অধিকারী, আইন পরিবর্তন করতে পারে না, শুধু ব্যাখ্যা দিতে পারে। ইসলাম কোনো ব্যক্তি বিশেষকে আইনের ব্যাখ্যা দেয়ার একচ্ছত্র ক্ষমতা দেয়নি। বরং যে ব্যক্তি আইন সম্পর্কে বিশেষভাবে অধ্যয়ন করবে ও পারদর্শিতা অর্জন করবে সেই আইনের ব্যাখ্যা দেয়ার অধিকার পাবে। একজন অসুস্থ ব্যক্তি কখনো কবির পরামর্শ নেবে না। এমনকি সে যাবে না একজন নভেল পুরস্কার বিজয়ী সাহিত্যিকের কাছে। আবার একজন ব্যক্তি নামজাদা চিকিৎসকের পরিবর্তে একজন প্রকৌশলীর সাথে গৃহ নির্মাণ সম্পর্কে আলোচনা করবে। অনুরূপভাবে আইন সম্পর্কে ব্যাখ্যা দেয়ার জন্য ব্যক্তিকে আইন সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করতে হবে। পারদর্শিতা অর্জন ছাড়া যদি কেউ মতামত বা ব্যাখ্যা দেয়

তাহলে তা হবে একটি উদ্যোগ মাত্র। এমন অভিমত কখনো গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

বিশেষজ্ঞগণের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ আসমানী প্রত্যাদেশকে বাস্তব পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্য করে তোলে। হযরত মুহাম্মাদ (স) সর্বশেষ নবী। তাঁর ইন্তেকালের পর কোনো সমস্যা বা উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য আল্লাহ্ তা'আলার তরফ থেকে আর কোনো ওহী বা নির্দেশ পাওয়া যাবে না। আবার সকল মানুষ যেহেতু অভিন্নভাবে চিন্তা করে না, সেহেতু চিন্তা এবং ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বিভিন্নতা থাকবে। এমতাবস্থায় মানুষ যে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণকে বেশি যুক্তিসংগত মনে করে তাকেই গ্রহণ করবে। এভাবেই সৃষ্টি হয়েছে আইনের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা এবং মুসলমানরাও বিভক্ত হয়েছে বিভিন্ন দল উপদলে।

গ. নবী করীম (স)-এর একটি হাদীস থেকেও মুসলমানদের আইন প্রণয়নের কথা জানা যায়। হাদীসটি এ রকম, "কোনো ভুলের ব্যাপারে আমার উম্মত কখনো একমত হবে না। যেখানে ঐকমত্য নেই, স্বাভাবিকভাবেই সেখানে ভিন্নমত থাকবে।" অর্থাৎ এ হাদীসের মাধ্যমে নবী করীম (স) উম্মতগণকে ভিন্নমত প্রকাশের অনুমোদন দিয়েছেন। বস্তুতপক্ষে এটা এক ধরনের না সূচক সম্মতি। এ না-সূচক সম্মতির দুটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। প্রথমত এর ফলে ইসলামী আইনের বিকাশের সমূহ সম্ভাবনা থাকে। দ্বিতীয়ত ইসলামী আইনকে সমাজের নিয়ত পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির সাথে সংগতি বিধানে সহায়ক হয়।

বস্তুতপক্ষে মানুষের অনুসন্ধান স্পৃহার দ্বার কখনো রুদ্ধ হয় না। বরং এ হাদীসটি সম্ভবত এ নির্দেশ বহন করে যে, কোনো মতামত বা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণকে সর্বসম্মতভাবে বাতিল করা না হলে সে মতামত বিবেচনাযোগ্য হবে। অর্থাৎ ভিন্নমতই মানুষকে আরো অনুসন্ধান করার বা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ দিতে অনুপ্রাণিত করবে।

ঘ. এ প্রসংগে রাসূলে করীম (স)-এর জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। রাসূলে করীম (স)-এর বিশিষ্ট সাহাবী হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রা)-কে ইয়ামেনের প্রশাসক ও বিচারক নিয়োগ করেন। দায়িত্ব গ্রহণের জন্য মদীনা ত্যাগের পূর্বে তিনি নবীজীর সাথে সাক্ষাত করেন। তখন দুজনের মধ্যে যে কথাবার্তা হয় তা নিম্নরূপ ঃ

প্রিয়নবী (স) ঃ কিসের ভিত্তিতে তুমি মামলা মুকদ্দমার রায় দেবে ?

মুআয ইবনে জাবাল (রা) ঃ কুরআনুল করীমে উল্লেখিত বিধি-বিধান অনুসারে।

প্রিয়নবী (স) ঃ কুরআনে যদি কোনো নির্দেশ না পাও তাহলে কি করবে ?

মুআয (রা) ঃ সে ক্ষেত্রে আমি আল্লাহর রাসূল (স)-কে অনুসরণ করবো।

প্রিয়নবী ঃ সেখানেও যদি কোনো বিধান না পাও তাহলে কি করবে ?

মুআয (রা) ঃ হ্যাঁ, সে ক্ষেত্রে আমি নিজের বিচার-বিবেচনা অনুসারে ব্যবস্থা নেব।

মুআয (রা)-এর এমন জবাবে রাসূলে করীম (স) অত্যন্ত মুগ্ধ হলেন। আনন্দের সাথে বললেন, সমস্ত প্রশংসাই আল্লাহর। তিনি যেন তাঁর নবীর প্রতিনিধিকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন এবং তাঁর নবী যার উপর খুশী থাকেন তিনিও যেন তাঁর উপর খুশী থাকেন। অর্থাৎ একজন সৎ এবং বিবেকবান লোকের সাধারণ জ্ঞান এবং মতামত দেয়ার প্রচেষ্টা কেবল মাত্র আইনের উন্নয়ন ও বিকাশেই সাহায্য করে না, বরং এমন প্রচেষ্টা ব্যক্তির জন্য নবী করীম (স)-এর সন্তোষ ও সুপারিশ বয়ে আনে।

ঙ. স্মরণ করা যেতে পারে যে, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে যে আইন প্রণীত হয় তা পরিবর্তনশীল। নতুন কোনো সমস্যা সমাধানের জন্য কুরআনের কোনো আয়াতের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণপূর্বক হয়তো একটি আইন তৈরি করা হলো। এ কাজটি সম্পন্ন হলো একটি বিশেষ পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ায়। আবার হয়তো দেখা যাবে যে, পরবর্তীকালের আইনবিদগণ বিশ্লেষণের একই পদ্ধতি অনুসরণ করে, পূর্বের আইন বাতিল করে দিয়েছেন, তদস্থলে তৈরি করেছেন নতুন কোনো আইন।

সকলের সম্মতির ভিত্তিতে যে আইনটি পাশ করা হয় সেক্ষেত্রেও এ ধরনের পরিবর্তন আসতে পারে। তবে ব্যক্তিগত অভিমত পাল্টানোর জন্য সেখানে ব্যক্তিই যথেষ্ট। আর সর্বসম্মত একটি অভিমতের রদ-বদলের জন্য আরেকটি সর্বসম্মত অভিমত আবশ্যক।

এ প্রসংগে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, উপরের এ আলোচনা শুধুমাত্র আইনবিদদের তৈরি আইনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কুরআন বা হাদীসে বর্ণিত বিধি-বিধানের বেলায় এ নিয়ম প্রযোজ্য নয়। কারণ আল্লাহ তাআলার জারীকৃত আইন কেবলমাত্র তিনি নিজে রদ করতে পারেন। অন্য কারো

পক্ষে তা সম্ভব নয়। আবার নবী করীম (স) যে বিধান জারী করেছেন, তা কেবলমাত্র নবী করীম (স) বা আল্লাহ তাআলাই বাতিল বা পরিবর্তন করতে পারেন। অধস্তন কোনো কর্তৃপক্ষ, কোনো আইন বিশারদ বা সংসদের পক্ষে তা সম্ভব নয়।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, যারা বিদ্বান, যাদের বিশেষ পারদর্শিতা আছে ইসলাম তাদেরকেই আইন প্রণয়নের ক্ষমতা অর্পণ করেছে। তারা সরকারের ছত্রছায়ায় কাজ করেন না। ফলে তারা সরকারের প্রভাববলয় থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। এ সমস্ত বিদ্বানদের প্রণীত আইন রাজনীতির প্রভাবে কখনো বিপন্ন হয় না। অথবা ব্যক্তি বিশেষের, এমনকি রাষ্ট্রপ্রধানের স্বার্থ সংরক্ষণেও কোনো কাজে আসে না।

আইন বিশারদগণের কেউ কারো অপেক্ষা ছোট বা বড় নন। তাদের প্রত্যেকেই একে অপরের অভিমতকে স্বাধীনভাবে সমালোচনা করতে পারেন। ফলে যে কোনো একটি সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা শুরু করলেই তার খুঁটিনাটি সমস্ত বিষয়গুলো আলোচনার মধ্যে এসে যায় এবং এভাবেই খুঁজে পাওয়া যায় সমস্যার সর্বোত্তম সমাধান।

ইসলামী আইন সর্বাংশে কঠোর ও অপরিবর্তনশীল নয়। তার চেয়ে বড় কথা ওহীর উপর ভিত্তি করে রচিত হওয়ার কারণে মুসলমানগণ ইসলামী আইনের প্রতি থাকেন খুবই শ্রদ্ধাশীল। আর বিধি-বিধানগুলো প্রতিপালন করেন অত্যন্ত নিষ্ঠা, যত্ন ও সচেতনতার সাথে।

বিচার বিভাগের প্রশাসন ব্যবস্থা

কুরআনের আইনের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে, এখানে বিভিন্ন সম্প্রদায় বিচার আচারের ক্ষেত্রে পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করে থাকে। বস্তুতপক্ষে ইসলাম জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলের উপর কুরআনী আইনকে বাধ্যতামূলকভাবে চাপিয়ে দেয় না। বরং ইসলামী বিধান মতে খৃস্টান-ইহুদী এবং অন্যান্য ধর্মের নিজস্ব আদালত থাকবে। আদালত-গুলোতে সংশ্লিষ্ট ধর্মাবলম্বীরা কাজ করবেন বিচারক হিসেবে। ফৌজদারী বা দেওয়ানী মামলার বিচার নিজ নিজ ধর্মের আইন-কানুন দ্বারা পরিচালিত হবে। অবশ্য কোনো বিবাদের সাথে বিভিন্ন ধর্মের লোকেরা জড়িয়ে গেলে আন্তর্জাতিক আইন দ্বারা তা নিষ্পত্তি করা হবে। দেশের সকল নাগরিক ক্ষমতাসীন সম্প্রদায়ের সকল নাগরিকদের স্বার্থ সংরক্ষণের নিশ্চয়তা দেয়।

মুসলিম সমাজে ইসলামী আইনের প্রয়োগ ঘটে খুবই সহজভাবে এবং দ্রুততার সাথে। বিশেষ করে এখানে সাক্ষীর সততার উপর যে গুরুত্ব আরোপ করা হয় তা উল্লেখ করার মতো। বস্তুতপক্ষে মুসলিম সমাজের প্রতিটি লোকালয়ের বিচারালয়গুলো স্থানীয় অধিবাসীদের আচার-আচরণ ও স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে রেকর্ড পত্র সংরক্ষণ করে। কার সাক্ষী গ্রহণযোগ্য অথবা কার সাক্ষী গ্রহণযোগ্য নয়, তা নিরূপণের জন্য এটা প্রয়োজন। কুরআনুল করীমে এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। কেউ যদি পূর্ববর্তী কোনো রমণীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে এবং সাক্ষ দ্বারা তা প্রমাণ করতে না পারে তাহলে অপবাদ আরোপকারীই যথারীতি শাস্তি পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

আইনের উৎপত্তি ও বিকাশ

রাসূলে করীম (স) সাহাবীগণকে দুনিয়া ও আখেরাতের যাবতীয় বিষয় শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি আরো শিক্ষা দিয়েছেন মানব জীবনের বিভিন্ন কাজকর্মের নিয়মাবলী। এর ব্যাপ্তি রয়েছে ব্যক্তিগত তথা সামাজিক, পার্থিব তথা আধ্যাত্মিক জীবন জুড়ে। তাছাড়া তিনি একটি রাষ্ট্র কায়েম করেছেন। তিনি নিজেই ছিলেন এ রাষ্ট্রের প্রশাসক। তিনি তাঁর নেতৃত্বাধীনে সুসংগঠিত একটি সেনাবাহিনী প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বিভিন্ন দেশের রাজা বাদশাহদের সাথে বৈদেশিক সম্পর্কস্থাপন করেন। তিনি নিজেই ছিলেন এর নিয়ন্ত্রক ও পরিচালক। এমনকি দেশের মধ্যে কখনো বিবাদের সূত্রপাত ঘটলে, তিনি নিজেই তাঁর বিচার করতেন, তাঁর সমাধান দিতেন। সে কারণে ইসলামী আইনের উৎপত্তি ও বিকাশ সম্পর্কে জানতে হলে প্রথমেই তাকাতে হয় নবী করীম (স)-এর জীবন ও কর্মের দিকে।

রাসূলে করীম (স) মক্কার এক অতি সম্ভ্রান্ত বণিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাদেরকে বলা হত কুরাইশ। বাণিজ্য কাফেলারও প্রধান নেতৃত্ব ছিলো এই কুরাইশ বংশের হাতে। যৌবনের প্রাক্কালে রাসূল (স) ইয়ামেন, পূর্ব আরব ও ফিলিস্তিনের বিভিন্ন মেলা এবং বাণিজ্য কেন্দ্র সফর করেন। মক্কায় অন্যান্য বণিকগণ অবশ্য বাণিজ্য উপলক্ষে ইরাক, মিসর আবিসিনিয়া পর্যন্ত সফর করতো। নবুয়াত প্রাপ্তির পর তিনি যখন দাওয়াতী কাজে মনোনিবেশ করেন, তখন কুরাইশরা তাকে হিজরত করতে বাধ্য করে। তিনি মদীনায় হিজরত করেন। কৃষি ছিলো মদীনাবাসীদের জীবিকার প্রধান অবলম্বন। ব্যবসাকেন্দ্রিক মক্কা ছেড়ে কৃষিপ্রধান মদীনায় এসে প্রথমে তিনি একটি নগর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীতে তিনি

এটিকে রূপান্তর করেন একটি পরিপূর্ণ রাষ্ট্রে। তাঁর জীবদ্দশায় এ রাষ্ট্র সমগ্র আরব উপদ্বীপ, ইরাকের দক্ষিণাংশের কিছু অংশ এবং ফিলিস্তিন পর্যন্ত ব্যাপ্তি লাভ করে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কাফেলাগুলো আরবের মধ্য দিয়েই যাতায়াত করত। একথা সকলের জানা যে, রোমানরা আরবের বেশ কিছু অঞ্চল গ্রাস করে রেখেছিলো এবং সেখানে প্রতিষ্ঠা করেছিলো কতগুলো কলোনী বা আশ্রিত রাজ্য।

এ সময়ে আরবের, বিশেষ করে পূর্ব আরবের মেলা ও বিপণী কেন্দ্রগুলো ছিলো খুবই জমজমাট ও আকর্ষণীয়। প্রতি বছর সুদূর চীন ও ভারতের ব্যবসায়ীরা পর্যন্ত ছুটে যেতো আরবে। আল-কালবী এবং আল-মাসউদীর বর্ণনানুসারে পূর্ব ও পশ্চিমের ব্যবসায়ীদের সমাবেশ ঘটত এ সমস্ত মেলা ও বাজারগুলোতে।

আরবে কেবলমাত্র যাযাবর শ্রেণীর লোকেরাই বসবাস করতো না। স্থায়ীভাবে বসবাসকারী লোকের সংখ্যা ছিলো উল্লেখযোগ্য। এদের মধ্যে ইয়ামেন এবং লিহ্যিয়ানাইটস্-এর সভ্যতা বিশেষ খ্যাতি লাভ করে। ইতিহাস সাক্ষ দেয় যে, এথেন্স ও রোমের মতো প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ নগরী প্রতিষ্ঠার পূর্বে এ সভ্যতা গড়ে উঠেছিলো।

ইসলামী আইন-কানুন বলবত হওয়ার সাথে সাথে প্রচলিত আইন-প্রথাদি রূপান্তরিত হয়ে যায়। আদর্শ কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। নবী করীম (স) সাহাবীদের এবং রাষ্ট্রের অন্যান্য নাগরিকের জন্য কেবল রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানই ছিলেন না ; বরং পুরাতন রীতিগুলো সংশোধন করে তিনি জারী করেন সম্পূর্ণ নতুন আইন-কানুন।

আল্লাহর নবী হওয়ার কারণে হযরত মুহাম্মাদ (স) একটি বিশেষ পদমর্যাদার অধিকারী ছিলেন। সবাই তাঁকে জীবন-প্রাণ দিয়ে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করতেন। শুধুমাত্র তাঁর কথা বা নির্দেশাবলী নয় ; বরং তাঁর দৈনন্দিন জীবনের কার্যাবলীগুলো পর্যন্ত আইনে পরিণত হয় এবং এ আইনগুলোর ব্যাপ্তি রয়েছে মুসলমানদের জীবনের সর্বক্ষেত্রে। কখনো আবার এমন হয়েছে যে, সাহাবীরা প্রিয়নবী (স)-এর উপস্থিতিতে কতগুলো দেশজ রীতিনীতি প্রতিপালন করেছেন। কিন্তু নবীজী সেগুলোর ব্যাপারে নীরব ও নিশ্চুপ থেকেছেন। ধরে নেয়া হয় যে, এ সমস্ত দেশজ আচার অনুষ্ঠানের ব্যাপারে নবীজীর কোনো অসম্মতি বা আপত্তি নেই। অর্থাৎ এ তিনটি স্তরেই ইসলামী আইনের বিকাশ লাভ করেছে। সংক্ষেপে উৎসগুলো হলোঃ (ক) প্রিয়নবী (স)-এর কথা। ওহী হলো এর ভিত্তি। (খ) তাঁর কার্যাবলী।

(গ) সাহাবীগণের রীতিনীতি ও কার্যাবলী, যেগুলোর ব্যাপারে প্রিয়নবী (স)-এর মৌন সম্মতি রয়েছে।

আইনের ক্রমবিকাশের আরো একটি ধারা রয়েছে। এমন কতগুলো বিষয় রয়েছে যেগুলো সম্পর্কে কুরআন-হাদীসে কোনো স্পষ্ট বিধান নেই। সে সমস্ত ক্ষেত্রে আইন বিশারদ বা ফকিহ্গণ কুরআন হাদীসের সূত্র ধরে অবরোহমূলক সিদ্ধান্ত নিতেন। কখনো আবার আইনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে ব্যবস্থা নিতেন। নবী করীম (স)-এর জীবদ্দশাতেও এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে এবং এ ধরনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ বা সিদ্ধান্তগুলোও আইনের মর্যাদা লাভ করেছে।

রাসূলে করীম (স)-এর আমলেই বিচারকার্য সম্পন্ন করার জন্য বিচারক বা কাযী নিয়োগের নিয়ম চালু করা হয়। যেমন শুধুমাত্র গুরুত্বপূর্ণ প্রাদেশিক কেন্দ্রগুলোতে নয়, দূরবর্তী অঞ্চলগুলোর জন্য কাযী নিয়োগ করা হয়। হযরত মুআয (রা)-কে ইয়ামেনে কাযী নিয়োগ করে পাঠানোর সময় প্রিয়নবী (স) তাঁকে যে নির্দেশ দিয়েছিলেন তাঁর উল্লেখ আগেই করা হয়েছে। সেখানে দেখা গেছে যে, কাযী বা আইন বিশারদগণ অবরোহণ পদ্ধতিতে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন অথবা আইনের যে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ দেন সেটাও আইনের মর্যাদা লাভ করে।

ওহীর আলোকে নতুন কোনো আইন জারী করা যেতে পারে। আবার প্রচলিত আচার-আচরণ বা বিধি-ব্যবস্থাগুলো বাতিল বা সংশোধন করা যায়। রাসূলে করীম (স)-এর ওফাতের পর আসমানী প্রত্যাদেশ (ওহী) বন্ধ হয়ে যায়। ফলে রাসূলে করীম (স) যে আইন-কানুনগুলো রেখে গেছেন এবং আইনের উন্নয়নের জন্য যে নির্দেশনা দিয়েছেন সেটাই সুসংহত করেছে মুসলিম আইনকে। বলা আবশ্যক যে, আইনের উন্নয়ন বলতে রাসূলে করীম (স) যে বিধিবিধান জারী করে গেছেন সেগুলো অক্ষুণ্ন রেখে যেসব ক্ষেত্রে আইনের নিরবতা রয়েছে সেসব ক্ষেত্রে আইন জানা। বিশেষ কতগুলো বিষয়ে কুরআন মজীদে স্পষ্ট কতগুলো নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়েছে। ফলে বাদ বাকী বিষয়গুলোকে স্বাভাবিক নিয়মেই আইনসম্মত বলে ধরে নেয়া যায় অর্থাৎ যে বিধি-বিধানগুলো নবী করীম (স) কর্তৃক জারীকৃত আইন-কানুনের বিরোধী নয় সেগুলোই অনুমোদিত এবং এগুলোর সমন্বয়ে গড়ে উঠে ইসলামী আইন। অবশ্য নতুন আইন তৈরির ক্ষেত্রে মুসলিম আইন বিশারদগণ বিদেশী আইন-কানুন ও রীতি-নীতিগুলো বিচার-বিবেচনা করে থাকেন। যে আইন-কানুন বা রীতি-

নীতিগুলোকে ইসলামের সাথে অসংগতিপূর্ণ দেখতে পান, সেগুলোকে তারা পরিহার করেন এবং অবশিষ্টগুলোকে গ্রহণ করেন ইসলামী আইন হিসেবে।

চমকপ্রদ আরো একটি উৎসের কথা কুরআন মজীদে উল্লেখ রয়েছে। পূর্ববর্তী নবীগণের ওপর যে আসমানী প্রত্যাদেশ নাযিল হয়েছিলো তার কিছু কিছু বিধি-বিধানের উল্লেখ করা হয়েছে। আসমানী প্রত্যাদেশগুলো হতে হবে নির্ভরযোগ্য ও সন্দেহের অতীত। তাছাড়া এ জাতীয় প্রত্যাদেশগুলোর ব্যাপারে অবশ্যই কুরআন-হাদীসের স্পষ্ট অনুমোদন থাকতে হবে। যেমন প্রতিশোধ গ্রহণের ব্যাপারে ইহুদীদের উপর বিধান ছিলো যে, "প্রাণের বদলে প্রাণ, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত এবং যখমের ব্যাপারে অনুরূপ যখম। কুরআনুল কারীমে সূরা আল মায়েদার ৪৫ আয়াতে এ বিধানটির উল্লেখ আছে। কিন্তু সেখানে সংক্ষেপে বলা হয়েছে যে, "আল্লাহ এ বিধানটি জারী করেছিলেন ইহুদীদের জন্য।" সেখানে এবং "তোমাদের ওপর" কথাটির উল্লেখ নেই। ফলে কুরআন মজীদে এসব বিধি-বিধান নজীর হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে।

ইসলামী শাসনামলে কাযী এবং আইন বিশারদগণ মতামত প্রকাশের ব্যাপারে ছিলেন সম্পূর্ণ স্বাধীন। তাঁদের উপর সরকার বা প্রশাসনযন্ত্রের কোনো হস্তক্ষেপ ছিলো না। আইনশাস্ত্রের উন্নয়ন ও বিকাশের ক্ষেত্রে এ পরিস্থিতি ছিলো খুবই সহায়ক। কিন্তু এর কতগুলো সমস্যা ছিলো। যেমন হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীতেই ইবনুল মুকাফ্ফা (র)-এর মত অভিজ্ঞ এবং উচ্চপদস্থ প্রশাসক 'কিতাবুস সাহাবা' শীর্ষক গ্রন্থে মুসলিম আইনের ব্যাপক মতপার্থক্যের বিস্তারিত বিবরণ দেন। এ মতপার্থক্য বিরাজ করছে দেওয়ানী, ফৌজদারী, ব্যক্তিগত আইন সহ আইনশাস্ত্রের সকল ক্ষেত্রে। তিনি খলীফার নিকট প্রস্তাব দেন যে, বিচার-আচার সংক্রান্ত ও আইনসমূহ সংস্কার করার জন্য উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন একটি কমিটি গঠিত হওয়া আবশ্যক। তারা আইনের ব্যাপারে বিরাজমান মতবৈষম্য দূর করে একই ধরনের বিধান চালু করবেন। কিন্তু তখন তাঁর প্রস্তাব গৃহীত হয়নি।

ইমাম আবু হানীফা (র) শ্রেষ্ঠ ফকীহ—আইন বিশারদ। তিনিও ছিলেন আইনের ব্যাপারে বলগাহীন স্বাধীনতার বিরোধী। রাজনৈতিক কোন্দল থেকে আইনকে মুক্ত রাখার ব্যাপারে তাঁর উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার অন্ত ছিলো না। তিনি একটি আইন একাডেমী প্রতিষ্ঠা করেন। একাডেমীর সদস্য সংখ্যা

ছিলো ৪০। তাদের প্রতক্যেই ছিলেন আইন সম্পর্কে অভিজ্ঞ ও পারদর্শী। একাডেমী সমসাময়িক কালের আইনসমূহ পর্যালোচনা ও মূল্যায়ণ করে বিধিবদ্ধ করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। তাছাড়া যে সমস্ত বিষয়ে কুরআন হাদীসের স্পষ্ট কোনো বিধান নেই অথবা যে সমস্ত সমস্যা সমাধানের কোনো পূর্ব দৃষ্টান্ত নেই, সে সমস্ত ক্ষেত্রেও তাঁরা আইন প্রণয়নের জন্য চেষ্টা করেন। ইমাম আবু হানীফা (র)-এর একজন জীবনীকার উল্লেখ করেছেন যে, তাঁর দ্বারা জারীকৃত আইনের সংখ্যা অর্ধমিলিয়ন (৫ লক্ষ)।

একই সময়ে ইমাম মালেক (র) মদীনা মুনাওয়ারায় এবং ইমাম আওযাঈ মদীনা এবং সিরিয়ায় অনুরূপ উদ্যোগ গ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁদের প্রত্যেকেই নিজের অবিজ্ঞতা এবং ব্যক্তিগত সংগ্রহের উপর নির্ভর করেন। ইমাম আবু হানীফা (র) আইনের ভিত্তি হিসেবে কুরআন ও হাদীসের উপর নির্ভর করেন। তবু একথা সত্য যে, আইনের ব্যাখ্যা প্রদানের ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানীফা (র) ইজ্‌তিহাদ বা যুক্তির উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তদস্থলে ইমাম মালেক (র) বেশি প্রাধান্য দিতেন মদীনার জনগণের রীতি ও প্রথাগুলোকে। অবশ্য সে সময়ে মদীনাবাসীদের মধ্যে হাদীস চর্চা ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করেছিলো।

রাসূলে করীম (স)-এর ওফাতের কয়েক মাসের মধ্যে কুরআনুল করীম সংকলন আকারে প্রকাশিত হয়। রাসূল (স)-এর জীবদ্দশাতেই কিছু সংখ্যক সাহাবী হাদীস সংগ্রহ করতে শুরু করেন। তাঁর ইন্তেকালের পর হাদীস সংগ্রহের কাজে আরো অনেকে অংশ নেন। নবী করীম (স)-এর সাহাবীর সংখ্যা ছিলো এক লাখের উপর। তাঁরা স্মৃতিশক্তি থেকে হাদীস বর্ণনায় অভ্যস্ত ছিলেন। কেউ কেউ আবার হাদীসগুলো লিখে রাখতেন। তাঁদের সংখ্যা পঞ্চাশের বেশি। অন্যান্যরা হাদীস বর্ণনা করতেন মৌখিকভাবে। বর্ণনার ধারা যাই হোক না কেন, ভাবী বংশধরদের জন্য সেগুলো সম্পদ হয়ে যায়। হযরত উমর (রা) ও হযরত উসমান (রা)-এর আমলে সাহাবায়ে কেরাম অন্তত তিনটি মহাদেশে ছড়িয়ে পড়েন এবং বসতি স্থাপন করেন। তাঁদের মাধ্যমে হাদীসসমূহ এ সমস্ত অঞ্চলে বিস্তার লাভ করে। পরবর্তী সময়ের মুসলমানগণ বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে ঘুরে হাদীসের সংকলন তৈরি করেন। সাহাবীগণের স্মৃতিচারণ ছিলো এর মূলভিত্তি। এ সংকলনগুলো ছিলো খুবই ব্যাপক এবং আইনের দিক থেকে এর গুরুত্ব অপরিসীম।

আমরা পূবেই দেখছি যে, ইসলামের প্রাথমিক অবস্থাতেই বিস্তীর্ণ অঞ্চলের উপর মুসলিম শাসন বিস্তার লাভ করে। অথচ কিছুকাল পূর্বেও বিভিন্ন নিয়মতান্ত্রিক সরকার এ সমস্ত অঞ্চল শাসন করতো। এদের মধ্যে ছিলো ইরানী, চৈনিক, ভারতীয়, বাইযানটাইন, গথিক এবং অন্যান্য। প্রথম যুগের মুসলমানগণ এ সমস্ত অঞ্চলের শাসনকাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। সে কারণেই বিশেষ কোনো বিদেশী আইন ব্যবস্থা মুসলিম আইনকে প্রভাবিত করতে পারেনি। মুসলিম আইনের স্থপতিগণের মধ্যে ছিলেন ইমাম আবু হানীফা (র), ইমাম মালেক (র), ইমাম শাফেঈ (র), জাফর সাদিক (র), আওযায়ী (র) প্রমুখ মনীষীবৃন্দ। ইমাম আবু হানীফা (র) ছিলেন পারস্য বংশোদ্ভূত এবং ইমাম মালেক, ইমাম জাফর সাদেক ছিলেন আরব বংশোদ্ভূত। ঐতিহাসিক আয যাহাবী (র)-এর বর্ণনানুসার আল-আওযায়ী ছিলেন সিন্ধী। ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, পরবর্তী বছরগুলোতে প্রতিটি দল-উপদল থেকেই এক-একজন মুসলিম আইনবিদের আবির্ভাব ঘটে। সে কারণেই মুসলিম আইনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো এর আন্তর্জাতিকতা। অর্থাৎ ভাষা, বংশ, গোত্র, স্থান, নির্বিশেষে সকল মুসলমানগণ আইনের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এদের মধ্যে ছিলেন স্পেন, পর্তুগাল, সিসিলি, ইউরোপীয় মুসলমানগণ। আরো ছিলেন চীন, আবিসিনিয়া, ভারত, পারস্য ও তুর্কীসহ আরো অনেক অঞ্চলের মুসলিম ব্যক্তিত্ব।

সংক্ষেপে বলা যেতে পারে যে, কুরআন মজীদ ও হাদীস শরীফের উপর ভিত্তি করে মুসলিম আইন গড়ে উঠেছে। মুসলিম আইনের বিকাশ ঘটে রাষ্ট্রের আইন হিসেবে এবং দেশের শাসন ব্যবস্থাও পরিচালিত হয় এ আইন অনুসারে। এমনকি মুসলমানদের শাসন ব্যবস্থা ব্যাপকতা লাভ করে, এর বিস্তার ঘটে আটলান্টিক থেকে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত সমগ্র অঞ্চলে, এ আইন পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি ও সংকটের সাথে অনায়াসে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। এমনকি চৌদ্দশত বছর পরেও এর গতিশীলতা বিন্দুমাত্র হ্রাস পায়নি। তাই দেখা যায়, যে সমস্ত মুসলিম দেশ বৈদেশিক শাসনাধীনে ছিলো যে সমস্ত অঞ্চলে কায়েম ছিলো বৈদেশিক বিচার ব্যবস্থা, সেসব দেশেও মুসলিম আইনের গুরুত্ব তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছে। মুসলিম আইন বিবেচিত হচ্ছে দেশ ও সমাজের কল্যাণকর প্রতিষ্ঠান হিসেবে। সে কারণেই মুসলিম দেশসমূহে মুসলিম আইন বা শরীআত ব্যবস্থা চালু করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

❐

দশম অধ্যায়

অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

সুষ্ঠ ও সুন্দর জীবন পরিচালনার জন্য ইসলাম স্পষ্ট পথনির্দেশ দিয়ে থাকে। এ পথনির্দেশ পাওয়া যাবে জাগতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের সকল পর্যায়ে এবং সমস্ত কাজকর্মের ক্ষেত্রে। এমনকি অর্থনৈতিক কার্যক্রমের ক্ষেত্রেও। কুরআন করীমের অসংখ্য আয়াতে অর্থনৈতিক কার্যাবলীর মৌলিক শিক্ষা সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে। স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে ঃ

وَلاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ اَمْوَالَكُمُ الَّتِىْ جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيَمًا وَّارْزُقُوْهُمْ فِيْهَا وَاكْسُوْهُمْ ـ النساء : ٥

"তোমাদের সম্পদ যা আল্লাহ্ তোমাদের জন্য উপজীবিকা করেছেন তা নির্বোধদের হাতে অর্পণ করো না।"—সূরা আন নিসা ঃ ৫

সূরা আল কাসাসে আরো বলা হয়েছে ঃ

وَلاَ تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ـ القصص : ٧٧

"দুনিয়ায় তোমার অংশ ভুলে যেও না।"—সূরা আল কাসাস ঃ ৭৭

তবে ইসলাম মানুষের ইহকাল ও পরকালের জীবনের উপর সমান গুরুত্ব আরোপ করে। কুরআনুল করীমে বলা হয়েছে যে, মানুষের মধ্যে যারা বলে—

رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا وَمَا لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ۝ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝ اُولٰٓـئِكَ لَهُمْ نَصِيْبٌ مِّمَّا كَسَبُوْا ط وَاللّٰهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ۝ ـ البقرة : ٢٠٠ـ٢٠١

"হে আমাদের প্রতিপালক। আমাদের এ দুনিয়ায় সবকিছু দাও। বস্তুত পরকালে তাদের জন্য কোনো অংশ নেই। বরং তাদের মধ্যে যারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক আমাদের ইহকালে কল্যাণ দাও এবং পরকালেও কল্যাণ দাও এবং আমাদের আগুন হতে রক্ষা কর। তারা যা অর্জন করেছে তার প্রাপ্য অংশ তাদেরই। বস্তুত আল্লাহ্ হিসেব গ্রহণে অত্যন্ত তৎপর।"—সূরা আল বাকারা ঃ ২০০-২০২

কুরআন মজীদের অন্যান্য আয়াতে আরো স্পষ্ট ও সহজভাবে বলা হয়েছে যে, ধরা বুকে, সমুদ্র বক্ষে এবং জান্নাতে আমরা যাকিছু দেখতে পাই এ সমস্তই মানুষের কল্যাণের জন্য আল্লাহ পাক সৃষ্টি করেছেন এবং এ সবকিছুই তিনি মানুষের অধীনস্ত করে দিয়েছেন। মানুষকে এগুলো সম্পর্কে জানতে হবে। এগুলো থেকে উপকৃত হতে হবে অত্যন্ত ন্যায়ানুগভাবে এবং তাকে বিবেচনায় আনতে হবে আখেরাতের চিন্তাকে।

অর্থনীতির মূলনীতি

কুরআন মজীদে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ইসলামের অর্থনৈতিক নীতির ব্যাখ্যা বিধৃত হয়েছে। কুরআন মজীদে এরশাদ হয়েছে :

كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةً بَيْنَ الْاَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ط

"তোমাদের সম্পদ যেন কেবলমাত্র তোমাদের বিত্তশালীদের মধ্যে আবর্তিত না হয়।"–সূরা আল হাশর : ৭

নীতিগতভাবে সকল মানুষের মধ্যে সম্পদ ও সুযোগ সুবিধার দিকে সমতা প্রতিষ্ঠা করতে পারলে তা খুবই ভালো হয়। কিন্তু মানব জাতির জন্য এটা কখনো অবিমিশ্র কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না।

কারণ প্রথমত সকল মানুষের বুদ্ধি ও বিবেচনাশক্তি প্রকৃতিগতভাবে সমান নয়। এমন কি কেউ যদি একদল লোককে পুরোপুরিভাবে সমান সুযোগ প্রদান করে, সেখানেও দেখা যাবে বিভিন্নতা। কিছুকালের মধ্যেই অপব্যয়ীরা অপব্যয়ের কারণে অসুবিধার মধ্যে নিপতিত হবে। তারা তখন তাদের ভাগবান সহকর্মীদের প্রতি তাকাবে ঈর্ষা ও বিদ্বেষের দৃষ্টিতে।

দ্বিতীয়ত দার্শনিক ও মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করলেও দেখা যাবে যে, মানব সমাজের সম্পদ ভোগ দখলের ব্যাপারে মানুষের মধ্যে বিভিন্নতা থাকা জরুরী। এর ফলে বিষয় সম্পদে যারা পিছিয়ে আছে তাদের মধ্যে যেমন উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকবে, তেমনিভাবে কঠোর পরিশ্রম করার ব্যাপারে উৎসাহ থাকবে ।

তৃতীয়ত একজনকে হয়তো বলে দেয়া হলো যে, তোমার যতটুকু কাজ করার কথা তার চেয়ে বেশি কাজ করলেও তোমাকে কোনো বাড়তি মুনাফা দেয়া হবে না। বরং নির্ধারিত কাজের বিনিময়ে তোমার জন্য যতটুকু বরাদ্দ আছে, তোমার প্রাপ্য হবে ততটুকু। তখন স্বাভাবিকভাবেই সে অলস ও কাজের প্রতি অমনোযোগী হয়ে পড়বে। ফলে ব্যক্তির মেধা ও বুদ্ধি নষ্ট হয়ে যাবে এবং এটা হবে মানব সমাজের জন্য খুবই দুর্ভাগ্যজনক।

একথা সকলেরই জানা যে, মানুষের জীবন ও জীবিকা ক্রমশঃ উন্নতির ধারায় এগিয়ে যায়। এজন্য তাকে আল্লাহর সৃষ্টিরাজির উপর আধিপত্য বিস্তার করতে হয়। এগুলোকে ব্যবহার করতে হয় যথাযথভাবে। কিন্তু পশুজগতের জীবন জীবিকায় তেমন কোনো পরিবর্তন ঘটে না। সৃষ্টির শুরুতে পশুজগত যেমন ছিলো এখনো মোটামুটি সেভাবে আছে। এ ধরনের পার্থক্যের কারণ হিসেবে জীববিজ্ঞানীগণ উল্লেখ করেছেন যে, মানব সমাজে একই সময়ে বিরাজ করছে পরস্পরের সাথে সহযোগিতা ও অবাধ প্রতিযোগিতা। কিন্তু পশুজগতে এ ধরনের কোনো সহযোগিতা বা প্রতিযোগিতা লক্ষ করা যায় না। পশুজগত ও মানব সমাজের বৈশিষ্ট্যগত এ তারতম্যের কারণেই মানব সমাজ এগিয়ে যায় ক্রমোন্নতির ধারায়। কিন্তু পশুজগত থেকে যায় আদিম অবস্থায়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, কুকুর, বিড়াল, সাপ প্রভৃতির মধ্যে বংশরক্ষার জন্য ক্ষণিক মায়া-মমতা থাকলেও তারা কখনো পরিবার গঠন করে না। কাক বা কবুতরের মধ্যে পরিবার গঠনের প্রবণতা লক্ষ করা যায়। তারা পরস্পরের সহযোগিতায় বাসা তৈরি করে বাচ্চা পাহারা দেয়। কিন্তু জীবন ও জীবিকার ব্যাপারে তারা যার যার উপর নির্ভর করে। পশু পাখিদের বেলায় উল্লেখযোগ্য পরিমাণ সহযোগিতা লক্ষ করা যায় মৌমাছি, পিপীলিকা ও উইপোকার মধ্যে। তারা সমবেতভাবে বসবাস করে। জীবন ও জীবিকার ব্যাপারে তাদের মধ্যে বিরাজ করে পূর্ণ সমতা। কিন্তু তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতার বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত। ফলে তাদের মধ্যে যারা অধিক পরিমাণ মেধাবী ও বুদ্ধিমান, অথবা যারা অতি মাত্রায় পরিশ্রমী তারা অন্যান্যদের চেয়ে কোনোক্রমেই বিন্দুমাত্র অধিক সুখী জীবন কাটাতে পারে না। সে কারণেই তাদের কোনো বিকাশ নেই অথবা জীবন ধারায় কোনো উন্নতি হয় না।

মানবেতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যাবে যে, যে কোনো অগ্রগতির বা আবিষ্কারের মূলে রয়েছে পরস্পরের মধ্যকার প্রতিযোগিতা এবং সমস্যা দূরীকরণের আকাঙ্ক্ষা। তাছাড়া একজন অপেক্ষা অন্য জনের প্রাচুর্য বা দারিদ্র্যের তারতম্যের কারণেও এটা হতে পারে। অবশ্য একথা সত্য যে, লাগামহীন স্বাধীনতা পেলেই দুষ্টবুদ্ধির মানুষগুলো অভাবী লোকদের শোষণ করতে শুরু করে এবং ক্রমান্বয়ে তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষ করে ছাড়ে। সে কারণেই প্রতিটি প্রগতিশীল সভ্যতা ও সমাজ ব্যবস্থায়ই জনগণের উপর কতগুলো দায়দায়িত্ব আরোপ করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এ জাতীয় দায়দায়িত্বের মধ্যে রয়েছে নিয়মিত কর প্রদান, শোষণ

বা পীড়নের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা, প্রতারণা থেকে বিরত থাকা ইত্যাদি। কখনো আবার নির্ধারিত দায়-দায়িত্বের অতিরিক্ত কতগুলো কাজের জন্য অনুপ্রাণিত করে থাকে। যেমন সেবামূলক কাজ, আল্লাহর রাস্তায় ব্যয়। (এতদসত্ত্বেও) একথা সত্য যে, ব্যক্তির চিন্তা ও কর্মের স্বাধীনতা যত বেশি হবে ব্যক্তি ততবেশি উপকৃত হবে। উপকৃত হবে প্রতিবেশী ও সমাজের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী—এটাই ইসলামের মূলনীতি এবং এটা প্রাকৃতিক নিয়মের সাথে পুরোপুরি সঙ্গিতপূর্ণ।

কতগুলো মৌলনীতির উপর ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সংস্থাপিত। ইসলাম ধনীর ধন-সম্পদে দরিদ্রের হক নির্ধারণ করে দিয়েছে যা আদায় করা বাধ্যতামূলক। যেমন-পশ্চাৎপদ গোষ্ঠীর স্বার্থে তাদের কর প্রদান করতে হয়। নিবৃত্ত থাকতে হয় নৈতিকতা বিরোধী কাজ ও কোনো শাসন শোষণ থেকে। মওজুদদারী ও সম্পদ জমা করে রাখা নিষিদ্ধ। তাছাড়া দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলোকে বাস্তবায়ন করার লক্ষে ইসলামে দ্বিবিধ ব্যবস্থা রয়েছে। একদিকে ইসলাম কতগুলো বিধি-বিধান ও নিষেধাজ্ঞা জারী করেছে। অপরদিকে ভালো কাজকে উৎসাহিত করার এবং আধ্যাত্মিক পুরস্কার লাভের নিশ্চয়তা দিয়েছে। এ জাতীয় কাজের মধ্যে রয়েছে বদান্যতা, সাদকা, দান-খয়রাত, কুরবানী ইত্যাদি।

ইসলামী অর্থব্যবস্থার আরো দুটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। প্রথমত ইসলামে নিম্নতম চাহিদার সাথে কাঙ্ক্ষিত চাহিদার একটি পার্থক্য নিরূপণ করা হয়েছে। তাছাড়া এখানে এমন কতগুলো নির্দেশ ও নিষেধাজ্ঞা রয়েছে যেগুলোর জন্য বৈষয়িক শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে। দ্বিতীয়ত কতগুলো নিষেধাজ্ঞা ও নির্দেশের জন্য কোনো শাস্তির ব্যবস্থা নেই। কিন্তু এ স্থানে ইসলাম অবিরত শিক্ষা ও উদ্বুদ্ধকরণের উপর গুরুত্ব আরোপ করে থাকে।

ইসলামী অর্থব্যবস্থা সম্পর্কে বিশদ আলোচনার পূর্বে নৈতিকতা সম্পর্কে দুটি কথা বলা আবশ্যক। কতগুলো উপমা উদাহরণ থেকেই নৈতিকতা ও প্রাসঙ্গিক বিষয়ে একটি স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে। ভিক্ষা করা বা কারো নিকট হাত পাতাকে ইসলামে অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় নিন্দা করা হয়েছে। ইসলামের দৃষ্টিতে এটা খুবই ঘৃণার কাজ। বলা হয়েছে যে, হাশরের ময়দানে এটা হবে তাদের জন্য খুবই লজ্জাজনক ব্যাপার। দান-খয়রাত করাকে ইসলাম অত্যন্ত সওয়াবের কাজ বলে ঘোষণা করেছে। যারা অপরের সাহায্যে এগিয়ে আসে তাদেরকে উচ্ছ্বসিত ভাষায় প্রশংসা করা হয়েছে। তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে মানবজাতির মধ্যে তারাই উত্তম যারা নিজের উপর অপরকে প্রাধান্য দেয় এবং দান-খয়রাত করে।

অনুরূপভাবে ইসলামে ধনলিপ্সা বা অপব্যয়কে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

একবার রাষ্ট্রীয় কাজে রাসূলে করীম (স)-এর বেশ কিছু অর্থের প্রয়োজন হয়। একজন সাহাবী উল্লেখযোগ্য পরিমাণ দান করেন। প্রিয়নবী (স) তাকে জিজ্ঞেস করেন, পরিবার পরিজনের জন্য কি রেখে এসেছেন ? সাহাবী বললেন—এক আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি আনুগত্য ও ভালোবাসা ছাড়া আর কিছু রেখে আসিনি। রাসূলে করীম (স) এ সাহাবীর জন্য আন্তরিক দোয়া এবং ভূয়সী প্রশংসা করেন।

আরেকটি ঘটনা। একবার একজন সাহাবী ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। প্রিয়নবী (স) তাকে দেখতে গেলেন। অসুস্থ সাহাবী তাঁকে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল। আমি প্রচুর বিষয় সম্পদের অধিকারী। আমি এ সবকিছুই জনগণের কল্যাণের জন্য দান করতে চাই। প্রিয়নবী (স) জবাবে বললেন, না। তোমরা আত্মীয়-স্বজনদের এমনভাবে রেখে যাও যাতে তারা স্বাধীনভাবে জীবিকা নির্বাহ করতে পারে। অন্যের উপর নির্ভরশীল করে রাখা বা অপরের নিকট হাত পাতার চেয়ে এটাই উত্তম। অসুস্থ সাহাবী তখন সম্পদের দুই-তৃতীয়াংশ দান-খয়রাত করার এবং এক ভাগ আত্মীয়-স্বজনদের জন্য রাখার প্রস্তাব করলেন। প্রিয় নবী (স) বললেন—এটাও অতিরিক্ত হয়ে যায়। সাহাবী তখন এক-তৃতীয়াংশ দান-খয়রাত করার জন্য প্রস্তাব দিলেন। জবাবে প্রিয়নবী (স) বললেন, হ্যাঁ, তা করতে পারো। তবে এক-তৃতীয়াংশ নেহায়েত কম নয়।—বুখারী

আরেকদিনের কথা প্রিয়নবী (স) তাঁর একজন সাহাবীকে খুবই দীনহীন পোশাকে দেখতে পেলেন। এ সম্পর্কে জানতে চাইলে সাহাবী বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমি আদৌ গরীব বা নিঃস্ব নই। আসলে আমি নিজে ভোগ করার চেয়ে গরীব-দুঃখীদের জন্য সম্পদ ব্যয় করাকে অধিক পসন্দ করি। জবাবে প্রিয়নবী (স) বললেন না, এটা ঠিক নয়। আল্লাহ্ তাআলার এটাই পসন্দ যে, তিনি তার বান্দাকে যে প্রাচুর্য দিয়েছেন, বান্দার জীবনে তাঁর ছাপ থাকবে।—আবু দাউদ ও তিরমিযী

এ সমস্ত ঘটনা ও নির্দেশাবলীর মধ্যে কোনো রকম পরস্পর বিরোধিতা নেই, বরং প্রতিটি ঘটনারই একটা প্রেক্ষাপট ও উপলক্ষ রয়েছে। বস্তুতপক্ষে উপরের এ বর্ণনা থেকে আমরা আমাদের নিম্নতম চাহিদা, সমাজের প্রতি কর্তব্য ও ব্যক্তিগত পসন্দ অপসন্দের সীমা সম্পর্কে জানতে পারি।

উত্তরাধিকার

ব্যক্তিমালিকানাধীন সম্পদ বিলি-বণ্টন বা হস্তান্তরের ব্যাপারে ব্যক্তির অধিকার রয়েছে। আবার সমাজের একজন সদস্য হিসেবে ব্যক্তির সম্পদের ওপর সমষ্টির অধিকার রয়েছে। মানবজাতির বৃহত্তর স্বার্থে এ দ্বিবিধ অধিকারকে যুগপৎভাবে বাস্তবায়ন করতে হয়। কিন্তু মেজায ও প্রকৃতিগতভাবে মানুষের মধ্যে রয়েছে ব্যাপক তারতম্য। এছাড়া অসুস্থতা বা বিভিন্ন দুর্ঘটনার কারণেও অনেক সময় মানুষের বিচার-বিবেচনা লোপ পায়। সে কারণেই সমষ্টির বৃহত্তর স্বার্থে ব্যক্তিমালিকানাধীন সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে কতগুলো নিয়ম-নীতি আরোপ করা অত্যাবশ্যক।

সম্পদের মালিকানা বদল তথা ব্যক্তির অধিকার সংরক্ষণের ক্ষেত্রে ইসলামে দুটি ব্যবস্থা রয়েছে।

প্রথমত মৃত ব্যক্তির সম্পদ ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের মধ্যে বিতরণ করাকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে

দ্বিতীয়ত ব্যক্তির খেয়াল-খুশীমত সম্পদ বিলি-বণ্টনের ওপরও কতগুলো বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়েছে।

মৃত ব্যক্তির বিষয়-সম্পদের মালিকানা লাভের জন্য উত্তরাধিকারীদের কোনো উইল বা ওসিয়ত দরকার হয় না। আইনের বলে প্রত্যেকেই যার যার অংশ পেয়ে যায়। কিন্তু মৃত ব্যক্তির সম্পদের ওপরে যাদের কোনো অধিকার নেই, তারা যদি সম্পদ পেতে চায়, তাহলে উইল বা ওসিয়তনামার প্রয়োজন পড়ে।

মৃত ব্যক্তি যে সম্পদ রেখে যায়, প্রথমেই তা থেকে তাকে দাফন-কাফন করা বাবদ প্রয়োজনীয় ব্যয় মিটানোর পর যে সম্পদ থাকে তা থেকে যদি মৃত ব্যক্তি দেনা রেখে যায় প্রথমে তা পরিশোধ করতে হয়। উত্তরাধিকারীদের অধিকারের উপর ঋণদাতারা এক্ষেত্রে অধিকতর অগ্রগণ্য হবে। তৃতীয় স্তরে আসে তার উইল বা ওসিয়ত বাস্তবায়নের প্রশ্ন। অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির যদি কোনো উইল বা ওসিয়ত থাকে তাহলে তার দাফনের খরচ বহন ও ঋণ পরিশোধের পরই ওসিয়ত কার্যকর করা হবে। এরপরই আসবে উত্তরাধিকারীদের অংশ লাভের প্রশ্ন। স্বামী বা স্ত্রী পিতামাতা এবং সন্তান-সন্ততিরা হলো প্রথম কাতারের উত্তরাধিকার। মৃত ব্যক্তির নিকটতম আত্মীয়-স্বজন না থাকলে তার ভাই-বোন এবং অন্যান্য দূরবর্তী আত্মীয়-স্বজন উত্তরাধিকার স্বত্ব লাভ করে। দূরবর্তী আত্মীয়দের মধ্যে চাচা-চাচী চাচাতো ভাইবোন প্রভৃতিও রয়েছে।

ইসলামের উত্তরাধিকার আইনের খুটিনাটি বিষয় সম্পর্কে জানতে হলে বিস্তারিত আলোচনা প্রয়োজন। এখানে কেবলমাত্র দুটি মৌলিক বিষয়ের প্রতি আলোকপাত করা হলো।

নিহত ব্যক্তির হত্যাকারী নিহত ব্যক্তির বিষয়-সম্পদের উত্তরাধিকারী হতে পারে না। এমনকি আদালত যদি এমন রায় দেয় যে, হত্যাকাণ্ড অনিচ্ছাকৃতভাবে হয়েছে, এটা একটা দুর্ঘটনা মাত্র, তবু সে সম্পদের অংশীদার হবে না। বস্তুতপক্ষে কেউ যাতে ধনাঢ্য আত্মীয়কে হত্যা করে তাড়াতাড়ি সম্পদের উত্তরাধিকারী হতে না চায়, সে জন্যই এ বিধান রাখা হয়েছে।

নবী করীম (স) মৃত ব্যক্তির সম্পদে অন্য ধর্মাবলম্বী আত্মীয়-স্বজনদের অধিকার নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। এমনকি স্বামী বা স্ত্রী অমুসলিম হলে তার জন্যও এ বিধান প্রযোজ্য নয়, অবশ্য এ স্থলে দান বা উইল করার নিয়ম আছে। এমনকি মৃত্যু শয্যায় থেকেও স্বামী অমুসলিম স্ত্রীর জন্য তার বিষয় সম্পদের একটি অংশ উইল করে যেতে পারে।

অনেক দেশে ইসলামের উত্তরাধিকার আইন সরকার কর্তৃক ব্যবহৃত না হলেও উইলের অধিকার স্বীকৃত রয়েছে। মুসলমানগণ এ সুযোগটি অনায়াসে গ্রহণ করতে পারে। মুসলমানগণ এ সুযোগ তাদের ধর্মীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের লক্ষে গ্রহণ করতে পারে, যাতে মৃত্যুর পর তাদের বিষয়-সম্পদ যথাযথ বণ্টন হয়। এটা তাদের একটি অবশ্য কর্তব্য হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

ওসিয়ত

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ ওসিয়তের মাধ্যমে দান করা যেতে পারে। ঋণদাতা বা উত্তরাধিকারী ছাড়া অন্য যে কারো জন্য উইল বা ওসিয়ত করা যেতে পারে। এ বিধানটির উদ্দেশ্য মূলত দুটি। প্রথমত কখনো কখনো উত্তরাধিকার আইন বাস্তবায়ন করার ফলে ব্যক্তি কতগুলো সমস্যার মুখোমুখি হয়। তখন সে সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ দিয়ে অনায়াসেই সংকট মুকাবিলা করতে পারে। সে পালন করতে পারে নৈতিক কর্তব্যসমূহ। বস্তুতপক্ষে বিশেষ পরিস্থিতিতে ব্যক্তি যাতে সুবিধা অনুসারে সম্পদ বণ্টন করতে পারে তেমন একটি সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়াটাই উইল ব্যবস্থার একটি উদ্দেশ্য।

দ্বিতীয়ত ক্ষেত্র বিশেষে ব্যক্তি নিকটাত্মীয়দের বাদ দিয়ে সমস্ত বিষয় সম্পদ উইলের মাধ্যমে ব্যক্তি বিশেষকে দেয়ার উদ্যোগ নিতে পারে। তখন সম্পদ ব্যক্তি বা মুষ্টিমেয় লোকের হাতে পুঞ্জীভূত হয়। এভাবে সম্পদ যাতে মুষ্টিমেয় লোকের হাতে পুঞ্জীভূত হতে না পারে, নিকটাত্মীয়রা যাতে সম্পদ থেকে বঞ্চিত না হয় তার প্রতিকার করাও এ বিধানটির একটি উদ্দেশ্য। বস্তুতপক্ষে আত্মীয় স্বজনদের স্বার্থ সংরক্ষণ করে সম্পদ যাতে যথাসম্ভব বেশি লোকের নিকট পৌঁছে তা নিশ্চিত করাও ইসলামের একটি লক্ষ্য।

সরকারী সম্পদ

সমাজ বা রাষ্ট্র হলো একটি বড় পরিবার। ব্যক্তি যে সমাজ ও রাষ্ট্রে বাস করে তার প্রতিও ব্যক্তির দায়িত্ব আছে। অর্থনৈতিক দায়িত্ব হিসেবে সে সরকারকে কর দেয়। আবার সরকার বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর স্বার্থে কর বাবদ প্রাপ্ত অর্থ বা সম্পদ পুনর্বণ্টন করে।

আয় উপার্জনের বিভিন্ন ধরনের উৎস রয়েছে এবং উৎসের তারতম্য অনুসারে কর প্রদানের পরিমাণে কমবেশি হয়ে থাকে। লক্ষণীয় বিষয় এই যে, সম্পদ ব্যয়ের নিয়ম-নীতি ও খাত সম্পর্কে কুরআনুল করীমে যথাযথ নির্দেশনা রয়েছে। কিন্তু রাষ্ট্রের আয়ের হারও বিবৃত হয়নি অথবা নিয়ম-নীতিও বিবৃত হয়নি। অবশ্য এতদসংক্রান্ত নির্দেশনা পাওয়া যাবে নবী করীম (স)-এর হাদীস এবং পরবর্তী সময়ে সাহাবায়ে কেরামের গৃহীত ব্যবস্থা থেকে। কুরআন মজীদে এ সম্পর্কে উল্লেখ না থাকায় এ ব্যাখ্যা দেয়া যেতে পারে যে, এর দ্বারা সরকারকে অবস্থা ও পরিস্থিতির সাথে সঙ্গতি রেখে আয় সংক্রান্ত আইন-কানুন পরিবর্তন ও প্রণয়নের ক্ষেত্রে অনেকখানি সুযোগ দেয়া হয়েছে। অবশ্য জনগণের স্বার্থের প্রতি লক্ষ রেখেই সরকারকে সম্পদ সংগ্রহের নিয়ম ও হার নির্ধারণ করতে হবে।

রাসূলে করীম (স)-এর আমলে কৃষি ফসলের উপর কর আরোপ করা হতো। অর্থনৈতিক পরিভাষায় এটাকে বলে উশর। ফসলের নিম্নতম একটি পরিমাণ ধার্য করা ছিলো, যার উপর কোনো কর দিতে হতো না। কিন্তু জমিতে নির্ধারিত পরিমাণের চেয়ে বেশি ফসল উৎপন্ন হলে নির্দিষ্ট পরিমাণে উশর দিতে হতো। জমিতে ঝরণা বা বৃষ্টির পানি দ্বারা সেচের ব্যবস্থা থাকলে উশরের পরিমাণ হতো উৎপন্ন ফসলের এক-দশমাংশ। আর কুয়ার পানি দ্বারা চাষাবাদ করলে এর অর্ধেক (বিশ ভাগের এক ভাগ) কর দিতে হতো।

ব্যবসা-বাণিজ্য এবং জমি থেকে খনিজ সম্পদ আহরিত হলে মোট সম্পদের আড়াই শতাংশ কর হিসেবে পরিশোধ করতে হতো। এমনকি বিদেশী বাণিজ্য কাফেলাকে আমদানী কর দিতে হতো। এতদসংক্রান্ত একটি ঘটনাকে বর্তমান সময়েও খুব গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা যেতে পারে। রাসূলে করীম (স)-এর আমলে আমদানী রপ্তানী শুল্কের পরিমাণ ছিলো মোট সম্পদের এক-দশমাংশ। কিন্তু খলীফা উমর (রা) শুল্ক হারের পরিবর্তন করেন। তিনি বিদেশী বণিকরা মদীনায় যে সমস্ত দ্রব্য আমদানী করত, তার মধ্যে কিছু কিছু দ্রব্যের শুল্ক হার অর্ধেক করে দেন। অর্থাৎ শুল্ক হার এক-দশমাংশের স্থলে বিশ ভাগের একভাগ নির্ধারণ করেন। রাজস্ব নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে ইসলাম যে সরকারকে কত ক্ষমতা প্রদান করেছে এ ঘটনা তারই ইঙ্গিত বহন করে। নবী করীম (স)-এর আমলে উট, ভেড়া, ছাগল, গরুর জন্য সরকারকে কর দিতে হত। অবশ্য যে সমস্ত পশু সরকারী চারণ ভূমিতে চরে বেড়াত কেবলমাত্র সেগুলোর জন্য এ নিয়ম প্রযোজ্য ছিলো। তাছাড়া পশুর নিম্নতম একটি সংখ্যাও নির্ধারণ করা ছিলো যার উপর কোনো কর ধার্য করা হতো না। ভারবোঝা বহনকারী এবং কৃষি ও সেচ কাজে নিয়োজিত পশুদের উপরেও কর ধার্য হতো না।

মওজুদ অর্থ, সোনা ও রূপার জন্য কর দিতে হতো। করের পরিমাণ ছিলো শতকরা আড়াই ভাগ। বস্তুতপক্ষে মানুষ যাতে অর্থহীনভাবে মওজুদদারীর দিকে আকৃষ্ট না হয়, টাকা-পয়সা, সোনা-রূপা, বিনিয়োগ করে এবং সম্পদ বৃদ্ধি পায় তা নিশ্চিত করাই ছিলো এ জাতীয় করের উদ্দেশ্য।

রাষ্ট্রীয় ব্যয়

ইসলাম ব্যয়ের নীতিসমূহ নির্ধারণ করে দিয়েছে। রাষ্ট্রীয় ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করাই এর উদ্দেশ্য। কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ○ ـ التوبة : ٦٠

"সাদকা কেবলমাত্র নিঃস্ব, অভাবগ্রস্ত ও তদসংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের জন্য, যাদের চিত্ত আকর্ষণ করা হয় তাদের জন্য, দাস মুক্তির জন্য, ঋণ ভারাক্রান্তদের জন্য, আল্লাহর পথে সংগ্রামকারীদের জন্য এবং

মুসাফিরদের জন্য। এটা আল্লাহর বিধান। আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়।"−সূরা আত তাওবা ঃ ৬০

এখানে খরচের আটটি খাতের কথা বলা হয়েছে। বস্তুতপক্ষে একটি রাষ্ট্রের সমস্ত খরচই এর অন্তর্ভুক্ত। ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করলে এর প্রকৃত ব্যাপকতা ও প্রয়োগ পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা আরো স্পষ্ট হবে।

সাদকা যাকাতের একটি সমার্থবোধক শব্দ। সাদকা অর্থ মুসলমানদের উপর আরোপিত রাষ্ট্রীয় কর। সাধারণ পরিস্থিতিতে মুসলমানগণ সরকারের তহবিলে যে সমস্ত কর প্রদান করে, ইসলামী পরিভাষায় তাকে সাদকা বলে। কৃষি, বাণিজ্য, খনিজ সম্পদ, শিল্প, পশু, মওজুদ অর্থ বা সম্পদ প্রভৃতি বিষয়ের উপর ধার্য কর-ও এর অন্তর্ভুক্ত। অবশ্য বিশেষ পরিস্থিতিতে মুসলমানদের যে কর দিতে হয়, যে সমস্ত দান খয়রাত বাধ্যতামূলক নয় অথবা অমুসলিম নাগরিক বা বিদেশীদের যে কর প্রদান করতে হয়, সেগুলো সাদকার অন্তর্ভুক্ত নয়।

বলে রাখা আবশ্যক যে, যে সমস্ত দান-খয়রাত বাধ্যতামূলক নয়, যে দান খয়রাতের পরিমাণ বা পরিশোধের সময়সীমা স্থির করা নেই, তাকে কখনো সাদকা বলা যাবে না। ইসলামী পরিভাষায় দান-খয়রাতকে বলা হয় "ইনফাক ফী সাবীলিল্লাহ" অর্থাৎ আল্লাহর রাস্তায় ব্যয়। এ ধরনের দানের পরিমাণ বা পরিশোধের সময় ব্যক্তির ইচ্ছার উপরই নির্ভর করে।

ফুকারা অর্থ অভাবী এবং মাসাকীন অর্থ নিঃস্ব বা দরিদ্র। শব্দ দুটো মোটামুটি সমার্থবোধক। নবী করীম (স) এ শব্দ দুটির কোনো ব্যাখ্যা দেননি। ফলে শব্দ দুটির অর্থ ও তাৎপর্য নিয়ে প্রচুর মতভেদ রয়েছে। খলীফা হযরত উমর (রা)-এর বর্ণনা ও গৃহিত ব্যবস্থা অনুসারে মুসলমানদের মধ্যে যারা অভাবী বা নিঃস্ব তাদের 'ফুকারা' বলে। আবার মুসলিম রাষ্ট্রে বসবাসরত অমুসলিম নাগরিকদের মধ্যে যারা নিঃস্ব ও দরিদ্র তাদের বলে 'মাসাকীন'। ঐতিহাসিক বালাজুরী ফাত্হুল বুলদানে খলীফা উমর (রা)-এর আরেকটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন। সেখানে দেখা গেছে যে, খলীফা উমর (রা) সিরিয়ার একজন খৃষ্টান নাগরিককে সাদকা বা যাকাত বাবদ প্রাপ্ত রাজস্ব থেকে পেনশন প্রদান করেছেন।

ইমাম শাফেঈ (র) এ ব্যাপারে অভিমত ব্যক্ত করেন যে, ফুকারা এবং মাসাকীন শব্দ দুটি পুরোপুরিভাবে সমার্থবোধক। আল্লাহ তাআলা তাঁর রহমত বশে তাদেরকে দুই নামে অভিহিত করেছেন। সেটা এভাবে যে,

কুরআন মজীদে রাষ্ট্রীয় কোষাগারের অর্থ ব্যয়ের আটটি খাত রয়েছে। প্রতি খাতের জন্য বরাদ্দ রয়েছে আট ভাগের এক ভাগ। সে হিসেবে গরীবদের প্রাপ্য আটভাগের দুভাগ। একভাগ ফকীর, অন্যভাগ মিসকীন হিসেবে। ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ যাই হোক না কেনো ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসরত কোনো ব্যক্তি খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান প্রভৃতি মৌলিক চাহিদা থেকে বঞ্চিত হতে পারবে না। অত্যাবশ্যকীয় এ সমস্ত চাহিদাগুলো পূরণ করা রাষ্ট্রের প্রথম এবং প্রধান কর্তব্য।

এর পরেই আসে বিভিন্ন কর্তব্যকাজে নিয়োজিত বেতন ভাতা প্রদানের প্রশ্ন। খাজনা বা কর আদায়কারী, হিসাব রক্ষক, ব্যয় নিয়ন্ত্রক, হিসাবে পরীক্ষক এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্যরাও এ খাতের অন্তর্ভুক্ত। সত্যিকার অর্থে প্রশাসন, সামরিক বাহিনী, বেসামরিক ব্যবস্থাপনা, কূটনৈতিক বিভাগে কর্মরত লোকেরাও এই খাত থেকে বেতন ভাতাদি পেয়ে থাকে।

ঐতিহাসিক বালাজুরী 'আল-আনসাব' গ্রন্থে খলীফা উমর (রা)-এর একটি ঘটনার উল্লেখ করেন। খলীফা উমর (রা) একবার সিরিয়ার গভর্নরকে হিসাব-নিকাশে অভিজ্ঞ একজন গ্রীককে অবিলম্বে মদীনায় পাঠানোর জন্য পত্র দিয়েছিলেন। এ ঘটনাটি মূলত এ সাক্ষই বহন করে যে, মুসলিম রাষ্ট্রের প্রশাসনিক কাজে অমুসলিম নিয়োগ করা যেতে পারে।

ইসলামী রাষ্ট্রের ব্যয়ের আটটি খাতের মধ্যে একটি হলো "যাদের চিত্ত আকর্ষণ করা হয়" তারা। বর্তমান যামানায় 'সিক্রেট সার্ভিস' কথাটির দ্বারা বিষয়টি আমরা সহজেই অনুধাবন করতে পারি। বিশিষ্ট ফকীহ আবু ইয়া'লা আল-ফাররা এ শ্রেণীর লোককেও চারভাগে বিভক্ত করেছেন। যেমন—

ক. মুসলমানদের সাহায্যার্থে যে সমস্ত লোকের সহযোগিতা দরকার হবে তারা।

খ. মুসলমানদের অনিষ্ট করা হতে যাদের বিরত রাখা হবে তারা।

গ. ইসলাম কবুল করার জন্য যাদের দাওয়াত দেয়া হবে তারা।

ঘ. বিভিন্ন গোত্র বা পরিবারের লোকজন যাদের মাধ্যমে অন্যান্য গোত্র বা পরিবারের নিকট ইসলামের দাওয়াত পৌছাবে তারা।

দাসমুক্তি, গোলাম আযাদের জন্যও রাষ্ট্রীয় কোষাগার ব্যবহৃত হতে পারে। এ ব্যয় দুই ধরনের। প্রথমত ক্রীতদাসদের মুক্তির জন্য অর্থ ব্যয়। দ্বিতীয়ত শত্রুর হাতে যুদ্ধবন্দীকে ছাড়িয়ে আনার জন্য মুক্তিপণ পরিশোধ।

ইসলামী শরীআত অনুসারে মনিবকে উপযুক্ত মূল্য দিয়ে প্রতিটি ক্রীতদাসের মুক্ত হওয়ার অধিকার আছে। এমনকি মুক্তিপণ হিসেবে মুনিবকে যে অর্থ প্রদান করা হয় সে অর্থ উপার্জনের জন্য কাজ করার সুযোগও সে পাবে। মুনিব এ সুযোগ দিতে বাধ্য।

তাছাড়া প্রতি বছর বাজেট করার সময় সরকারকে দাসমুক্তি বাবদ কিছু অর্থ বরাদ্দ রাখতে হয়। এ অর্থ দিয়ে ক্রীতদাসদের সাহায্য করা হয় যাতে তারা সহজে দাসজীবন থেকে মুক্তিলাভ করতে পারে।

কেবলমাত্র মুসলমান বন্দীদের বন্দীদশা থেকে মুক্ত করার জন্যই নয়, কোনো অমুসলিম নাগরিকও যদি শত্রুর হাতে বন্দী হয়ে থাকে, তাহলে তাকে মুক্ত করার জন্যও সরকারী অর্থ ব্যয় হতে পারে। উমাইয়া খলীফা উমর ইবনে আবদুল আযীয (র)-এর শাসনামলে এরূপ হয়েছে বলে সেই আমলের একটি দলীল থেকে জানা যায়।

ঋণগ্রস্ত বলতে নিঃস্ব, গরীব, অভাবী লোকদের বুঝান হয়নি, বরং সচ্ছল লোকেরাও কখনো কখনো বন্যা বা ভূমিকম্পের মত কতগুলো দুর্যোগের মধ্যে পতিত হয়। কখনো আবার তারা এমন সব অস্বাভাবিক পরিস্থিতির মুখোমুখি হয় যা তাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। তখন তারাও দুঃস্থদের কাতারে শামিল হয়। ঋণগ্রস্ত বলতে এ শ্রেণীর লোকদের বুঝান হয়েছে।

খলীফা হযরত উমর (রা) ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিদের সাহায্য করার জন্য সরকারী কোষাগারে একটি বিশেষ বিভাগ চালু করেছিলেন। এ বিভাগ থেকে সাময়িক প্রয়োজন মিটানোর জন্য ঋণ দেয়া হতো। এ ঋণ ছিলো সুদমুক্ত। যারা টাকা ফেরত দেয়ার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় নিশ্চয়তা দিতে পারতো তারাই এ ঋণ পেতো। কখনো খলীফা নিজেও ব্যক্তিগত প্রয়োজনে এ বিভাগ থেকে ঋণ নিতেন।

বলাবাহুল্য, ইসলামে সুদকে হারাম করার ফলে রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে দেয়া ঋণ ছিলো সুদ মুক্ত। খলীফা উমর (রা) সরকারী কোষাগার থেকে বণিকদেরও নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ঋণ দেয়ার বিধান চালু করেছিলেন। ঋণ প্রদানের পর সরকারী কোষাগারও ব্যবসা বা বাণিজ্যের একজন অংশীদার হিসেবে গণ্য হতো। ব্যবসায় লাভ হলে কোষাগার নির্ধারিত হারে মুনাফা পেত, আবার লোকসান হলে নিয়ম মাফিক লোকসানের বোঝা বহন করত। সরকারী ব্যয়ের এ খাতটিকে সামাজিক বীমা হিসেবে

ব্যবহার করা হতো। যেমন—কোনো লোক হয়তো কাউকে হত্যা করলো। পরবর্তীতে হয়তো দেখা গেলো যে, তার এ অপরাধ ছিলো অনিচ্ছাকৃত। অথচ শরীআত অনুসারে রক্তপণ পরিশোধ করার মতো সামর্থ তার নেই। তখন সরকার এ খাত থেকে অর্থ দিয়ে রক্তপণ পরিশোধ করতে সাহায্য করত। রাসূলে করীম (স)-এর আমলে এ জাতীয় ঘটনা অনেক বারই ঘটেছে।

আল্লাহর পথে ব্যয় কথাটির দুটি দিক রয়েছে। প্রথমেই আসে প্রতিরক্ষা বাহিনী প্রসংগে। সৈন্য সামন্ত ও সংশ্লিষ্ট লোকজন এবং কামান নির্মাণ, গোলা-বারুদ সহ সকল প্রকার অস্ত্র ও সাজ-সরঞ্জাম বাবদ যাবতীয় ব্যয় এর অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয়ত মানুষের উপকারার্থে যে সমস্ত কাজের আয়োজন করা হয়, তাও আল্লাহর পথে ব্যয় বলে পরিগণিত। এ জাতীয় কাজের মধ্যে রয়েছে চিকিৎসালয় স্থাপন, ছাত্রকে সাহায্য প্রদান, মসজিদ নির্মাণ প্রভৃতি।

সরকারী অর্থ ব্যয়ের অষ্টম খাতটি হলো যোগাযোগ এবং পর্যটকদের ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত। ব্যাপক অর্থে সড়ক, সেতু, হোটেল, যাতায়াত পথের নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য পরিচর্যা, যানবাহন প্রভৃতি এর অন্তর্ভুক্ত। এমনকি মুসাফিরের সুখ সাচ্ছন্দের ব্যবস্থা গ্রহণও এর আওতায় এসে যায়।

কুরআনের এ বিধানগুলোর যথার্থতা হৃদয়ঙ্গম করতে হলে আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, চৌদ্দশত বছর পূর্বে যা নাযিল হয়েছিলো আজও তা অপরিবর্তিত রয়েছে। এতে করেই এ আটটি খাতের সাথে নতুন নতুন কোনো খাত যোগ করার প্রয়োজন পড়েনি। আধুনিক জগতের প্রগতিশীল কল্যাণ রাষ্ট্রেও এ খাতগুলোর গুরুত্ব সমানভাবে প্রযোজ্য। এগুলো বাস্তবায়নের মাধ্যমেই জনগণের বৃহত্তর কল্যাণ সম্ভব।

বিশেষ কর

রাসূলে করীম (স) এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে সাদকাই ছিলো একমাত্র রাষ্ট্রীয় কর। মুসলমান নাগরিকদের সাদকা ছাড়া কোনো কর প্রদান করতে হতো না। কিন্তু পরবর্তীকালের ফকীহ এবং আইনবিদগণ এ ফতোয়া জারী করেন যে, দেশে কোনো দুর্যোগ দেখা দিলে অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন পড়ে। এমতাবস্থায় রাষ্ট্র আইনসম্মতভাবেই জনগণের ওপর বাড়তি কর আরোপ করতে পারে। তবে বাড়তি কর আরোপ করা হবে শর্তসাপেক্ষে এবং সাময়িকভাবে। এ জাতীয় করকে বলা হয় দুর্যোগ কর (নাভায়িব)।

সামাজিক বীমা

ইসলামের প্রাথমিক যুগে আরববাসীরা অসুখ বিসুখের কথা বড় একটা জানতো না। বলতে গেলে তাদের কোনো চিকিৎসা খরচও ছিলো না। সাধারণ লোকেরা নিজ হাতে কায়িক পরিশ্রম করে ঘর বাড়ী তৈরী করতো। এমনকি ঘরের সাজ-সরঞ্জামের জন্য কোনো অর্থ খরচ করতে হতো না। সুতরাং এটা স্পষ্ট যে, সে আমলে অগ্নি, অসুস্থতা অথবা এ জাতীয় দুর্যোগের জন্য কোনো বীমার প্রয়োজন ছিলো না।

কিন্তু বন্দী করা বা বন্দী হওয়া, হত্যা করা বা নিহত হওয়াটা ছিলো সে আমলের নিত্যদিনের একটি দুর্যোগপূর্ণ ঘটনা। রাসূলে করীম (স)-এর আমলেই এ বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হতো এবং নবীজী এ ব্যাপারে কতগুলো বিধি-বিধানও জারী করেন। পরিবেশ ও পরিস্থিতির পরিবর্তনের সাথে এ সমস্ত বিধি-বিধানেরও খানিকটা রদবদল হতে পারে।

হিজরী প্রথম বর্ষে নগররাষ্ট্র মদীনার জন্য যে গঠনতন্ত্র তৈরী করা হয়, তার মধ্যেই সামাজিক বীমার ব্যবস্থা ছিলো। এ বীমাকে বলা হত মাআকিল। সামাজিক বীমার ব্যবস্থাপনা ছিলো নিম্নরূপ ঃ শত্রুপক্ষ যদি কাউকে ধরে নিয়ে যেত বা বন্দী করত তাহলে তাকে ছাড়িয়ে আনার জন্য মুক্তিপণ পরিশোধ করতে হতো। অনুরূপভাবে শারীরিক নির্যাতন বা অপরাধমূলক হত্যাকাণ্ডের জন্য রক্তমূল্য বা ক্ষতিপূরণ দিতে হতো। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মুক্তিপণ, রক্তপণ বা ক্ষতিপূরণ এতো বেশি ধার্য করা হতো যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বন্দী বা অপরাধীর পক্ষে তা পরিশোধ করা সম্ভব হতো না। উপরোক্ত অবস্থার প্রেক্ষিতে রাসূলে করীম (স) পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে একটি বীমা ব্যবস্থা চালু করেন। এ ব্যবস্থা অনুসারে প্রত্যেক গোত্রই একটি কেন্দ্রীয় কোষাগার গঠন করে। গোত্রের সদস্যরা তাদের সাধ্যমত অর্থ কোষাগারে জমা দেয় এবং দুর্যোগে নিপতিত ব্যক্তি প্রয়োজন মুহূর্তে গোত্রের কেন্দ্রীয় কোষাগার থেকে সাহায্য পেতো। কোনো গোত্রের কোষাগারে যদি পর্যাপ্ত পরিমাণ অর্থ বা সম্পদ না থাকত তাহলে প্রতিবেশী গোত্রসমূহ তার সাহায্যে এগিয়ে আসত এবং এটা প্রতিবেশী গোত্রসমূহের একটি দায়িত্ব হিসেবে বিবেচিত হতো।

মদীনার আনসার গোত্রগুলো ছিলো বেশ সমৃদ্ধ এবং খ্যাতি সম্পন্ন। রাসূলে করীম (স) মুহাজিরগণকেও একটি স্বতন্ত্র গোত্র গঠন করার জন্য নির্দেশ দেন। মক্কা, আবিসিনিয়া এবং অন্যান্য অঞ্চল থেকে যে সমস্ত

লোক মদীনায় হিজরত করেন তাঁরা ছিলেন এ গোত্রের সদস্য। মুহাজিরগণের জন্য সামাজিক বীমা ব্যবস্থা চালু করার উদ্দেশ্যেই তিনি এরূপ নির্দেশ দিয়েছিলেন।

খলীফা হযরত উমর (রা) সামাজিক বীমা ব্যবস্থাকে পুনর্গঠন করেন। বিভিন্ন পেশার ভিত্তিতে তিনি এক একটি বীমা ইউনিট গঠন করেন। যেমন—বেসামরিক লোকজনদের নিয়ে গঠিত হয়েছিলো একটি বীমা ইউনিট। আরেকটি বীমা ইউনিট গঠিত হয়েছিলো সামরিক বিভাগের লোকদের নিয়ে। কতকগুলো বীমা ইউনিট আবার আঞ্চলিকতার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছিলো। যদি কখনো দেখা যেতো যে, কোনো বীমা ইউনিটের পক্ষে এককভাবে আসন্ন দুর্যোগ বা ঝুঁকি কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হচ্ছে না, তখন প্রাদেশিক বা কেন্দ্রীয় সরকার তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসত।

পুঁজিবাদী বীমা কোম্পানীর সাথে ইসলামী বীমা ব্যবস্থার বেশ পার্থক্য রয়েছে। ইসলামী বীমা ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, এখানে কোনো ঝুঁকি বিশেষ কোনো ব্যক্তির একার নয় বরং এতে বহু সংখ্যক লোকের অংশ থাকে এবং পরস্পরের দুর্যোগ বা ঝুঁকির পরিমাণ বহুলাংশে হ্রাস পায়। তাছাড়া ইসলামে সামাজিক বীমার ভিত্তি হলো পারস্পরিক সহমর্মিতা ও সহযোগিতা। তাছাড়া বীমা ইউনিটগুলো সবসময় কেন্দ্রীয় সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে থাকে। বীমা ইউনিটগুলো মওজুদ অর্থ দিয়ে ব্যবসা করে পুঁজি বাড়াতে পারে। এভাবে পুঁজি বাড়াতে পারলে এমন একটা সময় আসতে পারে যখন সদস্যদেরকে বীমা বাবদ কোনো কিস্তি বা অর্থ প্রদান করতে হবে না, বরং ব্যবসা বাবদ আয় থেকে লভ্যাংশ পাবে।

বিস্তারিত বিবরণ না দিয়ে সংক্ষেপে বলা যেতে পারে যে, পুঁজিবাদী বীমা ব্যবস্থায় ব্যক্তি নিয়মিতভাবে বীমা বাবদ অর্থ পরিশোধ করে। কিন্তু বীমা ইউনিট বছরান্তে যে বিপুল পরিমাণ টাকা মুনাফা করে, সদস্যরা তাতে কোনো লভ্যাংশ পায় না। ইসলামে এ ধরনের বীমা ব্যবস্থার অনুমোদন নেই। কারণ ইসলামের দৃষ্টিতে এ জাতীয় বীমা লটারী বা জুয়ার সমতুল্য।

❒

একাদশ অধ্যায়

মুসলিম নারী

ইসলামে নারীর নির্দিষ্ট কতগুলো অধিকার ও কর্তব্য রয়েছে। অধিকার ও কর্তব্যগুলো সংরক্ষণ ও নিশ্চিত করার জন্য কতকগুলো আইনও রয়েছে। এ প্রসংগে আলোচনার শুরুতেই বলে রাখা আবশ্যক যে, ইসলামী আইন যেমন পরিবেশ ও পরিস্থিতির সাথে খাপ খেয়ে চলতে পারে। তেমনি এর পরিবর্তন ও পরিমার্জনেরও সুযোগ রয়েছে। বর্তমান-কালে পাশ্চাত্য সভ্যতায় নারী স্বাধীনতার নামে যে বেহায়াপনা চলছে তা নারীকে মানবিক মূল্যবোধ থেকে বঞ্চিত করেছে। আর ইসলাম নারীকে দিয়েছে মর্যাদা এবং তাকে মানবিক মূল্যবোধের মসনদে অধিষ্ঠিত করেছে। এ প্রসংগে নবীজীর একটি হাদীসও রয়েছে—তিনি বলেছেন যে, সুন্দর মাধ্যম বা অবলম্বনই হলো উত্তম জিনিস। ইসলাম নারীর যে মর্যাদা দিয়েছে তার সাথে অন্য যে কোনো সভ্যতা বা সমাজ ব্যবস্থায় নারীর মর্যাদার সাথে তুলনা করে দেখা যেতে পারে। তা হলেই ইসলামে নারীর মর্যাদা সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে। দু একটি ঘটনাকে বিচ্ছিন্নভাবে গ্রহণ করে বর্তমান কালের অন্যান্য জীবন পদ্ধতির চেয়ে বস্তুত নৈতিকতার কিছু বিষয়ের ব্যাপারে ইসলাম অধিকতর অনমনীয় এবং শুদ্ধাচারের পক্ষপাতি।

কতকগুলো সাধারণ কথা

ইসলামে মায়ের মর্যাদা অনেক উঁচুতে। একথার স্বাক্ষর মেলে নবী করীম (স)-এর একটি হাদীসে। তিনি বলেছেন, 'সন্তানের জান্নাত তার মায়ের পায়ের নীচে।' বুখারী শরীফে উল্লেখ আছে যে, একজন সাহাবী প্রিয়নবী (স)-কে জিজ্ঞেস করলেন, কোন কাজে আল্লাহ তাআলা সবচেয়ে বেশি খুশী হন। প্রিয়নবী (স) উত্তরে বললেন, নির্ধারিত সময়ে ইবাদাত-বন্দেগী করলে আল্লাহ বেশি খুশী হন। সাহাবী বার বার একই প্রশ্ন করলেন, নবীজীও একই উত্তর দিলেন। নবীজী তাঁর জবাবের এক পর্যায়ে বললেন ঃ পিতা-মাতার প্রতি সহানুভূতিশীল হলে আল্লাহ বেশি খুশী হন।

কুরআনুল করীমের বিভিন্ন স্থানে পিতা-মাতার উচ্চ মর্যাদা সম্পর্কে বলা হয়েছে। মানব জাতিকে স্পষ্টভাবে স্মরণ করে দেয়া হয়েছে, মা তাকে কষ্টের পর কষ্ট সহ্য করে গর্ভে ধারণ করেছেন। তার জন্য কষ্ট করেছে

নানাভাবে। হাজারো রকমের ত্যাগ স্বীকার করেছেন। এ মা-ই তাকে কোলেপিঠে করে লালন-পালন করেছেন। মায়ের এ ভূমিকার কথা মানুষের কখনো ভুলে যাওয়া উচিত নয়।

স্ত্রী হিসেবে নারীর স্থান যে কত উর্ধে তা প্রিয়নবী (স)-এর একটি হাদীস থেকেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তিনি বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তি উত্তম যে তার স্ত্রীর কাছে উত্তম।" বিদায় হজ্জের ভাষণে নবী করীম (স) নারী জাতি সম্পর্কে বিস্তারিত বক্তব্য রেখেছেন। তিনি ভাষণে বলেন, "নারীদের ব্যাপারে সতর্ক করে দিচ্ছি। তাদের প্রতি নির্মম ব্যবহারের বেলায় আল্লাহর হদ সম্পর্কে নির্ভয় হয়ো না, তোমরা তাদেরকে আল্লাহর যিম্মাদারীতে গ্রহণ করেছো, তাঁরই নির্দেশের আওতায় তোমরা নিজেদের জন্য তাদেরকে হালাল করে নিয়েছো। তোমাদের স্ত্রীদের উপর যেমন তোমাদের অধিকার আছে। তাদেরও তোমাদের উপর তেমনি অধিকার রয়েছে।

কন্যা হিসেবেও মেয়েদের রয়েছে একটি বিশেষ স্থান। এ ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভংগী যে কত উদার ও বলিষ্ঠ তা কুরআন মজীদের একটি আয়াত থেকেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ইসলামপূর্ব যুগে কন্যা সন্তানের প্রতি মূর্তিপূজারী কাফির মুশরিকদের আচরণ ছিলো খুবই কুৎসিৎ ও জঘন্য। তাদের এ অন্যায় আচরণকে নিন্দা করে কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ

وَيَجْعَلُوْنَ لِلّٰهِ الْبَنَاتِ سُبْحٰنَهٗ ۙ وَلَهُمْ مَّا يَشْتَهُوْنَ ○ وَاِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ
بِالْاُنْثٰى ظَلَّ وَجْهُهٗ مُسْوَدًّا وَّهُوَ كَظِيْمٌ ○ يَتَوَارٰى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوْٓءِ مَا
بُشِّرَ بِهٖ ؕ اَيُمْسِكُهٗ عَلٰى هُوْنٍ اَمْ يَدُسُّهٗ فِى التُّرَابِ ؕ اَلَا سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ○

"তারা নির্ধারণ করে আল্লাহর জন্য কন্যা সন্তান, তিনি পবিত্র মহিমান্বিত এবং তাদের জন্য তাই যা তারা কামনা করে। তাদের কাউকে যখন কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেয়া হয় তখন তাদের চেহারা কালো হয়ে যায় এবং সে অসহনীয় মনস্তাপে ক্লিষ্ট হয়। তাকে যে সংবাদ দেয়া হয়, তার গ্লানি হেতু সে নিজ সম্প্রদায় হতে আত্মগোপন করে। সে চিন্তা করে হীনতা সত্ত্বেও সে তাকে রেখে দেবে, না মাটিতে পুতে ফেলবে। সাবধান! তারা যে সিদ্ধান্ত নেয় তা কত নিকৃষ্ট।"

—সূরা আন নাহল ঃ ৫৭-৫৯

কুরআন মজীদে বার বার বলা হয়েছে, আল্লাহ তাআলা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন জোড়ায় জোড়ায়। সৃষ্টির ধারাকে অব্যাহত রাখার জন্য এটা জরুরি এবং দুনিয়ার বুকে ছেলে ও মেয়ে উভয়ের রয়েছে সমান আবশ্যকীয়তা এবং দুনিয়ার বুকে নর বা নারী প্রত্যেকেরই রয়েছে একটি নির্দিষ্ট কাজের ধারা। কুরআন মজীদের স্পষ্ট ঘোষণা ঃ

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ ؕ لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوْا ؕ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ؕ وَسْئَلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمًا ○ - النساء : ٣٢

"যা দিয়ে আল্লাহ তোমাদের কাউকে কারোর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন, তোমরা তার লালসা কর না। পুরুষ যা অর্জন করে তা তার প্রাপ্য অংশ এবং নারী যা অর্জন করে তা তার প্রাপ্য অংশ। আল্লাহর অনুগ্রহ প্রার্থনা কর, আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্বজ্ঞ।"-সূরা নিসা ঃ ৩২

প্রকৃতিগতভাবেই নারী ও পুরুষ সকল ব্যাপারে পূর্ণ সমতা লাভ করেনি, বরং তাদের কাজ ও বৃত্তিগুলো এমনভাবে বণ্টন করা হয়েছে যাতে তারা পরস্পরের পরিপূরক হিসেবে বেঁচে থাকতে পারে। বস্তুতপক্ষে বাহুল্য বিষয়গুলো পরিহার করার জন্য এটা দরকার ছিলো। যেমন নারী গর্ভে সন্তান ধারণ করে। এটা নারীর জন্য নির্ধারিত ও দায়িত্ব। পুরুষের পক্ষে সন্তান ধারণ করা অসম্ভব ও অবাস্তব। অনুরূপভাবে প্রকৃতিগতভাবে পুরুষ যে বৈশিষ্ট্য বা গুণাবলী অর্জন করেছে নারীর পক্ষে তা অর্জন করা সম্ভব নয়। নারীর শারীরিক গঠনও ভিন্ন ধাঁচের। তার অস্থি-মজ্জা, এমন কি মস্তিষ্কও গঠিত তদানুসারে। তার বৃত্তি ও কাজগুলো নির্ধারিত হয়েছে তার ন্যারী বৈশিষ্ট্যের আলোকে। অপরদিকে পুরুষের শরীরের গঠন মজবুত, পেশীতে শক্তিও বেশী। জীবন সংগ্রামেও তাকে কষ্টকর কাজে লিপ্ত হতে হয় অর্থাৎ নারী পুরুষ প্রত্যেকেই কাজ করবে তাদের চাহিদা ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে। এটাই স্বাভাবিক এবং যুক্তিসংগত।

স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, প্রকৃতিগতভাবে বিশেষ কতগুলো ক্ষেত্রে নারী পুরুষের মধ্যে তারতম্য থাকলেও অনেক ব্যাপারেই তাদের মধ্যে পূর্ণ সংগতি রয়েছে। সেসব ক্ষেত্রে তাদের দায়িত্ব ও অধিকারগুলো অভিন্ন প্রকৃতির হয়ে থাকে।

অর্থাৎ ইসলাম কতগুলো ব্যাপারে নারী পুরুষের মধ্যে পূর্ণ সমতা প্রদান করেছে। আবার নির্দিষ্ট কতগুলো বিষয়ে তাদের মধ্যে বিরাজ করছে তারতম্য। নারীর অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা করলে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হবে।

নারীর দায়িত্ব

ধর্মীয় ব্যাপারে একজন নারীর প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব হলো এক আল্লাহর উপর ঈমান আনা। পুরুষের জন্যও একথা সত্য। আখেরাত মানুষের নাজাতের একমাত্র অবলম্বন। এটা সকলেরই জানা যে, জোরপূর্বক কাউকে ইসলামে ধর্মান্তরের ব্যাপারে কঠোর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।

সালাত আদায়, রোযা রাখা, হজ্জ করা ও যাকাত দেয়া প্রত্যেক নারীর জন্য বাধ্যতামূলক। অবশ্য বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে কখনো ইবাদাত-বন্দেগীর ব্যাপারে তাকে বেশ খানিকটা ছাড়ও দেয়া হয়েছে। যেমন জুমার জামাআতে সালাত আদায় নারীদের জন্য বাধ্যতামূলক নয়। কিন্তু পুরুষের জন্য এটা অবশ্য কর্তব্য। আবার সঞ্চয়ের উপর বছরান্তে যাকাত দেয়া নারী বা পুরুষ উভয়ের জন্য ফরয।

নারীদের সামাজিক কর্তব্যও রয়েছে। পুরুষদের ন্যায় নারীদের জন্যও সুদ, জুয়া, লটারী প্রভৃতি বিষয়গুলো নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এটা করা হয়েছে জাতীয় সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টন নিশ্চিত করার লক্ষে। কারণ সুদ, জুয়া, লটারীর মাধ্যমেই সম্পদ মুষ্টিমেয় লোকের হাতে পুঞ্জিভূত হয়ে থাকে।

মানুষের আরেকটি চরম দুর্যোগ ও দুর্ভোগের উৎস হলো মদ। তাই মদ্যপান থেকে বিরত থাকা প্রত্যেক নর-নারীর কর্তব্য। কুরআনের বর্ণনা অনুসারে এটা হলো শয়তানের কাজ। মদ্যপানের সাথে জড়িয়ে আছে শারীরিক, আর্থিক ও নৈতিক ক্ষয়ক্ষতি সহ আরো অনেক অনিষ্ট। তবে নারীদের বেলায় এ ক্ষতির পরিমাণ আরো ব্যাপক। কারণ নারীর রক্তেই সন্তানের পরিপুষ্টি। তার স্তন পান করেই সন্তানের বৃদ্ধি। নারী মদপান করলে সন্তানও সংক্রমিত হয়। মায়ের স্বাস্থ্য অথবা তার রোগ-ব্যাধি এভাবে তার শিশু সন্তানের মাধ্যমে নতুন প্রজন্মে এবং আগামী প্রজন্মে সঞ্চারিত হয়। নৈতিক সম্পর্কিত দায়িত্ব খুবই ব্যাপক ও বিস্তীর্ণ। আধ্যাত্মিকতা চর্চার মাধ্যমে যেমন আমরা স্রষ্টার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করি, তেমনিভাবে সমাজ জীবনে পরস্পরের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে নৈতিকতার রয়েছে সমান গুরুত্ব। ইসলামের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য এই যে, এ দীন মন্দ কাজের উৎস মূলে আঘাত হানে, কেবল বিশেষ কতকগুলো ঘটনার প্রতিকার নিয়ে ব্যাপৃত থাকে না। এ উদ্দেশ্যে ইসলাম

বিশেষ কতগুলো বিধি-বিধান ও নির্দেশাবলী জারী করেছে। আবার কতগুলো ভালো কাজের তাকীদ রয়েছে। কিন্তু অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যকে উপেক্ষা করলে বা বিবেচনায় না আনলে এ সমস্ত বিধি-বিধান বা নির্দেশগুলোর তাৎপর্য সমানভাবে উপলব্ধি করা যাবে না। যেমন সম্ভবত দুনিয়ার সকল ধর্মই যৌনাচার ও ব্যভিচারকে অপরাধ হিসেবে ঘোষণা দিয়েছে। কিন্তু ইসলাম এক ধাপ অগ্রসর হয়ে যে কারণে মানুষ যৌনাচার বা ব্যভিচারে প্রবৃত্ত হয় তা বন্ধ করার পথ বাতলে দিয়েছে। এমনি আশা করা খুবই সহজ যে, সমাজের প্রতিটি ব্যক্তি নৈতিক শক্তি বৃদ্ধির মাধ্যমে কু-প্রবৃত্তি দমন করবে। কিন্তু বাস্তবে এমনটি হয় না বা হবার কথাও নয়। তার চেয়ে বরং যে পরিস্থিতিতে মানুষ কু-প্রবৃত্তি দ্বারা প্ররোচিত হয় সে পরিস্থিতির যাতে উদ্ভব না ঘটে সে দিকে লক্ষ রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ। কারণ সমাজের বেশির ভাগ মানুষের মধ্যে বিশেষ কতগুলো দুর্বলতা রয়েছে। এ সমস্ত দুর্বলতা নিয়ে সমাজে বসবাস করতে গেলে শেষাবধি তার পরাজয় ঘটে।

এ কারণে কুরআন মজীদে সূরা আল আহযাবের ৫৯ আয়াতে জালাবীব (মাথা থেকে পা পর্যন্ত আচ্ছাদন করে এমন বোরখা) পরিধানের তাকীদ এসেছে। এটা এ উদ্দেশ্যে যে, (ক) যে সমস্ত পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে নারীদের পুরুষদের কোপানলে পড়ার আশংকা থাকে তার প্রতিকার করা এবং (খ) পুরুষের পাপাচার থেকে নারীদের রক্ষা করা। গৃহের অভ্যন্তরে থাকাকালীন সময়ে বন্ধু এবং অন্যান্যদের সাথে তার আচার-আচরণ কেমন হবে সে বিষয়েও কুরআন মজীদে স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে। বলা হয়েছে ঃ

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ط ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا يَصْنَعُوْنَ ○ وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ ص

"মু'মিনদের বল, তারা যেনো দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাদের চরিত্রকে হিফাযত করে। এটাই তাদের জন্য উত্তম, তারা যা করে আল্লাহ সে বিষয়ে অবহিত। মু'মিন নারীদের বল, তারা যেনো তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং চরিত্রকে হিফাযত করে। তারা যেনো যা সাধারণত প্রকাশ থাকে তা ছাড়া তাদের আবরণ প্রদর্শন না করে। তাদের গ্রীবা যেনো মাথার কাপড় দ্বারা আবৃত থাকে।"

–সূরা আন নূর ঃ ৩০-৩১

ইসলামের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, সেই গোড়া থেকেই নারীরা তাদের উপযোগী বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত হয়েছে। এমন কি নবী করীম (স)-এর আমলেও এ নিয়ম চালু ছিলো। তাঁরা নিয়োজিত হয়েছেন সেবিকা, শিক্ষিকা, রাধুনী এবং এ জাতীয় আরো অনেক কাজে। এমনকি প্রয়োজনের সময় তাঁরা পুরুষের পাশাপাশি যোদ্ধার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। খলীফা উমর (রা) শিফা বিনতে আবদুল্লাহ নামক এ মহিলাকে রাজধানী মদীনার বাজার পরিদর্শক হিসেবে নিয়োগ করেছিলেন বলে জানা যায়। ইবনে হাজার ইসাবাহ প্রদত্ত এ তথ্যে আরো জানা যায় যে, এ মহিলা উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফসা (রা)-কে লিখতে ও পড়তে শিখিয়েছিলেন। ইসলামী আইনবিদগণ শরীআত মুতাবিক মহিলাদেরকে বিচারক হিসেবে নিয়োগ প্রদানের সম্ভাবনার কথাও বলেছেন। ইসলামের ইতিহাসে এর অনেক নজীরও রয়েছে। সংক্ষেপে শুধু এটুকুই বলা যায় যে, মুসলিম নারী কেবলমাত্র পরগাছা হিসেবে জীবন কাটায় না। সে তার নিজের মান-মর্যাদা রক্ষা করে জীবিকা অর্জন করতে পারে, মেধা ও প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে পারে এবং পুরুষের সাথে সহযোগিতা করতে পারে।

কুরআন মজীদে উল্লেখ আছে ঃ

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ط - الرم : ٢١

"তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের মধ্য থেকে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের সাথীদের, যাতে তোমরা তাদের নিকট শান্তি পাও এবং তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন।"–সূরা আর রূম ঃ ২১

সূরা আল বাকারায় আরো বলা হয়েছে ঃ

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ط - البقرة : ١٨٧

"তারা তোমাদের পরিচ্ছদ এবং তোমরা তাদের পরিচ্ছদ।"

–সূরা আল বাকারা ঃ ১৮৭

এবং সে কারণে পারস্পরিক সুবিধা ও স্বার্থের খাতিরে নারী ও পুরুষ উভয়কে সহঅবস্থানের নীতি অনুসরণ করতে হয়। নারী ও পুরুষ সকল ব্যাপারে একে অপরের সমকক্ষ হয়ে চলতে পারে না। পারিবারিক তথা

ব্যক্তি জীবনে সুখ-শান্তির জন্য অবশ্যই তাদের একে অপরকে ছাড় দিতে হয়। স্ত্রীর সাথে স্বামীর আচার ব্যবহার কেমন হবে সে বিষয়েও সূরা আন নিসায় স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে। বলা হয়েছে ঃ

فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسٰٓى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا ○

"তোমরা যদি তাদের অপসন্দ কর তবে এমন হতে পারে যে, আল্লাহ যে বিষয়ে অশেষ কল্যাণ রেখেছেন সেটাকেই তোমরা অপসন্দ করছ।"–সূরা আন নিসা ঃ ১৯

বস্তুতপক্ষে সে ব্যক্তি বেশী জ্ঞানী ও মর্যাদাবান যে ক্ষমতার অধিকারী হয়েও অপরকে অধিক পরিমাণ ছাড় দেয় বা সুযোগ সুবিধা প্রদান করে।

যে যাকে ভালোবাসে সাধারণত সে তাকে বিয়ে করতে পসন্দ করে। কিন্তু মানবেতিহাসে ভালোবাসার কাহিনী বিষাদে ভরা। বিশেষত যুব সমাজের মধ্যকার ভালোবাসার সাথে মিশে আছে মাত্রাতিরিক্ত আবেগ প্রবণতা ও কল্পনা। এর স্থায়িত্বও খুবই স্বল্প সময়ের জন্য। এটা এক রকমের ড্রামা, বলা যেতে পারে পাতান খেলা। সাধারণত মিষ্টি স্বর, মধুর হাসি, তাকানোর স্টাইল, গায়ের রং অথবা মনভোলানো অঙ্গভঙ্গীর কারণে এ ভালোবাসা গড়ে ওঠে। কিন্তু দাম্পত্য জীবনের জন্য এ ধরনের ভালোবাসা মোটেই পর্যাপ্ত নয়। এ ব্যাপারে নবী করীম (স) আমাদেরকে খুবই স্পষ্ট পথনির্দেশ ও পরামর্শ দিয়েছেন। "কেবলমাত্র সুন্দর বলেই বিয়ে করো না। কেননা সৌন্দর্য নৈতিক অবক্ষয়ের কারণ হতে পারে। অথবা কেবলমাত্র সম্পদের কারণে কাউকে বিয়ে করো না। কারণ সম্পদ থেকে অবাধ্যতার সৃষ্টি হতে পারে। বরং দীনের প্রতি কি রকম নিষ্ঠা আছে, অনুরাগ কেমন তার আলোকেই বিয়েশাদী হওয়াটা উত্তম।"–ইবনে মাজা, ১৮৫৯। মানুষের গোটা জীবন জুড়ে রয়েছে ইসলামের বিধি-বিধান ও ব্যবস্থা। সে কারণেই যিনি যত নিষ্ঠার সাথে ধর্মীয় দায়িত্ব কর্তব্যগুলো পালন করেন, তিনি তার পরিবারে ততবেশী সুখ-শান্তি প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হবেন। নবী করীম (স) বলেছেন, "দুনিয়ার জীবন খুবই ক্ষণস্থায়ী। এখানে যে যত সুবিধাই গ্রহণ করুক না কেন সেটা সাময়িক ও ক্ষণস্থায়ী। তবে এ পার্থিবজগতে দীনদার স্ত্রী ছাড়া উত্তম আর কোনো কিছু হতে পারে না।"–ইবনে মাজা, ১৮৫৫। নবী করীম (স) আরো বলেছেন, "আচার আচরণে যে নিষ্ঠাবান যে তার স্ত্রীর প্রতি সদয়, সেই প্রকৃত মু'মিন।"–তিরমিযী ও নাসাঈ

ইসলাম নৈতিকতার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। নির্দেশ দেয়া হয়েছে, উচ্ছৃঙ্খলতাকে সর্বতোভাবে প্রতিরোধ করার জন্য। কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ

وَالّٰتِىْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ

"যদি কেউ তার স্ত্রীর অবাধ্যতা বা উচ্ছৃঙ্খলতার আশংকা করে, তাহলে প্রথমে তাকে সদুপদেশ দেবে। এতে কোনো ফল না হলে শয্যাত্যাগ করে স্ত্রীর উপর চাপ সৃষ্টি করবে। (সর্বশেষ উপায় হিসেবে হালকাভাবে) প্রহার কর।"–সূরা আন নিসা ঃ ৩৪

এত কিছুর পরেও যদি সংশোধন না হয় তা হলে সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে স্ত্রীকে ত্যাগ বা তালাক দেয়ার কথা বলা হয়েছে। যদিও নবী করীম (স)-এর ভাষায় আইনসিদ্ধ কার্যাবলীর মধ্যে এটাই জঘন্যতম। স্মরণ রাখতে হবে যে, নৈতিকতাকে উন্নত রাখা বা চরিত্রকে ভালো রাখার দায়িত্ব স্ত্রী বা স্বামী উভয়ের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। কুরআন মজীদে উল্লেখ আছে ঃ

وَاِنِ امْرَاَةٌ خَافَتْ مِنْۢ بَعْلِهَا نُشُوْزًا اَوْ اِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ اَنْ يُّصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ط وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ط

"কোনো স্ত্রী যদি তার স্বামীর তরফ থেকে দুর্ব্যবহার বা উপেক্ষার আশংকা করে তাহলে তা সংশোধন করার চেষ্টা করবে। এতে সুফল পাওয়া না গেলে এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে স্বামীর নিকট থেকে স্ত্রীরও পৃথক হয়ে যাওয়ার আইনগত অধিকার রয়েছে।"

–সূরা আন নিসা ঃ ১২৮

নবী করীম (স)-এর নিকট এ বিষয়টি খুবই পসন্দীয় ছিলো যে, ছেলেরা মেয়েলী আচরণ পরিহার করে চলবে। আবার মেয়েরা ছেলেদের মত চুল রাখা, কথা বলা, পোশাক পরা প্রভৃতি বিষয়গুলো থেকে বিরত থাকবে। অর্থাৎ ছেলেমেয়ে প্রত্যেকেরই একটি নিজস্ব দৃষ্টিভংগী ও বৈশিষ্ট্য আছে। প্রত্যেকেই তাদের স্বাতন্ত্র্য অনুসারে লক্ষের দিকে এগিয়ে যাবে। তারা কখনো নিজস্ব গতিধারাকে পরিহার করে অপরেরটা গ্রহণ করবে না। এর অন্যথা হলেই তার উপর নেমে আসবে আল্লাহর গযব।

নারীর অধিকার

ইসলাম পূর্বযুগে আরব সমাজে পুরুষদের তুলনায় নারীদের গুরুত্ব ও মর্যাদা ছিলো অনেক কম। কখনো যদি এমন হতো যে, পুরুষ কোনো অন্যায় অপরাধ করেছে, আর নারী সে অন্যায়ের শিকার হয়েছে তা হলে নারীর পক্ষে প্রতিশোধ নেয়া সম্ভব ছিলো না। কুরআন মজীদ এ ধরনের বৈষম্যের অবসান ঘটিয়েছে। মানুষ হিসেবে নারীকে প্রতিষ্ঠা করেছে পুরুষের সমান মর্যাদায়। বিষয়-সম্পদ, মান-সম্মান প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রে রয়েছে নারীরও পুরুষের সমান অধিকার। বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে হয়ত পুরুষের চেয়ে নারীর অধিকার আরো বেশি, যেমন কুরআন মজীদে এ মর্মে ঘোষণা দেয়া হয়েছে ঃ

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَاْتُوْا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمٰنِيْنَ جَلْدَةً وَّلاَ تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا ـ النور : ٤

"আর যারা পবিত্র চরিত্রের স্ত্রীলোকদের সম্পর্কে মিথ্যা দোষারোপ করবে, তার পর চারজন সাক্ষী উপস্থিত করতে না পারবে, তাদেরকে আশিটি কোড়া মার, আর তাদের সাক্ষ্য কখনোও কবুল করো না।"—সূরা আন নূর ঃ ৪

এত গেল দুনিয়ার শাস্তি। আখেরাতেও অপবাদ প্রদানকারী পুরুষের জন্য রয়েছে কঠিন আযাব। কেবলমাত্র তাওবা তথা অনুশোচনা ও অনুতাপের মাধ্যমেই সে এ শাস্তি থেকে মুক্তি পেতে পারে।

বস্তুতপক্ষে মানুষ হিসেবে নারীর রয়েছে যথাযথ এবং পূর্ণ ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য। সম্পদে নারীর মালিকানা থেকেই এ বিষয়টি স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। ইসলামী শরীআহ নারীকে সম্পদের পূর্ণ মালিকানা দান করেছে। নারী ইচ্ছামত সম্পদ ব্যয় করতে পারে। এজন্য তাকে পিতা, ভাই, স্বামী বা পুত্র কারো মতামতের উপর নির্ভর করতে হয় না। এ ব্যাপারে পুরুষের যেমন অধিকার নারীরও রয়েছে তেমনি অধিকার। এমন কি স্বামী পিতা বা অন্য কোনো নিকট আত্মীয়ের মাত্রাতিরিক্ত কোনো দায়-দেনা থাকলেও নারীর সম্পদে হস্তক্ষেপ করতে পারে না। অনুরূপভাবে ঋণ গ্রহণের ব্যাপারে নারী স্বাধীন। এজন্য অন্য কারো উপর তাকে নির্ভর করতে হয় না। সে ইচ্ছামত সম্পদ কেনা-বেচা করতে পারে, দান-খয়রাত করতে পারে এবং পরিশ্রম করে আরো সম্পদ অর্জন করতে পারে। বস্তুতপক্ষে এটা নারীর জন্মগত অধিকার। স্বামী, পিতা বা অন্য কারো সাথে বিশেষ চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে নারীকে এ অধিকার অর্জন করতে হয় না।

এর পরেই আসে উত্তরাধিকার আইন প্রসংগ। পূর্বযুগে পিতা বা স্বামীর সম্পদের উপর একজন নারীর কোনো অধিকার ছিলো না। প্রথম দিকে নবী করীম (স) নিজেও এ ব্যাপারে ছিলেন নীরব। পিতা বা স্বামীর সম্পদে নারীদের অধিকার সংক্রান্ত বিধান প্রথম নাযিল হয় নবুয়াতের পঞ্চদশ বছরে। ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেছেন যে, তৃতীয় হিজরীতে আউস ইবনে সাবিত (রা) নামে একজন ধনবান আনসারী তাঁর এক স্ত্রী ও অল্প বয়সের কন্যা রেখে ইন্তিকাল করেন। মদীনার প্রচলিত রীতি অনুসারে যুদ্ধে অস্ত্র নিয়ে যেতে পারে এমন প্রাপ্তবয়স্ক পুত্র সন্তান মৃত পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকার লাভ করতো, অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্র সন্তান বঞ্চিত হতো। ফলে আউস ইবনে সাবিত (রা)-এর ইন্তেকালের পর পরিবারের সদস্যরা কিছুই পেল না। রাতারাতি তারা নিঃস্ব হয়ে পড়লো। বঞ্চিত হলো জীবন ধারণের উপায় উপকরণ থেকে। তদস্থলে আউস ইবনে সাবিত (রা)-এর ভাইয়ের ছেলেরা তার সমস্ত সম্পদের মালিকানা গ্রহণ করলো। ঠিক এমনি সময়ে উত্তরাধিকার আইন সম্পর্কে কুরআনের আয়াত নাযিল হলো। তখন থেকে মুসলমানগণ এ আইন মেনে চলেছে। এমন কি কিছু কিছু খৃষ্টান ও অন্যান্য সম্প্রদায়ও এ আইন অনুসরণ করে থাকে। যেমন লিভান্তের খৃষ্টানগণ। কুরআনের এ বিধান অনুসারে মৃত পিতার সম্পদে স্ত্রী, কন্যা, ভগ্নী সকলের অংশ থাকে। তারা অংশীদার হবে স্থাবর-অস্থাবর সম্পদে। সবকিছুই বণ্টন করা হবে ন্যায্য হিসাব অনুসারে।

উইল বা ওসিয়তের বিষয়টিও এখানে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ওসিয়তের মাধ্যমে কাউকে সম্পত্তি প্রদান করা যেতে পারে। অবশ্য এ পন্থায় নিকট আত্মীয়দের ন্যায্য হিস্যা থেকে বঞ্চিত হবার সম্ভাবনা থাকে। তাই উইলের ব্যাপারে ইসলামে কঠোর বিধি-নিষেধ রয়েছে। উত্তরাধিকার আইন অনুসারে কে কি পরিমাণ সম্পদ পাবে তা নির্ধারণ করা আছে। উইলের মাধ্যমে এটা হ্রাস বা বৃদ্ধির অবকাশ নেই। মৃত ব্যক্তির সম্পদের ওপর যার কোনো অধিকার নেই, উইলের মাধ্যমে তাকে সম্পদ প্রদান করা যেতে পারে। তবে ইসলামী শরীআত মতে তারও একটি মাত্রা নির্ধারণ করা আছে। এ স্থলে উইলের সর্বোচ্চ সীমা হচ্ছে মোট সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ। দুই-তৃতীয়াংশ বরাদ্দ থাকবে আত্মীয়দের জন্য। অবশ্য ক্ষেত্র বিশেষে উইলের পরিমাণ এক-তৃতীয়াংশের বেশি হতে পারে। কিন্তু শর্ত এই যে, সম্পদের ভাগ বাটোয়ারা করার সময় উত্তরাধিকারীরা যদি স্বতঃস্ফূতভাবে উইলটি মেনে নেয়, কেবলমাত্র তখনই এটা কার্যকর হবে। উত্তরাধিকার আইন এবং এর হিসাব নিকাশ বেশ জটিল। কারণ বিভিন্ন

অবস্থার প্রেক্ষিতে বিভিন্ন উত্তরাধিকারীগণের সম্পদ প্রাপ্যতার মধ্যে তারতম্য ঘটে থাকে। যেমন স্বামীর মৃত্যুর সময় যদি সন্তান না থাকে তাহলে স্ত্রী সম্পদের এক-চতুর্থাংশ পাবে। কিন্তু সন্তান-সন্ততি থাকলে পাওনার পরিমাণ হবে এক-অষ্টমাংশ। আবার মৃত ব্যক্তির যদি একটি মাত্র কন্যা সন্তান থাকে, তাহলে সে সম্পদের অর্ধেক পাবে। একাধিক কন্যা থাকলে অর্ধেক সম্পদ সকলের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করা হবে। কিন্তু ভাই থাকলে সে পাবে ভাই যা পাবে তার অর্ধেক।

উত্তরাধিকার আইন অনুসারে ভাই-বোন, পিতা-মাতা, কন্যা-পুত্র একই পরিমাণ সম্পদ পায় না। এ ধরনের তারতম্যের একটি যুক্তিসংগত ব্যাখ্যা রয়েছে। উত্তরাধিকার আইনকে বুঝতে হলে একজন নারীর সমস্ত অধিকারকে সামগ্রিকভাবে দেখতে হবে। আরো স্মরণ রাখতে হবে যে, জীবনের স্বাভাবিক অবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আইন প্রণয়ন করা হয়। যা ব্যতিক্রম তা ব্যতিক্রম হিসেবে বিবেচিত হয়। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, নারীরা স্বতন্ত্রভাবে সম্পদের মালিকানা ভোগ করে থাকে। নারীর সম্পদের উপর তার পিতা বা স্বামী, অথবা অন্য কোনো আত্মীয়ের কোনো এখতিয়ার নেই। অপরদিকে একজন মহিলাকে তার ভরণপোষণ খাদ্য-খাবার পোশাক-পরিচ্ছদ প্রভৃতির জন্য চিন্তা করতে হয় না। পিতা স্বামী, পুত্র এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নিয়ে থাকে। এটা তাদের একটা আইনসম্মত দায়িত্ব। আবার একজন নারী স্বামীর নিকট থেকে মোহরানা পেয়ে থাকে। ইসলাম পূর্বযুগেও মোহরানার নিয়ম ছিলো কিন্তু সে আমলে মোহরানার অর্থ পেতেন পিতা। কিন্তু ইসলাম এ মালিকানা এককভাবে নারীকে প্রদান করেছে। মোহরানা কোনো প্রকার যৌতুক নয়। আসলে মোহরানা বিয়ের একটি অবিচ্ছেদ্য অংগ এবং মোহরানা ছাড়া বিয়ে শুদ্ধ হয় না। অর্থাৎ ভরণ-পোষণের জন্য নারীকে নিজের ওপর খুব বেশি নির্ভর করতে হয় না। এ ব্যাপারে ব্যাপক দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে পুরুষের ওপর। এমতাবস্থায় উত্তরাধিকার আইনে নারী অপেক্ষা পুরুষদের পাওনা যে বেশি হবে তা সহজেই অনুমান করা যায়।

একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, স্বামী স্ত্রী পরস্পরের সহযোগিতার ভিত্তিতে গড়ে ওঠে সুন্দর সংসার। নারীরাও পরিবারের আয় বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। তারা কাজ করে বলেই সংসারের ব্যয় হ্রাস পায়, আয় বৃদ্ধি পায়। পরিশেষে এ প্রসংগে এটুকু বলাই যথেষ্ট যে, ইসলামী আইন অনুসারে নারীরা ভরণ-পোষণের দায় দায়িত্ব থেকে মুক্ত। এমন কি কোলের শিশুকে দুধ পান করানোর ব্যাপারেও নারীর কোনো বাধ্যবাধকতা

নেই। মা যদি সন্তানকে দুধ পান করাতে অসম্মতি প্রকাশ করেন, সে ক্ষেত্রে পুত্রের জন্য নিজ খরচে একজন দুধ-মা জোগাড় করাও পিতার দায়িত্ব।

বিয়ে-শাদীর ব্যাপারেও অসংখ্য প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়। ইসলামের দৃষ্টিতে বিয়ে হলো দুপক্ষের মধ্যে চুক্তি । উভয় পক্ষের স্বাধীন ও স্বেচ্ছাসম্মতির ভিত্তিতে এ চুক্তির সম্পাদন করা হয়। এ ব্যাপারে পিতা-মাতা অবশ্যই তাদের অভিজ্ঞতা ও পরামর্শ দ্বারা সন্তানকে সাহায্য করে থাকেন। তবু একথা সত্য যে, চুক্তিপত্র সম্পাদনের বিষয়টি চূড়ান্তভাবে নির্ভর করে বর ও কনের সম্মতির ওপর। এ ক্ষেত্রে আইনগতভাবে ছেলে বা মেয়ের অধিকারের মধ্যে কোনো তারতম্য নেই। বিশেষ কোনো শ্রেণী বা সমাজে এ নিয়ম লংঘন করা হতে পারে, চালু থাকতে পারে ভিন্ন কোনো সামাজিক রীতিনীতি, কিন্তু আইনের সাথে অসংগতিপূর্ণ রীতিনীতি কখনো গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

মুসলিম আইনে বহু বিবাহের যে সমর্থন দৃষ্ট হয় তা নির্ভর করে স্ত্রীদের এরূপ জীবন গ্রহণের সম্মতির ওপর। আইন বহু বিবাহ চাপিয়ে দেয় না বরং শুধুমাত্র অনুমতি দেয় নির্দিষ্ট কিছু অবস্থার প্রেক্ষিতে। পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, বহুবিবাহ সংক্রান্ত ইসলামের এ বিধানটি সামাজিক চাহিদার সাথে খুবই সঙ্গতিপূর্ণ, উপযোগী এবং বাস্তবসম্মত। ধরা যাক একজন স্ত্রীর কয়েকটি শিশু রয়েছে। সে শয্যাশায়ী এবং আরোগ্য লাভের কোনো সম্ভাবনা নেই। সে সংসারের অপরিহার্য কাজগুলো করতে পারছে না। নিত্যদিনের কাজকর্ম করার জন্য কাজের মেয়ে রাখার মত সামর্থ স্বামীর নেই। এমতাবস্থায় অসুস্থ স্ত্রী হয়তো স্বামীকে আরেকটি বিয়ে করার জন্য সম্মতি দিলো। অন্যদিকে এরূপ একটি পরিবারে দ্বিতীয় স্ত্রী হিসেবে আসতে রাজী আছে এমন একটি মেয়েও পাওয়া গেলো। সে ক্ষেত্রে বহু বিবাহে অসুবিধা কোথায়। মজার ব্যাপার এই যে, আইনগতভাবে বিয়ে-শাদীর মাধ্যমে এরূপ ভগ্নপ্রায় একটি পরিবারে শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগকে পাশ্চাত্যের আইন অনুমোদন করে না, অথচ নৈতিকতা বিরোধী অসামাজিক আচরণকে সমর্থন করে পুরোপুরিভাবে।

আসলে ইসলামী আইনের সাথে যুক্তির সংযোগ রয়েছে। ইসলাম কেবলমাত্র তখনই একাধিক বিবাহকে অনুমোদন করে যখন কোনো নারী স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে বিয়ের ব্যাপারে সম্মতি জ্ঞাপন করে এবং এ ধরনের জীবনব্যবস্থা মেনে নিতে রাজী থাকে। অর্থাৎ ইসলামী আইনে একাধিক

বিবাহ বাধ্যতামূলক নয়, বরং কেবলমাত্র বিশেষ কতগুলো পরিস্থিতিতে এটাকে অনুমোদন করে এবং এটা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে নারীর সম্মতির ওপর। এজন্য প্রথম স্ত্রীর সম্মতি যেমন প্রয়োজন তেমনি প্রয়োজন যে নারী দ্বিতীয় স্ত্রী হিসেবে আসবে তার সম্মতির। যে পুরুষের ঘরে একজন স্ত্রী আছে তাকে বিয়ে করার ব্যাপারে যে কোনো মহিলা অস্বীকৃতি জানাতে পারে। আর আমরা এটাও দেখেছি যে, একজন মহিলা স্বেচ্ছায় সম্মতি না দিলে তাকে বিয়ের জন্য বাধ্য করা যায় না। এমতাবস্থায় কোনো মহিলা দ্বিতীয় স্ত্রীর পদমর্যাদা নিয়ে কোনো পুরুষকে বিয়ে করতে সম্মত হলে সেজন্য আইনকে দায়ী করা যাবে না। এমন বলা ঠিক হবে না যে, আইন পুরুষদের ক্ষেত্রে পক্ষপাতিত্ব করেছে এবং নারীদের ক্ষেত্রে অবিচার করেছে। তাছাড়া স্বামীর এক পত্নী থাকার বিষয়টি প্রধানত প্রথম স্ত্রীর উপর নির্ভর করে। বিয়ের চুক্তি বা কাবিন সম্পাদনকালে স্ত্রী এ শর্ত আরোপ করতে পারে যে, স্বামী কখনো দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করতে পারবে না। তাকে এক পত্নী নিয়েই জীবন কাটাতে হবে। অন্যান্য চুক্তির ন্যায় এ শর্তটিও তখন আইনগতভাবে বৈধ হয়ে যায়। কিন্তু কোনো নারী যদি এ অধিকার প্রয়োগ করা থেকে বিরত থাকে, তাহলে আইনের কিছুই করার থাকবে না। যা হোক বহু বিবাহ প্রথা মুসলিম সমাজের বহুল প্রচলিত কোনো ব্যবস্থা নয়। এটা একটা ব্যতিক্রম মাত্র। এরও কতগুলো সামাজিক ও আনুসংগিক সুবিধা রয়েছে।

একজন লোক কয়টি বিয়ে করতে পারবে সে ব্যাপারে প্রাচীন ধর্মীয় আইনে কোনো বাধা নিষেধ নেই। খৃস্টান ধর্মে বিয়ে বলতে এক বিবাহ বুঝায়। এমন কি সেখানেও যীশুখৃস্ট বহু বিবাহের বিরুদ্ধে কোনো বক্তব্যই রাখেননি। অবশ্য লুথার মেলাংকথন বুছার এর মত প্রখ্যাত খৃস্টান ধর্মবেত্তাগণ বহু পত্মীর একটি আইনগত সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তাদের উপদেশ মতে, একজন পুরুষ দশজন মহিলা বিয়ে করতে পারে। মথী লিখিত সুসমাচারের বর্ণনা মতে যীশুখৃস্ট একজন পুরুষের একই সময়ে দশজন কুমারী বিয়ে করার কথা বলেছেন। (২৫ ঃ ১-১২)। হতে পারে যে, খৃস্টান ধর্মে বহু বিবাহের ব্যাপারে যে অনুমোদন রয়েছে খৃস্টান সম্প্রদায় তা থেকে কোনো সুযোগ গ্রহণ করেনি। তবু একথা সত্য যে, আইনটি সংশোধন করা হয়নি। মানবেতিহাসে ইসলাম একমাত্র ব্যতিক্রম। কেবলমাত্র ইসলামই স্পষ্টভাবে বহু বিবাহের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছে। অবশ্য একথা সত্য যে, ধর্মীয় অনুমোদন থাকা সত্ত্বেও মুসলমানগণ এ থেকে কোনো ফায়দা নেয় না।

সুদূর অতীতকাল থেকে মুসলিম আইনে বিয়ে-শাদীর সময় চুক্তি সম্পাদনের নিয়ম চালু রয়েছে। স্বামীর একচ্ছত্রভাবে স্ত্রীকে তালাক দেয়ার অধিকার রয়েছে। আবার চুক্তি সম্পাদনকালে স্ত্রীও অনুরূপ অধিকার সংরক্ষণ করতে পারে। তাছাড়া স্বামী যদি স্ত্রীর প্রতি তার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হয়, বিশেষ কোনো অসুস্থতায় ভোগে, অথবা স্বামী যদি বছরের পর বছর ফেরারী হয়ে থাকে এবং স্ত্রী যদি অভিযোগ উত্থাপন করে তাহলে আদালত স্বামী ও স্ত্রীর বিচ্ছেদের নির্দেশ দিতে পারে। তাছাড়া স্বামী ও স্ত্রী পরস্পরের সম্মতিক্রমে এবং কতগুলো শর্তের ভিত্তিতে বিবাহে বিচ্ছেদ ঘটাতে পারে।

কুরআন মজীদের বিধান এই ঃ

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا ـ النساء : ٣٥ ـ

"স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বিরোধের আশংকা করলে সালিশ নিযুক্ত করবে।"–সূরা আন নিসা ঃ ৩৫

এ স্থলে রাসূলে করীম (স)-এর একটি হাদীস বিশেষভাবে স্মরণ করা যেতে পারে। আর তা হচ্ছে ঃ "ইসলামে অনুমোদিত কাজগুলোর মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ (তালাক) আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বেশি অপসন্দনীয় কাজ।"

দ্বাদশ অধ্যায়

ইসলামে অমুসলিমের মর্যাদা

আপন ও পরের মধ্যে আত্মীয় ও আগন্তুকের মধ্যে পার্থক্য এমন কি বৈষম্য সৃষ্টি হওয়াটাই স্বাভাবিক। বৌদ্ধিক ও নৈতিক বিকাশের সাথে সাথে মানব সমাজে বিদেশীকে আত্মীয়করণ সহজতর করার প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়।

একটি সমাজ বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠতে পারে। যদি আত্মীয়তার বন্ধন বা রক্তের সম্পর্কই হয় সমাজ প্রতিষ্ঠার ভিত্তি, তাহলে সেখানে বিদেশীকে দেশীয় করণের প্রশ্নটি অবান্তর। কস্মিনকালেও এটা সম্ভব নয়। আবার যদি গায়ের রং বা বর্ণই হয় সমাজ প্রতিষ্ঠার ভিত্তি, তাহলে সে ক্ষেত্রেও দেশীয়করণ সম্ভব নয়। আর গায়ের রং বা বর্ণ এমন একটা জিনিস যা কখনো গোপন করা যায় না। ক্ষেত্র বিশেষে ভাষাও সমাজের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। সে ক্ষেত্রেও কাউকে প্রকৃত অর্থে দেশীয়করণের জন্য দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন। জন্মস্থানের উপর ভিত্তি করে সমাজ গড়ে তোলার প্রশ্নটি আরো ঠুনকো, কারণ মানুষ এখন কোনো শহর বা রাষ্ট্রের সীমারেখার মধ্যে আবদ্ধ থাকে না। ফলে সামাজিক ঐক্য প্রতিষ্ঠার উপকরণ হিসেবে জন্মস্থানের উপর তেমন কোনো গুরুত্ব আরোপ করা যায় না।

বস্তুতপক্ষে উপরে উল্লেখিত বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে কোনো সমাজ গড়ে উঠলে সেটাকে আকস্মিক ঘটনা বলতে হবে। এ সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলোর সাথে পশু প্রবৃত্তির সংযোগ বেশি। মানুষের বিবেক বুদ্ধির কাছে এগুলোর গুরুত্ব খুবই সামান্য। এটা সর্বজন বিদিত যে, জাতীয়তার এসব ধারণা ইসলাম সম্পূর্ণরূপে বাতিল করে দিয়ে কেবলমাত্র বিশ্বাসের অভিন্নতাকে গ্রহণ করেছে জাতি গঠনের উপাদান হিসেবে। আর ভাব বা বিশ্বাস হলো এমন একটা জিনিস যা মানুষের পসন্দের উপর নির্ভর করে। রং, বর্ণ, জন্মস্থান বা রক্তের বন্ধনের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। ভাব বা বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে যে সমাজ গড়ে ওঠে সে সমাজে আত্মীয়করণ বা দেশীয়করণের বিষয়টি খুবই সহজ। গোটা মানবজাতির জন্য এর দুয়ার থাকে সম্পূর্ণরূপে উন্মুক্ত। তাছাড়া এ পন্থাটি যেমন বাস্তবসম্মত তেমনি যুক্তিসংগত। ভাব বা বিশ্বাসের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সমাজে একজন মানুষের জীবন অনায়াসেই শান্তি ও প্রশান্তিতে ভরে ওঠে।

যদি একজন মুসলমানকে অথবা একজন পুঁজিবাদীকে সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহে বহিরাগত হিসেবে বিবেচনা করা হয়, যদি শ্বেতাংগদের দেশে একজন কৃষ্ণাংগকে পৃথক করে দেখা হয় কিংবা ইতালীতে একজন অ-ইতালীয় চিহ্নিত হয় বিদেশী হিসেবে তাহলে একটি মুসলিম দেশে একজন অ-মুসলিমকে বহিরাগত হিসেবে চিহ্নিত করা হলে বিস্মিত হবার কিছু থাকে না। কোনো কিছু বোঝার মানসিক অবস্থায় ভিন্নতা থাকতে পারে। তবুও ব্যক্তি স্ব-জাতি ও বিজাতির মধ্যে পার্থক্য করবেই। অন্যান্য রাজনৈতিক বা সামাজিক ব্যবস্থার ন্যায় ইসলামও আত্মীয়-অনাত্মীয় অথবা স্বদেশী ও বিদেশীদের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করে থাকে। তবে এ পার্থক্য নিরূপণের ক্ষেত্রে ইসলামের স্বতন্ত্র দুটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

ক. ইসলামের ভাবাদর্শ গ্রহণ করে যে কেউ বাধার প্রাচীর অতিক্রমের সুযোগ নিতে পারে।

খ. কিন্তু এ শ্রেণীর মধ্যে পার্থিব ব্যাপারে সামান্য ভিন্নতা থাকতে পারে। এখানে আমরা শেষোক্ত বিষয়ে আলোকপাত করবার চেষ্টা করবো।

ওহী সূত্রে প্রাপ্ত দায়িত্ব

মুসলমানেরা আল্লাহর বিধান মেনে চলে, দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ নেতার ইচ্ছাতেই কেবল তারা পরিচালিত হয় না—সত্যের সাথে সম্পৃক্ত এই সুবিদিত ফলিত তাৎপর্য কারো ভোলা উচিত নয়। সংখ্যাগুরুর সম্মতির ভিত্তিতে কোনো কোনো আইন প্রণীত হলেও সংখ্যালঘুরা সবসময়ে তাদের মতকে বাস্তবায়ন করার জন্য সংগ্রাম করে। আর আধুনিক গণতান্ত্রিক নিয়মে নির্বাচনের ধারাই এমন যে, একবার যারা সংখ্যালঘু হিসেবে বিবেচিত হয়েছে, পরের বারে তারাই হয়তো সংখ্যাগুরু হবে। প্রথমবারে তাদের যে মতটা প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিলো, এবার হয়তো তাদের মতটাই প্রতিষ্ঠা পাবে। তাছাড়া এটাও লক্ষ করা যায় যে, যারা ক্ষমতায় আসে তারা পূর্ববর্তীগণের সমস্ত রীতিনীতি বাতিল করে দেয়ার উদ্যোগ নেয়। এমন কি তারা প্রচলিত আইন-কানুনকে পাল্টে ফেলে। কিন্তু ইসলামী আইনের ব্যাপারটা আলাদা। এখানে যে কেউ নির্দ্বিধায় এ কথা স্বীকার করবে যে, অন্যান্য আইনের তুলনায় ইসলামী আইন অধিকতর স্থিতিশীল। সমাজের ক্রমবিকাশ বা পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে এ নিয়ম-নীতিগুলো কতটুকু উপযোগী, এ নিয়ে কেউ কখনো প্রশ্ন তোলে না। বস্তুতপক্ষে ইসলামী আইন-কানুন আল্লাহর তরফ থেকে নির্ধারিত বিধায় এমনটি হয়ে থাকে। এখানেই রয়েছে দুনিয়ার অন্য যে কোনো আইনের তুলনায় ইসলামী আইনের শ্রেষ্ঠত্ব।

ইসলামী আইনে এমন কতগুলো ধারা রয়েছে যেগুলোর মাধ্যমে অমুসলিমদের প্রতি ন্যায় বিচার নিশ্চিত করা হয়। রাজনৈতিক কোন্দল যত ব্যাপক বা সংসদীয় নির্বাচনের ফলাফল যাই হোক না কেন, ইসলামী আইনের কোনো পরিবর্তন ঘটে না অথবা কোনো শাসক বা সংসদ ইসলামী আইনের পরিবর্তন বা সংশোধন করতে পারে না। ফলে মুসলিম সম্প্রদায়কে কখনো কোনো রকম দুশ্চিন্তা বা ভয়-ভীতির মধ্যে থাকতে হয় না।

কতকগুলো মৌলিক বিষয়

বিশ্বাসী এবং অবিশ্বাসীগণ কখনো সমমর্যাদার হতে পারে না। যারা বিশ্বাসী বা মু'মিন তারা যাবেন জান্নাতে। আর অবিশ্বাসীরা যাবে জাহান্নামে। অবশ্য এসবই আখেরাতের ব্যাপার। ফকীহগণ সবসময়েই পার্থিব জীবনেই আত্মীয় ও আগন্তুক বিষয়ে তাদের মহৎ সমতানীতি উপস্থাপন করেছেন যা আজও আমরা প্রত্যক্ষ করি।

ধর্মীয় সহনশীলতার বিষয়টি এখানে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কুরআন মজীদ স্পষ্টভাবে ঘোষণা দিয়েছে যে, ধর্মের ব্যাপারে কোনো জোরজবরদস্তি নেই। মুসলমান শাসনাধীন অঞ্চলে যে সমস্ত অমুসলিম স্থায়ীভাবে বসবাস করে অথবা সাময়িকভাবে অবস্থান করে তাদের সকলের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব। তাছাড়া তাদের সকলেরই বিবেকসম্মত মত প্রকাশ করার সুযোগ প্রদান করা হয়েছে।

কুরআন মজীদে এরশাদ হয়েছে ঃ

وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَٰمَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ ○ - التوبة : ٦

"মুশরিকদের মধ্যে কেউ তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করলে তুমি তাকে আশ্রয় দেবে যাতে সে আল্লাহ্র কালাম শুনতে পারে। অতপর তাকে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দেবে কারণ তারা অজ্ঞ লোক।"

–সূরা আত তাওবা ঃ ৬

বস্তুতপক্ষে ধর্মীয়, জাতিগত, রাজনৈতিক এবং অন্যান্য কারণে নির্যাতিতদের সবসময়ে ইসলামী দেশে নিরাপদ আশ্রয় পেতে দেখা যায়। বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, ইসলাম মুসলমানদেরকে যুদ্ধের ময়দানে

অবস্থানকালেও অমুসলিমদের সাথে সহযোগিতা করার নির্দেশ দিয়েছে। কুরআন মজীদের ঘোষণা এই যে, (৫ ঃ ২) পারস্পরিক সহযোগিতা কেবলমাত্র মুসলমানদের মধ্যেই সীমিত থাকবে না। তাকে সহযোগিতা করতে হবে গোটা মানবজাতির সাথে। সেখানে গোত্র বা ধর্মের কোনো ভেদাভেদ থাকবে না।

নবী করীম (স)-এর জীবনের কতগুলো ঘটনা

হিজরত করে নবী করীম (স) যখন মদীনায় আসেন তখন সেখানে বিরাজ করছিলো চরম বিশৃংখলা ও অরাজকতা। বিভিন্ন জাতি ও উপজাতির মধ্যকার আত্মকলহ ছিলো তুঙ্গে। রাষ্ট্র বা রাজা সম্পর্কে তাদের কোনো প্রত্যক্ষ ধারণা ছিলো না। আত্মকলহে লিপ্ত জাতিগুলোর মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য কেউ তখনো উদ্যোগ নেয়নি। প্রিয়নবী (স) সেই মদীনায় আসার সপ্তাহ কয়েকের মধ্যে সেখানকার জনগণকে শৃঙ্খলার মধ্যে নিয়ে আসতে সমর্থ হন। তিনি সেখানে প্রতিষ্ঠা করেন একটি নগর রাষ্ট্র। মুসলমান, ইহুদী ও পৌত্তলিকরা একটি সামাজিক চুক্তির মাধ্যমে এ নগর রাষ্ট্রের আওতার মধ্যে চলে আসে। খুব সম্ভব কিছু সংখ্যক খৃষ্টানও ছিলো।

শুরুতে এই মুসলিম রাষ্ট্রটি ছিলো সংঘ বা জাতিপুঞ্জ ধরনের। কারণ বহু জাতির সমন্বয়ে গড়ে উঠেছিলো এ নগর রাষ্ট্র। রাষ্ট্রের লিখিত সংবিধানটি এখনো অপরিবর্তিতভাবে সংরক্ষিত আছে। সংবিধানের ২৫নং ধারায় লেখা আছে, "মুসলমানদের জন্য তাদের দীন ইহুদীদের জন্য তাদের ধর্ম।" এ সংবিধানটিতে এও বলা হয় যে, সমতা ও ন্যায়বিচার করা হবে। ইবনে হিশাম এবং আবু ওবায়দার বর্ণনা মতে উক্ত সংবিধানে একটি ব্যতিক্রমধর্মী ধারায় সংবিধানটিতে ইহুদীদেরকে মুসলমানদের সাথে একই সম্প্রদায় বলে উল্লেখ করা হয়। সংবিধানের একটি ধারায় আরো বলা হয়েছে যে, চুক্তিভুক্ত সকল জাতি রাষ্ট্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ। যুদ্ধাবস্থায় এক রকম, আবার শান্ত-স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে তাদেরকে অন্যভাবে বিবেচনা করা যায় না।

নগর রাষ্ট্র মদীনার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বেশ কিছু সংখ্যক বিধর্মী পৌত্তলিক বসবাস করত। বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, নবী করীম (স) এ সমস্ত গোত্রের সাথেও সহযোগিতামূলক মৈত্রীচুক্তি সম্পাদন করেন। তাও আবার নগর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে। তাদের অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করে মদীনা নগর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দশ বছর পর। অথচ এ

সময়ে তাদের পারস্পরিক সম্পর্কে কোনো ফাটল ধরেনি অথবা সন্ধিপত্র বাতিল হয়নি। পরবর্তী ঘটনাগুলো থেকে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হবে।

দ্বিতীয় হিজরীতে মক্কার কাফির-মুশরিকরা আবিসিনিয়ায় একটি কূটনৈতিক মিশন প্রেরণ করে। মক্কার যে সমস্ত মুসলিম আবিসিনিয়ায় সম্রাট নাজ্জাশীর দরবারে আশ্রয় নিয়েছিলেন তাদের বহিষ্কারের জন্য দাবী উথাপন করাই ছিলো মিশনের উদ্দেশ্য। প্রকৃতপক্ষে এ সমস্ত মুসলিম স্বগোত্রীয়দের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে সুদূর আবিসিনিয়ায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। কাফির-মুশরিকদের দুরভিসন্ধির মুকাবিলা করা এবং দেশ ত্যাগী মুসলমানদের পক্ষে নাজ্জাশীর সমর্থন লাভের আশায় নবী করীম (স)-ও একজন প্রতিনিধি প্রেরণ করেন যাঁর নাম আমর ইবনে উমাইয়া আদ-দামরী। তিনি তখনো ইসলাম গ্রহণ করেন নি। তিনি ছিলেন উপরোক্ত সংবিধানে স্বাক্ষরকারী পার্শ্ববর্তী একটি মিত্র গোত্রের লোক।

এমন এক সময় এসেছিলো যখন সীমান্তের ব্যাপক অংশ জুড়ে অবিরাম যুদ্ধ চলছিলো অথচ সে সময়ে সামরিক বিভাগে চাকুরী করে কেউ জীবিকা অর্জন করার কথা চিন্তাও করত না। কারণ সে সময়ে যুদ্ধের ঝুঁকির পরিমাণ ছিলো বেশি। যারা সৈনিক হিসেবে যুদ্ধ করতো তাদের আর্থিক অবস্থাও ছিলো অসচ্ছল। যাহোক এ সমস্ত যুদ্ধে মুসলমানদের পক্ষে অমুসলিমদের অংশ নেয়ার সুযোগ কি ছিল ? আরবের অসংখ্য অমুসলিম তখন মুসলিম শাসনের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছিলো। তাদের শাসন মেনে নিয়েছিলো অকপটে। তাছাড়া অন্য কারো সাথে ষড়যন্ত্র করে মুসলমানদের উৎখাত করার কোনো চিন্তাও তাদের ছিলো না। তবু এ সমস্ত অমুসলিমদের সম্পর্কে সন্দেহ থাকলে তাদেরকে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা থেকে অব্যাহতি দেয়া হত। অমুসলিমরা এতে বরং খুশী হতো। অথচ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মুসলমানদের ছুটে যেতে হতো যুদ্ধের ময়দানে। এ অবসরে অমুসলিমরা নিজেদের কাজকর্ম ও ব্যবসা-বাণিজ্য চালাতে পারতো পুরো মাত্রায়। ফলে তাদের অর্থনৈতিক উন্নতি হতো। বিনিময়ে তারা জিযিয়া নামে অতিরিক্ত একটি ট্যাক্স দিত। অবশ্য মহিলা, শিশু এবং দরিদ্রদের জিযিয়া প্রদান করতে হতো না। জিযিয়ার পরিমাণ ছিলো যৎ সামান্য। নবী করীম (স)-এর আমলে একজন অমুসলিমের বার্ষিক জিযিয়ার পরিমাণ ছিলো মাত্র ১০ দিরহাম। এটা ছিলো মোটামুটিভাবে একটি মধ্যবিত্ত এক পরিবারের দশ দিনের খরচের সমান। তাছাড়া একজন অমুসলিম যদি বছরের কোনো সময়ে যুদ্ধে অংশ নিত তাহলে সেও ঐ বছরের জিযিয়া প্রদান করা থেকে অব্যাহতি পেত। ইসলামের প্রাথমিক

অবস্থায় মদীনায় অথবা অন্য কোথাও জিযিয়া প্রদানের প্রচলন ছিলো না। নবম হিজরীতে জিযিয়া সংক্রান্ত আয়াত নাযিল হয়। বলে রাখা আবশ্যক যে, জিযিয়া ইসলামের অবশ্য পালনীয় কোনো বিধান নয় বরং বিশেষ অবস্থা ও পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে জিযিয়ার বিধান কার্যকর করা হয়। নিম্নের দুটি ঘটনা থেকে বিষয়টি স্পষ্ট হবে।

নবী করীম (স)-এর এক ছেলের নাম ইবরাহীম (রা)। তাঁর মা ছিলেন একজন মিসরীয় কিবতী মহিলা। ইবরাহীম (রা) তখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত। সে সময়ে নবী করীম (স) বলেছিলেন যে, যদি ইবরাহীম আরোগ্য লাভ করে তাহলে ইবরাহীমের মায়ের সম্মানে কিবতীদের জিযিয়া থেকে অব্যহতি দেবেন। ফুসতাত (কায়রো) থেকে লোহিত সাগর পর্যন্ত একটি খাল ছিলো। হযরত উমর (রা)-এর শাসনামলে একজন অমুসলিম মিসরবাসী চমৎকার একটি পরিকল্পনা নেয়। সে প্রস্তাব দেয় যে, এ খালটি পুনঃ খনন করা হলে নৌপরিবহনের উন্নতি ঘটবে এবং মিসর থেকে মদীনায় খাদ্যসামগ্রী পাঠানো অনেকখানি সহজতর হবে। সে খালটির নামই নহরে আমীরুল মু'মিনীন। খলীফা তাঁর পরামর্শে খুশী হয়ে তাকে গোটা জীবনের জন্য জিযিয়া থেকে অব্যহিত প্রদান করেন।

তাছাড়া বর্তমানে অবস্থারও পরিবর্তন ঘটেছে। এখন বিশ্বের সর্বত্র ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে গেছে। লাখ লাখ মুসলমান অমুসলিম শাসনাধীন অঞ্চলে বসবাস করে। এমতাবস্থায় খৃস্টান, ইহুদী, হিন্দু অথবা অন্যান্যদের ওপর যদি জিযিয়া আরোপ করা হয় তাহলে স্বাভাবিক-ভাবেই খৃস্টান এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের শাসনাধীন অঞ্চলে এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে। এ অবস্থার প্রেক্ষিতে মুসলিম আইনবিদগণ অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, জিযিয়া আরোপ করার সময় এ বিষয়টি অবশ্যই বিবেচনায় আনতে হবে।

একটি হাদীসে এরূপ উল্লেখ আছে যে, নবী করীম (স) মৃত্যুশয্যায় থাকা অবস্থায় হিজাজের খৃস্টান ও ইহুদী অধিবাসীদের অন্যত্র স্থানান্তরের নির্দেশ দিয়েছিলেন। হাদীস শরীফে এ ধরনের নির্দেশ প্রদানের কোনো কারণ উল্লেখ করা হয়নি। তবে এটা স্পষ্ট যে, এ বিধানটি সর্বসাধারণের জন্য প্রযোজ্য ছিলো না। বরং কিছুসংখ্যক লোকের বিরুদ্ধে তাদের রাজনৈতিক আচরণের কারণে এরূপ ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিলো।

বলে রাখা আবশ্যক যে, খুলাফায়ে রাশেদীনের আমলে অনেক মুসলমানের দাস-দাসী ছিলো অমুসলিম। তাদের অনেকেই মুনিবের সাথে

মক্কা ও মদীনায় বসবাস করত; এ প্রসঙ্গে একজন খৃস্টান চিকিৎসকের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। পবিত্র কা'বা ঘরের মিনারের নীচেই ছিল তার চিকিৎসা কেন্দ্র। ঐতিহাসিক ইবনে সা'দ উল্লেখ করেছেন যে, জুফাইন নামক একজন খৃস্টান মদীনার একটি স্কুলে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শিখাতেন।

পরিশেষে নবী করীম (স)-এর আরো দুটি হাদীসের উল্লেখ করা যেতে পারে। আল মাওয়ারদী থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (স) মৃত্যুশয্যায় শায়িত অবস্থায় বলেছেন যে, আমার তরফ থেকে অমুসলিম নাগরিকদের নিরাপত্তা প্রদান করা হয়েছে নিষ্ঠার সাথে তা প্রতিপালন কর। (দ্রঃ আল মাওয়ারদী) তিনি আরো বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো অমুসলিমের উপর নির্যাতন চালাবে, সে শেষ বিচার দিবসে আমাকে নির্যাতিতের পক্ষে সুপারিশকারী হিসেবে দেখতে পাবে।—আবু দাউদ

পরবর্তীকালের অনুশীলন

নবী করীম (স) আমাদের জন্য যে নির্দেশ রেখে গেছেন, নিজের জীবনে তিনি যা প্রতিপালন করেছেন মুসলমানদের জন্য সেটাই উত্তম ও শ্রেষ্ঠ আইন। পরবর্তীকালের মুসলমানগণ এগুলোকেই আইন হিসেবে বিন্যস্ত করেছেন এবং বাস্তব জীবনে অনুসরণ করেছেন নিষ্ঠার সাথে। এখানে তার কিছু উদাহরণ উপস্থাপন করা হলো।

একবার খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত উমর (রা) সিরিয়ার গভর্নরকে রাজস্বের হিসেব সংরক্ষণে দক্ষ ও অভিজ্ঞ একজন গ্রীক অধিবাসীকে মদীনায় পাঠানোর নির্দেশ দেন। তদনুসারে একজন খৃস্টানকে মদীনায় পাঠানো হলো এবং তাকে নিয়োগ করা হলো রাজস্ব প্রশাসনের প্রধান হিসেবে। (দ্র. আল বালাজুরী. আনাস)

এমনকি কখনো কখনো খলীফা হযরত উমর (রা) অমুসলিমদের সাথে সামরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন।

ইসলামে ইমামের (মসজিদের ইমাম) পদটি মুসলমানদের জন্য নির্ধারিত রাখা হয়েছে। ইমাম অর্থ নেতা। ইসলাম জীবনের সকল দিক ও বিভাগের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে। ইসলাম আধ্যাত্মিক এবং পার্থিব জীবনের মধ্যে সমন্বয়ের বিধান দিয়েছে। সে কারণেই নামাযে ইমামতি করা যেমনি রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব তেমনি তার একটি অধিকার। এভাবে যদি

বিষয়টি বিবেচনায় আনি তাহলে কোনো অমুসলিম মুসলিম দেশের রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচিত হতে পারেন না। কিন্তু এই ব্যতিক্রমের অর্থ এই নয় যে, দেশের রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড থেকে অমুসলিম নাগরিককে বাদ দিতে হবে।

খলীফাগণের আমল থেকেই মুসলিম রাষ্ট্রে অমুসলিমরা গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন পদে এমন কি মন্ত্রীর পদপর্যাদায় নিয়োগ হয়ে আসছেন। শাফেঈ মাযহাবের ফকীহ বিশেষ করে আল মাওয়ারদী এবং হাম্বলী মাযহাবের ফকীহ বিশেষ করে আবু ইয়ালা আল-ফাররা খলীফা কর্তৃক অমুসলিম নাগরিককে মন্ত্রী হিসেবে এবং নির্বাহী পরিষদের সদস্য হিসেবে নিয়োগ সমর্থন করেছেন। অন্যত্র বলা হয়েছে যে, প্রিয় নবী (স) নিজেই একজন অমুসলিম রাষ্ট্রদূত প্রেরণ করেছিলেন আবিসিনিয়ায়। বিশ্বের দরবারে যে সমস্ত দেশ ধর্মনিরপেক্ষতা ও গণতন্ত্রের ধারক বলে পরিচিত সে সমস্ত দেশেও এরূপ নযীর পাওয়া যাবে না।

সামাজিক জীবনে স্বাধীনতা

ইসলামের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই যে, এখানে অমুসলিমদেরকে সামাজিক এবং বিচার সংক্রান্ত বিষয়ে স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। কুরআনুল করীমে উল্লেখ আছে ঃ

وَاَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتٰبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ الْحَقِّ ط

"তোমার প্রতি সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করেছি এর পূর্বে অবতীর্ণ কিতাবের সমর্থক ও সংস্কারক রূপে। সুতরাং আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুসারে তুমি তাদের বিচার-ফায়সালা করবে এবং যে সত্য তোমার নিকট এসেছে তা ত্যাগ করে তাদের খেয়াল খুশীর অনুসরণ করবে না।"–সূরা আল মায়েদা ঃ ৪৮

কুরআনুল করীমের এ নির্দেশের প্রেক্ষিতেই নবী করীম (স) এবং খলীফাগণ ইসলামী রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিকদের বিচার সংক্রান্ত বিষয়ে স্বাধীকার প্রদান করেছিলেন। তারা স্বাধীকার ভোগ করেছিলেন দেওয়ানী, ফৌজদারী, ব্যক্তি আইন প্রভৃতি সকল বিষয়ে। খলীফাগণের সমসাময়িক কালে খৃস্টানদের দেয়া তথ্য থেকে জানা যায় যে, মুসলিম শাসনামলে খৃস্টান যাজকদের পার্থিব বিচার ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছিলো। আব্বাসীয়

শাসনামলে রাষ্ট্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের মধ্যে ইহুদী এবং খৃস্টান ধর্ম যাজকগণের স্থান ছিলো অনেক উচ্চে। তাদের যোগাযোগ ছিলো সরাসরি খলীফার সাথে।

নবী করীম (স)-এর আমলে নগর রাষ্ট্র ইহুদীদের নিজস্ব বায়তুল মিদরাস ছিলো যা ব্যবহৃত হত ইহুদীদের ধর্মসভা ও শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে। নাযরানের খৃস্টানদের সাথে চুক্তি সম্পাদন কালে নবী করীম (স) তাদের জীবন ও সম্পদের পূর্ণ নিরাপত্তা দেন। এমন কি চুক্তিতে তিনি স্পষ্টভাবে খৃস্টান সম্প্রদায়ের জন্য বিশপ ও পাদ্রী মনোনয়ন দেয়ার অধিকার প্রদান করেন।

সাধারণ জনগণের মধ্যে গোত্রপ্রধান ও নেতাকে অনুকরণ অনুবর্তন করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়, তারা সাধারণত গোত্র প্রধানদের সাজ-সজ্জা, কেশবিন্যাস, আচার-আচরণের ধরন, কথা বলার স্টাইল ইত্যাদি অনুসরণ করে। কিন্তু চিন্তা-ভাবনার ব্যাপারে নেতা বা গোত্র প্রধানদের সাথে সাধারণ জনগণের কোনো ঐক্য থাকে না। ফলে সরকার বা গোত্র প্রধানদের সাথে জনগণের যে ঐক্য দেখা যায় তা একেবারেই বাহ্যিক। এ জাতীয় ঐক্য শাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে কোনো উপকারে আসে না। এতে বরং অনুকরণ প্রিয় জনগোষ্ঠীর নৈতিক অধপতন ঘটে।

ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমরা বসবাস করে সংরক্ষিত জনগোষ্ঠী বা যিম্মী হিসেবে। এদের ন্যায়সংগত অধিকার ও সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করা সরকারের দায়িত্ব।

ইসলামী রাষ্ট্রে ব্যক্তির জীবন, সম্পদ ও মান সম্মানের পূর্ণ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা সরকারের দায়িত্ব। মুসলমানদের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার-উপযোগী একটি বিখ্যাত আইন গ্রন্থের নাম 'হিদায়া'। সেখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, কোনো প্রকার নিন্দা বা অপবাদ সেটা মুসলমান অথবা জিম্মী (অমুসলিম) যার বিরুদ্ধেই হোক না কেন, তা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। বাহরুর রায়েক নামক আইন গ্রন্থে আরো উল্লেখ আছে যে, একজন মৃত মুসলমানের দেহাবশেষ যেভাবে সম্মান করতে হয় তেমনি সম্মান করতে হয় একজন অমুসলিম (যিম্মী)-এর মৃতের দেহাবশেষকে। তাকে কোনো ভাবেই অপবিত্র করা যাবে না। কারণ কোনো অমুসলিমকে যদি জীবদ্দশায় নিরাপত্তা দেয়া হয়, হিফাযত করা হয় অন্যান্য অপবাদ থেকে, তাহলে তার মৃত্যুর পর সকল প্রকার অপবাদ অপবিত্রতা থেকে রক্ষা করাটাই বাধ্যতামূলক। ফকীহগণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, একজন মুসলিম

কোনো অমুসলিম রমণীর অমর্যাদা করলে সে তেমন শাস্তি পাবে যেমন শাস্তি পেত একজন মুসলিম রমণীর অমর্যাদা করলে। এ ব্যাপারে ইসলামী আইনবিদগণের মধ্যে কোনো মতানৈক্য নেই।

খলীফা হযরত উমর (রা)-এর আমলের ঘটনা। কিছু সংখ্যক মুসলমান একজন ইহুদীর জমিতে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। খলীফা হযরত উমর (রা)-এর কাছে যখন এ সংবাদ পৌঁছে তখন তিনি মসজিদটি ভেঙে ফেলার এবং উক্ত জমিখণ্ড ইহুদী মালিককে ফিরিয়ে দেয়ার নির্দেশ দেন। ১৯৩৩ খৃস্টাব্দে লেবাননের একজন খৃস্টান শিক্ষাবিদ অধ্যাপক কারদাহী লিখেছেন যে, বায়তুল ইহুদী নামে ইহুদীর সেই বাড়ীটি এখনো বিদ্যমান রয়েছে। দামেশকের প্রধান মসজিদ সম্পর্কে অনুরূপ একটি প্রসিদ্ধ কাহিনী রয়েছে। ইবনে কাসীর এবং অন্যান্য ঐতিহাসিকের বর্ণনায় বিষয়টি স্থান পেয়েছে। ঘটনাটি এ রকম, একজন উমাইয়া খলীফা একটি মসজিদ সম্প্রসারণের সুবিধার্থে পার্শ্ববর্তী একটি চার্চ দখল করেন। পরবর্তীতে এ অভিযোগটি খলীফা উমর বিন আবদুল আযীযের নিকট উপস্থাপন করা হয়। তৎক্ষণাৎ তিনি এ মর্মে নির্দেশ জারী করেন যে, গীর্জার যে অংশে বলপূর্বক মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে, তা ভেঙে ফেলতে হবে এবং উক্ত স্থান গীর্জার জন্য নির্ধারিত থাকবে। কিন্তু খৃস্টানরা অর্থের বিনিময়ে উক্ত ভূমিখণ্ডের মালিকানা প্রত্যাহার করে নেয়। এভাবেই উভয়ের মধ্যে একটি সমঝোতা প্রতিষ্ঠিত হয়।

এখানে হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয-এর আরেকটি নির্দেশনামার উল্লেখ করা যেতে পারে। এ বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যাবে ইবনে সা'দের ইতিহাস গ্রন্থে। গভর্নর আদি বিন আরতাতকে এ নির্দেশনামাটি প্রদান করা হয়েছিলো। তাঁকে এ মর্মে নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো ঃ

"অমুসলিমদের প্রতি নজর দাও এবং তাদের সাথে বিনয় নম্র ব্যবহার কর। তাদের মধ্যে কেউ যদি বার্ধক্যে পৌঁছে এবং নিজের বিষয় সম্পদ না থাকে, তাহলে তার ভরণপোষণের ব্যবস্থা নেয়া তোমার দায়িত্ব। যদি তার কোনো আপনজন থাকে, তবে তার কাছ থেকে ভরণপোষণ বাবদ অর্থ আদায় কর। যদি কেউ তার সাথে অন্যায় আচরণ করে তাহলে প্রতিশোধ নাও। আমি জানতে পেরেছি তুমি আমদানীকৃত মদের এক-দশমাংশ আদায় কর এবং তা সরকারী কোষাগারে জমা দাও। স্মরণ রেখো যে, এ কোষাগার তোমারও নয়, আমারও নয়। এর মালিকানা আল্লাহর। আমি তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি যে, এ জাতীয়

সম্পদ-এর পরিমাণ যত সামান্যই হোক না কেন, আর কখনো তা সরকারী কোষাগারে জমা নেবে না। যদি তুমি সম্পদের পবিত্রতা সম্পর্কে নিশ্চিত হও তাহলে অবশ্য ভিন্ন কথা। তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হোক।"

এখানে উমর ইবনে আবদুল আযীযের আরো একটি পত্রের উদ্ধৃতি দেয়া যেতে পারে। পত্রের বিষয়বস্তু এ রকম, পুরাতন নথিপত্রগুলো পর্যালোচনা কর। অন্যায়ভাবে কর আরোপ সংক্রান্ত উথাপিত আপত্তি এবং অন্যান্য অভিযোগগুলো নিষ্পত্তি করো। মুসলমান বা অমুসলমান কারো প্রতি কোনো প্রকার অন্যায় অবিচার করলে তার সংশোধন করো এবং প্রত্যেককেই তার ন্যায্য পাওনা ভোগ করতে দাও। অত্যাচার জর্জরিত কোনো লোক যদি মারা যায় তাহলে তার উত্তরাধিকারীর নিকট তার পাওনা হস্তান্তর করো।

এটা সকলের জানা কথা যে, কোনো কিছু ক্রয় বা বিক্রয়ের ক্ষেত্রে দূরের লোক অপেক্ষা প্রতিবেশীরা অগ্রাধিকার পেয়ে থাকে। ফকীহগণও এ ব্যাপারে একমত পোষণ করেন। এটা অমুসলিমদের ক্ষেত্রেও একটি স্বীকৃত নীতি।

অমুসলিমদের এমন কতগুলো রীতিনীতি বা প্রথা আছে যেগুলো ইসলামী আকীদা বা আচার আচরণের পরিপন্থী। এতদসত্ত্বেও ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাস করে অমুসলিমরা এ সমস্ত রীতিনীতি বা প্রথা মেনে চলার অধিকার ভোগ করে থাকে। যেমন মদ্যপান মুসলমানদের জন্য হারাম। অথচ অমুসলিম নাগরিকরা ইচ্ছামত মদ্যপান করতে পারে। এমন কি মদ আমদানী, উৎপাদন ও ক্রয়-বিক্রয়ের সুযোগ পেয়ে থাকে। অনুরূপভাবে তারা জুয়া খেলতে, কোনো নিকটাত্মীয়কে বিয়ে করতে ও সুদী কারবারে লিপ্ত হতে পারে। অথচ মুসলমানদের জন্য এ সবকিছু নিষিদ্ধ বা হারাম।

ইসলামের প্রথম যামানায় অমুসলিমদের এ সমস্ত অনৈসলামিক কাজ-কর্মগুলো মুসলমানদের উপর কোনো প্রভাব ফেলতে পারত না। এমন কি এ সমস্ত বিষয়গুলোর প্রতি মুসলমানরা বড় একটা আমলও দিত না। তবে আধুনিক আইন বিশারদগণের মতে, সুখী সমাজ ও সুন্দর বিশ্ব গড়ে তোলার জন্য মদের ব্যবসা ও মদপান নিয়ন্ত্রণ করা জরুরী। কেবলমাত্র সমাজের অংশ বিশেষ মদের ব্যবসা বা মদ ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকলে চলবে না, সমাজের গোটা জনগোষ্ঠীর উপর এ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আরোপ করা আবশ্যক। এ ব্যাপারে অমুসলিম চিন্তাবিদগণও অনুরূপ

ধারণা পোষণ করেন। ফলে মদের উপর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আরোপ করার ক্ষেত্রে এটা অনেকখানি সহজতর হয়েছে। তবে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্মীয় আচার-আচরণের ক্ষেত্রে যে বিভিন্নতা রয়েছে মুসলিম আইনবিদগণ সেসব বিষয়ে কোনো রকম হস্তক্ষেপ করেন না।

ইসলাম একজন অমুসলিমকে স্বাধীনভাবে ধর্ম-কর্ম পালন করার অধিকার দিয়েছে। নিষিদ্ধ করেছে জোর করে কাউকে ইসলামে দীক্ষিত করবার উদ্যোগকে। ইসলাম মুসলমানদের মধ্যে অত্যন্ত কঠোর শৃংখলা সংরক্ষণ করে।

ইসলামে জাতীয়তার মূল ভিত্তি হচ্ছে দীন (ধর্ম)। ভাষা, বর্ণ, গোত্র বা আঞ্চলিকতার প্রশ্নটি এখানে একেবারেই গৌণ। আর সে কারণেই স্বধর্মত্যাগ স্বাভাবিকভাবেই রাজদ্রোহ বা রাষ্ট্রদ্রোহিতা ও বিশ্বাসঘাতকতা হিসেবে বিবেচিত হয়। এজন্য ইসলামে কঠোর শাস্তির বিধান রয়েছে। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় এই যে, ইসলামের ইতিহাসে জাতীয় রাজদ্রোহের ঘটনা খুবই বিরল এবং শাস্তি প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তাও বড় একটা দেখা যায়নি। এমন একটা সময় ছিলো যখন প্রশান্ত অঞ্চল হতে আটলান্টিক মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে ছিলো মুসলিম রাজত্ব। বর্তমানে অবস্থার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিযোগিতায় তারা পিছিয়ে পড়েছে। এত কিছুর পরেও মুসলিম বিশ্বের কোথাও কোনো মুসলমান ধর্মত্যাগ করেছে এমন কথা শোনা যাবে না। উপনিবেশিক শক্তি মুসলমানদের ধর্মান্তর করার জন্য সম্ভাব্য সকল উদ্যোগের মুখেও কোনো মুসলিমের ইসলাম পরিত্যাগের খবর শোনা যায় না। বিবেকবান মানুষের জন্য এটা সত্যিকার অর্থেই বিস্ময়কর ব্যাপার। বরং বর্তমান সময়ে পাশ্চাত্য জগতেও ইসলাম যথেষ্ট প্রসার লাভ করেছে। ফিনল্যাণ্ড, নরওয়ে, ইটালী ও কানাডা থেকে আর্জেন্টিনা পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূ-ভাগ থেকে শোনা যাচ্ছে ইসলামের আহবান। অথচ এজন্য মুসলমানদের সুসংহত কোনো দাওয়াতী কার্যক্রম নেই।

জিহাদ

মুসলমানদের গোটা জীবনটাই আসমানী বিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। আধ্যাত্মিক ও জাগতিক সবকিছুই এর অন্তর্ভুক্ত। কেউ যদি কেবলমাত্র লোক দেখানোর জন্য নামায পড়ে, আল্লাহকে খুশী করার সংকল্প তার মধ্যে না থাকে, তখন তার নামায ইবাদাত হিসেবে গণ্য হবে না। এ ধরনের নামাযের জন্য শেষ বিচার দিনে তাকে শাস্তি পেতে হবে।

অপরদিকে কোনো মুসলিম যদি এ উদ্দেশ্যে খাবার গ্রহণ করে যে, খাদ্য খেলে শরীরে শক্তি বাড়বে। এ শক্তি আল্লাহর হুকুম আহকাম পালনে সহায়ক হবে, তখন এ পানাহার বিবেচিত হবে ইবাদাত হিসেবে। এমনকি স্বামী যদি আল্লাহর প্রতি আনুগত্য রেখে আল্লাহর দেয়া বিধান অনুযায়ী সংসার গড়ে তোলে তা হলে সেটাও নেক কাজ হবে। হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে, সওয়াবের আশায় স্ত্রীর জন্য কিছু ব্যয় করলে সেটা একটা সাদকার কাজ হয়।

যেখানে জীবনের ধারণা এরূপ, সেখানে নেককাজ ছাড়া কোনো ন্যায় সংগত সংগ্রাম হতে পারে না। ন্যায়সংগত কারণে যে যুদ্ধের আয়োজন করা হয়, যে যুদ্ধ নিয়ন্ত্রিত হয় ইসলামী বিধি-বিধান দ্বারা, কেবলমাত্র সে যুদ্ধকে ধর্মযুদ্ধ বলা হয়।

নবী করীম (স)-এর জীবনী পাঠ করলে তিন ধরনের যুদ্ধ সম্পর্কে জানা যায়। যেমন প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধ, শাস্তি প্রদানের জন্য যুদ্ধ এবং প্রতিরোধমূলক যুদ্ধ। এক তথ্যে জানা যায়, রোমান সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে একজন মুসলিম দূতের নির্মমভাবে হত্যা সংক্রান্ত ব্যাপারে রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াসের সাথে নবী করীম (স)-এর এক ঐতিহাসিক পত্র যোগাযোগ হয়। পত্রে তিনি সম্রাটকে তিনটি বিকল্প প্রস্তাব দেন। প্রথমত, কালেমা পড়ে ইসলামের পতাকা তলে শামিল হও। দ্বিতীয়ত, ইসলাম গ্রহণ না করলে জিযিয়া প্রদান করো। তৃতীয়ত, অন্যথায় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও। (দ্র. আবু উবায়েদ, কিতাবুল আমওয়াল, পৃ ৫৫)

প্রত্যেক মানুষেরই বিবেকের রায় অনুসারে চলার স্বাধীনতা রয়েছে। এ অধিকার প্রতিষ্ঠা করাই ছিলো নবী করীম (স)-এর জিহাদের প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। মুসলমানদের জন্য এটাই হলো প্রকৃত জিহাদ। শোষণ করার মনোভাব নিয়ে এ যুদ্ধ করা যাবে না। মনে রাখা যাবে না নিজের স্বার্থের কথা। আল্লাহর আইন, আল্লাহর হুকুম কায়েম করাই হবে জিহাদের একমাত্র লক্ষ্য।

❒

ত্রয়োদশ অধ্যায়

বিজ্ঞান ও শিল্পকলায় মুসলিমদের অবদান

মুসলমানগণ বিভিন্ন বিজ্ঞান ও কলার বিকাশ এবং উন্নয়নে যে অবদান রেখেছেন তার একটি সাধারণ নকশা এখানে তুলে ধরা হলো।

প্রথমেই বলে রাখা আবশ্যক যে, ইসলাম কেবলমাত্র একটা ধর্ম নয়, স্রষ্টার সাথে মানুষের সম্পর্কের মধ্যে ইসলামের আলোচনা সীমাবদ্ধ থাকে না বরং ইসলাম হচ্ছে একটি পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা। সে কারণেই বিজ্ঞান ও শিল্পকলা চর্চায় ইসলামী দৃষ্টিভংগী সম্পর্কে আলোকপাত করা আবশ্যক।

দুনিয়াদারীর জীবনকে ইসলাম নিরুৎসাহিত করেনি, বরং সুস্থ সুন্দর জীবনের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে কুরআন মজীদে এরশাদ হয়েছে ঃ

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ الَّتِيْ اَخْرَجَ لِعِبَادِهٖ وَالطَّيِّبٰتِ مِنَ الرِّزْقِ ط

"বল, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য যেসব শোভার বস্তু ও বিশুদ্ধ জীবিকা সৃষ্টি করেছেন তা কে নিষিদ্ধ করেছে ?"—সূরা আল আরাফ ঃ ৩২

কুরআন মজীদে তাদের প্রশংসা করা হয়েছে ঃ

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ○ - البقرة : ٢٠١

"যারা বলে হে আমাদের রব ! আমাদের ইহকালে কল্যাণ দাও এবং পরকালেও কল্যাণ দাও এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব হতে রক্ষা কর।"—সূরা আল বাকারা ঃ ২০১

কুরআন মজীদ শিক্ষা দেয় ঃ

وَابْتَغِ فِيْمَا اٰتٰكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَاَحْسِنْ كَمَا اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِى الْاَرْضِ ط اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ ○

"আল্লাহ যা তোমাকে দিয়েছেন তা দিয়ে আখেরাতের আবাস অনুসন্ধান কর। দুনিয়া হতে তোমার অংশ ভুলো না। পরোপকার করো

যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চেয়ো না। আল্লাহ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীকে ভালোবাসেন না।"–সূরা আল কাসাস ঃ ৭৭

বস্তুতপক্ষে এমনি একটি সুন্দর জীবনলাভের প্রত্যাশায় মানুষ জগত সম্পর্কে জানতে চায়। বিশ্বচরাচরে বিরাজমান সমস্ত বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান লাভের আশায় সে সাধ্যমত প্রচেষ্টা চালায়। তার নিরলস প্রচেষ্টার মূল উদ্দেশ্য দুটি। প্রথমত বিশ্বজগতের বিভিন্ন জিনিস থেকে উপকৃত হওয়া। দ্বিতীয়ত মহান আল্লাহ তাআলার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা। কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ

وَلَقَدْ مَكَّنّٰكُمْ فِى الْاَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيْهَا مَعَايِشَ ط- الاعراف : ١٠

"আমি তো তোমাদেরকে দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত করেছি এবং তাতে তোমাদের জীবিকার ব্যবস্থা করেছি।"–সূরা আল আরাফ ঃ ১০

আরো এরশাদ হয়েছে ঃ

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا ق- البقرة : ٢٩

"তিনি পৃথিবীর সবকিছু তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন।"
–সূরা আল বাকারা ঃ ২৯

অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

اَلَمْ تَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَاَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهٗ ظَاهِرَةً وَّبَاطِنَةً ط- لقمن : ٢٠

"তোমরা কি দেখ না আল্লাহ আকাশরাজ্য ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবকিছু তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন এবং তোমাদের প্রতি তাঁর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করেছেন।"–সূরা লুকমান ঃ ২০

কুরআন মজীদে একদিকে ইবাদাত করার তাকীদ করে এরশাদ হয়েছেঃ

فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ ○ الَّذِىْ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ لا وَّاٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ○

"তারা ইবাদাত করুক এ গৃহের (অর্থাৎ কা'বা শরীফের) রক্ষকের, যিনি তাদের ক্ষুধায় আহার দিয়েছেন এবং ভয় হতে তাদেরকে নিরাপদ করেছেন।"–সূরা কুরাইশ ঃ ৩-৪

অপরদিকে কাজ করার তাকীদ দিয়ে নির্দেশ করা হয়েছে ঃ

وَاَنْ لَّيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلاَّ مَاسَعٰى ○ـ النجم : ٣٩

"আর এই যে মানুষ তাই পায় যা সে করে।"-সূরা আন নাজম ঃ ৩৯

কুরআন মজীদে শুধুমাত্র আবিষ্কারের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়নি, বরং নিত্যনতুন বিষয় উদ্ভাবনের উপরও যথাযথ জোর দেয়া হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে ঃ

قُلْ سِيْرُوا فِى الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلُ ط كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّشْرِكِيْنَ ○ ـ الروم : ٤٢

"বল, তোমরা পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর এবং দেখ তোমাদের পূর্ববর্তীগণের পরিণাম কি হয়েছে। তাদের অধিকাংশই ছিলো মুশরিক।"-সূরা আর রূম ঃ ৪২

আবার একথাও উল্লেখ আছে যে,

الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ج رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلاً ج ـ ال عمران : ١٩١

"যারা দাঁড়িয়ে, বসে এবং শুয়ে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আকাশরাজ্য ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্বন্ধে চিন্তা করে এবং বলে হে আমাদের রব! তুমি এসব নিরর্থক সৃষ্টি করনি।"-সূরা আলে ইমরান ঃ ১৯১

জ্ঞান অর্জনের পন্থা-পদ্ধতি সম্পর্কেও কুরআন মজীদে স্পষ্ট পথনির্দেশ রয়েছে। একটি অশিক্ষিত সমাজে নবী করীম (স) জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁর উপর প্রথম যে ওহী নাযিল হয় তাতেই পড়া ও লেখার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়। সেখানে কলমের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে বলা হয়েছে যে, কলম হলো মানুষের জ্ঞানভাণ্ডারের নির্ভরযোগ্য হিফাযতকারী। বলা হয়েছে ঃ

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ○خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ○اِقْرَاْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ ○ الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ○عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ ○ـ العلق : ١ـ٥

১৬—

"পাঠ কর তোমার রবের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে রক্তপিণ্ড হতে এবং তোমার রব মহা মহিমান্বিত যিনি কলম দ্বারা শিক্ষা দিয়েছেন। শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না।"–সূরা আল আলাক ঃ ১-৫

কুরআন মজীদ স্মরণ করিয়ে দেয় ঃ

فَسْئَلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَاتَعْلَمُوْنَ○- النحل : ٤٣

"তোমরা যদি না জান তবে জ্ঞানীগণকে জিজ্ঞেস কর।"

–সূরা আন নাহল ঃ ৪৩

সেখানে আরো উল্লেখ আছে ঃ

وَمَآ اُوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِلاَّ قَلِيْلاً○ - بنى اسرائيل : ٨٥

"তোমাদেরকে সামান্যই জ্ঞান দেয়া হয়েছে।"–বনী ইসরাঈল ঃ ৮৫

نَرْفَعُ دَرَجٰتٍ مَّنْ نَّشَآءُ ط وَفَوْقَ كُلِّ ذِىْ عِلْمٍ عَلِيْمٌ ○ – يوسف : ٧٦

"আমি যাকে ইচ্ছা মর্যাদায় উন্নীত করি। প্রত্যেক জ্ঞানবান ব্যক্তির উপর আছে সর্বজ্ঞানী।"–সূরা ইউসুফ ঃ ৭৬

প্রসংগক্রমে এখানে একটি মুনাজাতের উল্লেখ করা যেতে পারে। মানবজাতিকে এ মুনাজাত সম্পর্কে শিক্ষা দিয়ে কুরআন মজীদ ঘোষণা দিয়েছে ঃ

وَقُلْ رَّبِّ زِدْنِىْ عِلْمًا ○– طه : ١١٤

"বল হে আমার রব, আমার জ্ঞানের বৃদ্ধি সাধন কর।"–সূরা ত্বা-হা ঃ ১১৪

নবী করীম (স) বলেছেন, "ইসলামের ভিত্তি হলো পাঁচটি ঃ তাহলো আল্লাহর উপর পূর্ণ ঈমান আনা, সালাত কায়েম করা, যাকাত আদায় করা, হজ্জ করা, রমযান মাসে রোযা রাখা।" বিশ্বাস বা ঈমানের সাথে যদি তাত্ত্বিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সংযোগ থাকে, তাহলে রোযা, সালাত, হজ্জ, যাকাতের সংযোগ রয়েছে পার্থিব জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে। যেমন—সালাত কায়েম করার জন্য একজন মুসলমানকে কিবলামুখী হতে হয় এবং সালাত কায়েম করতে হয় সুনির্দিষ্ট কতকগুলো প্রাকৃতিক ঘটনা কখন ঘটে তার প্রেক্ষিতে। এজন্য ভূগোল এবং জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হয়। আবার সঠিকভাবে সিয়াম সাধনার জন্যও প্রাকৃতিক ঘটনাবলী সম্পর্কে জ্ঞান থাকা আবশ্যক। যেমন সূর্য উদয় বা অস্ত সম্পর্কে জ্ঞান না

থাকলে সিয়াম পালন করা কষ্টকর। অনুরূপভাবে হজ্জ যাত্রীদের মক্কায় যাওয়ার জন্য রাস্তাঘাট এবং যানবাহন প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান থাকাটা জরুরি। আবার যাকাত আদায় বা উত্তরাধিকারীদের মধ্যে সম্পদ বিলিবণ্টন করার জন্য অর্থসম্পদ সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হয়।

কুরআনুল করীমে অনেক বৈজ্ঞানিক সূত্র এবং ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে। কুরআনকে জানা বুঝার জন্য এ সমস্ত বিষয়বস্তু সম্পর্কে জ্ঞান থাকাটা অপরিহার্য। বস্তুতপক্ষে কুরআন অধ্যয়ন করতে হলে, যে ভাষায় কুরআন নাযিল হয়েছে প্রথমে সে ভাষা জানতে হবে। এখানেই এসে যাচ্ছে ভাষা-বিজ্ঞান সম্পর্কে চর্চার প্রয়োজনীয়তা। এভাবেই ইসলাম আমাদেরকে ইতিহাস, ভূগোল এবং অন্যান্য জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কে চর্চার জন্য অনুপ্রাণিত করে। প্রসংগক্রমে নবী করীম (স) মদীনায় এসে স্বাধীনভাবে বসতি স্থাপনের প্রারম্ভে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। মসজিদের একটি অংশকে নির্ধারণ করে রাখেন বিদ্যালয়ের জন্য যা সুফ্ফা নামে পরিচিত। দিনের বেলায় এ স্থানটি ব্যবহৃত হত লেকচার হল হিসেবে। আবার রাতের বেলা ব্যবহৃত হতো শিক্ষার্থীদের আবাসস্থল রূপে। স্থানটিকে বলা হত সুফ্ফা।

কুরআনুল করীমে এরশাদ হয়েছে ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنْ تَنْصُرُوا اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ

"হে মু'মিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য কর আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করবেন।"–সূরা মুহাম্মাদ ঃ ৭, সূরা হাজ্জ ঃ ৪০

মুসলমানরা কুরআনের এ উপদেশবাণীকে অক্ষরে অক্ষরে অনুসরণ করেছিলো। ফলে তাদের ভাগ্যও খুলে গিয়েছিলো। সুতরাং এতে বিস্মিত হবার কিছু নেই যে, জ্ঞানচর্চা ও বিস্তারের জন্য মুসলমানরা সস্তা এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে কাগজের ব্যবস্থা করেছিলো। বস্তুতপক্ষে হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দী থেকেই বিশাল বিস্তীর্ণ মুসলিম সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে কাগজের কল প্রতিষ্ঠিত হয়। উৎপাদিত হয় প্রচুর কাগজ।

এখানে বিজ্ঞানের উন্নয়নে বিশেষ করে মানবতার কল্যাণে মুসলমানগণ যে অমূল্য অবদান রেখেছেন তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হলো ঃ

ধর্ম ও দর্শন সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান

ধর্ম বিষয়ক জ্ঞানের সূত্রপাত ঘটেছে কুরআনের মাধ্যমে। কুরআন মজীদ আল্লাহর কালাম। ওহীর মাধ্যমে এই কালাম মানুষের কাছে

পৌঁছেছে। কুরআনকে জানতে ও বুঝতে হলে এর ভাষা, ব্যাকরণ এবং কুরআনের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট সম্পর্কে জানতে হয়। কালক্রমে সমাজে এ বিষয়গুলোর প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পায় এবং এর প্রত্যেকটি বিষয় এক একটি স্বতন্ত্র বিজ্ঞান হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। যেমন—কুরআন পাঠ ও তিলাওয়াতের মধ্য দিয়েই উচ্চারণ রীতির বিকাশ ঘটে। পরবর্তীতে এটি একটি স্বতন্ত্র বিজ্ঞানে রূপ নেয়।

আবার কুরআনের বাণী সংরক্ষণের চেষ্টা চলে সেই শুরু থেকে। এর ফলে আরবী হস্তলিপিশিল্প উৎকর্ষ লাভ করে। দিনে দিনে হস্তলিপি খুবই নিখুঁত, পরিচ্ছন্ন এবং সুন্দর হয়। এর সাথে যুক্ত হয়েছে উন্নততর বাক্য গঠন প্রণালী ও বিরতী চিহ্ন। এসব মিলিয়ে আরবী ভাষা খুবই সমৃদ্ধ হয়। দুনিয়ার অন্য কোনো ভাষার সাথে এর তুলনা হয় না। এভাবেই ভাষা বিজ্ঞানের উদ্ভব ঘটে।

ইসলামের একটি চিরন্তন বৈশিষ্ট্য এই যে, ইসলামকে বুঝতে হলে কুরআনকে বুঝতে হয়। আরব-অনারব সকলের জন্য একথা সত্য। সে কারণেই অন্যান্য ভাষায় কুরআনের তরজমা প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। নবী করীম (স)-এর আমলে হযরত সালমান ফারসী (রা) ফারসী ভাষায় কুরআন শরীফের অংশবিশেষ তরজমা করেন। তরজমা করার এ ধারা এখনো অব্যাহত রয়েছে। এখানে বলে রাখা আবশ্যক যে, যারা আরবী পড়তে পারে না, কুরআন বুঝে না কেবলমাত্র তাদের বুঝার সুবিধার্থে কুরআনের তরজমা করা হয়। কিন্তু সালাত বা ইবাদাত বন্দেগীর সময় কোনোভাবেই তরজমা ব্যবহার করা যায় না। তখন কেবলমাত্র কুরআনের মূল ভাষা ব্যবহার করতে হয়। এটা বাধ্যতামূলক।

কুরআনের আয়াতসমূহ যথাযথভাবে সংরক্ষণ করার জন্য নবী করীম (স) চমৎকার একটি পন্থা বলে দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলার তরফ থেকে ওহী নাযিল হওয়ার সাথে সাথে সাহাবীগণ অতি যত্নের সাথে তা লিখে রাখতেন। আবার কিছু সংখ্যক সাহাবী সাথে সাথে তা মুখস্থ করে ফেলতেন। ওহী ঠিকমত লেখা বা মুখস্থ করা হলো কিনা সাহাবীগণ তা পরীক্ষা করে নিতেন। ফলে আল্লাহর কালামের কোনো বিকৃতি, বিচ্যুতি বা কোথাও কোনো প্রকার ভুলত্রুটি হওয়ার সম্ভাবনা ছিলো না। কুরআনের বিশুদ্ধতা নিশ্চিত করার জন্য আরো একটি পরীক্ষণ ব্যবস্থা ছিল। তৎকালে বেশ কিছু সংখ্যক সাহাবায়ে কেরামকে কুরআন বিশারদ হিসেবে গণ্য করা হতো। তাঁরা হাতে লেখা কুরআন শরীফের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত

তিলাওয়াত করে এর বিশুদ্ধতা পরীক্ষা করতেন এবং এর যথার্থতা সম্পর্কে সনদ প্রদান করতেন। এখনকার দিনেও মুসলিম সামজে এ নিয়মটি চালু রয়েছে। যারা কুরআন শরীফ হিফয বা মুখস্থ করেন, তাদের বিশুদ্ধতা এভাবে যাঁচাই করা হয়।

মুসলমানদের নিকট কুরআন যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি গুরুত্বপূর্ণ নবী করীম (স)-এর হাদীসসমূহ। অতি যত্নের সাথে তাঁরা নবী করীম (স)-এর কথা ও কর্মের বিবরণসমূহ সংরক্ষণ করেছেন। ব্যক্তিগত বা সমাজ জীবনের কোনো কিছুই বাদ যায়নি। নবী করীম (স)-এর কিছু সংখ্যক ঘনিষ্ঠ সহচর তাঁর জীবদ্দশাতেই এ সংরক্ষণ প্রক্রিয়া শুরু করেন। তাঁর ইন্তেকালের পরও এ সংরক্ষণ প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকে। সাহাবায়ে কিরাম ব্যক্তিগত উদ্যোগে এ কাজটি শুরু করেন। তাঁরা হাদীসগুলো যেভাবে শুনেছেন, ঠিক সেভাবেই লিপিবদ্ধ করেছেন। অর্থাৎ প্রাইমারি সোর্সই ছিল হাদীস সংরক্ষণের মূল উৎস। সাহাবীগণ কারো নিকট কুরআনের আয়াত বর্ণনার সময় এর যথার্থতা অক্ষুণ্ন রাখার ব্যাপারে যেমন সতর্ক থাকতেন তেমনি সতর্ক থাকতেন হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রেও।

হযরত নূহ (আ), হযরত মূসা (আ), হযরত ঈসা (আ) সহ অন্যান্য আম্বিয়া কিরামের সম্পর্কে কিংবা বুদ্ধ সম্পর্কে আমরা খুব সামান্যই জানি। বিস্তারিতভাবে কেউ লিখতে চাইলেও পৃষ্ঠা কয়েকের মধ্যেই তা শেষ হয়ে যায়। কিন্তু নবী করীম (স)-এর জীবনী এত বিস্তারিতভাবে জানা আছে যে, শত শত পৃষ্ঠা লিখেও তা শেষ করা যায় না। ভবিষ্যত বংশধরদের জন্য তাঁর জীবনী যে কত যত্নের সাথে সংরক্ষণ করা হয়েছে এ ঘটনা থেকেই তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

নবী করীম (স)-এর জীবনকালেই মুসলমানদের মধ্যে ইসলাম সম্পর্কে চিন্তার উন্মেষ ঘটে। পরবর্তীকালে এর উপর ভিত্তি করেই বিকশিত হয় বিভিন্ন বিজ্ঞানের। এর মধ্যে রয়েছে কালাম শাস্ত্র ও তাসাউফ বিজ্ঞান। মুসলমানদের মধ্যে বেশ কিছু সংখ্যক প্রতিভাবান দার্শনিক জন্ম নেন। এদের মধ্যে ছিলেন আল-কিন্দি, আল ফারাবি, ইবনে সিনা, ইবনে রুশদসহ আরো অনেকে। তাঁদের মৌলিক দর্শন ও পাণ্ডিত্যে ইলমে কালাম ও তাসাউফ বিজ্ঞান আরো সমৃদ্ধ হয়।

তাছাড়া গ্রীক ও সংস্কৃত ভাষায় রচিত দর্শন সম্পর্কিত শত শত পুস্তকে আরবী ভাষায় অনূদিত হয়। লক্ষণীয় বিষয় এই যে, গ্রীক ও সংস্কৃত ভাষায় রচিত এ সমস্ত দর্শন গ্রন্থের বেশির ভাগই বিনষ্ট হয়ে গেছে। কিন্তু অনূদিত গ্রন্থসমূহ ভাবী বংশধরদের জন্য যত্নের সাথে সংরক্ষিত আছে।

সমাজ বিজ্ঞানের উন্নয়ন

কুরআনুল করীম আল্লাহর কালাম। এর ভাষা আরবী। ইতিপূর্বে আরবী ভাষায় কোনো পুস্তক ছিলো না। পরবর্তীতে মাত্র দু'শ বছরের মধ্যে অশিক্ষিত বেদুঈনদের এ ভাষাই বিশ্বের অন্যতম সমৃদ্ধ ভাষায় পরিণত হয়। কালক্রমে বিজ্ঞানের চর্চার ক্ষেত্রে আরবী আন্তর্জাতিক ভাষার মর্যাদা লাভ করে। এত অল্প সময়ের মধ্যে একটি ভাষা যে কিভাবে সমৃদ্ধির শীর্ষে পৌঁছলো তা বিশ্লেষণ করে দেখা আবশ্যক। প্রথম যুগের মুসলমানদের বেশীর ভাগই ছিলেন আরবীয়। অথচ ইসলামের প্রভাবে তাঁরা তাঁদের স্বাতন্ত্রের কথা সম্পূর্ণরূপে ভুলে যান। অন্য ভাষা, বর্ণ ও গোত্রের মুসলমানদেরকে পূর্ণ সমতায় গ্রহণ করার জন্য এটা দরকার ছিলো। একমাত্র ব্যতিক্রম ছিলো ভাষার ক্ষেত্রে তারা আরবী ভাষাকে ভোলেননি। আর এটা এমন এক ভাষা যে ভাষায় কুরআন ও হাদীস সংরক্ষিত হয়েছে। বস্তুতপক্ষে সকল গোত্র ও বর্ণের মুসলমানগণকে একই সমতায় গ্রহণ করার ফলে তারা জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিকাশে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন। আরবী, ইরাকী, গ্রীক-তুর্কী যারাই ইসলাম গ্রহণ করেছেন তাদের কেউ এ উদ্যোগ গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকেননি। মুসলমানদের ধর্মীয় সহিষ্ণুতা এতই মহৎ ছিলো এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে তাদের পৃষ্ঠপোষকতা এতই নিখুঁত, নির্ভুল ও উৎকৃষ্ট ছিলো যে খৃস্টান, ইহুদী, বৌদ্ধ এবং অন্যান্য জাতি তাদের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়। নিজেদের ধর্মজ্ঞান ও সাহিত্য দ্বারা সমৃদ্ধ মুসলমানদের জ্ঞান-বিজ্ঞানকে গ্রহণ করতে আগুয়ান হয়। এমনকি তাদের সহযোগিতা ও কর্মতৎপরতায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখারও ব্যাপক প্রসার ঘটে। আরবী ছিলো মুসলমানদের অফিসিয়াল ভাষা। আর এ সময়ে মুসলমানদের ব্যাপ্তি ছিলো স্পেন থেকে সুদূর চীন পর্যন্ত সমগ্র অঞ্চল জুড়ে। ফলে এ সময়ে অন্য যে কোনো ভাষার চেয়ে আরবী ভাষার ব্যাপক বিস্তার ঘটে।

আইন

মুসলমানরাই সর্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে আইন সম্পর্কে ব্যাপক চর্চা শুরু করেন। প্রাচীনকালেও আইনের প্রচলন ছিলো। ক্ষেত্রবিশেষে এগুলো বিন্যস্ত থাকলে সেসব আইনের কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি ছিলো না। সে সময়ে আইনের দর্শন ও আইনের উৎস সম্পর্কে কোনো আলোচনা হতো না। আইনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ প্রয়োগ-পদ্ধতি প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে আলোচনা ছিলো অনুপস্থিত। এমন কি ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে এ বিষয়গুলো আইন বিশারদদের বিন্দুমাত্র নাড়া দিত

না। মুসলমানরা আইনের উৎস কুরআন ও হাদীসের আলোকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে আইন সম্পর্কে ব্যাপক চর্চা শুরু করেন। তাঁরাই সর্বপ্রথম আইনকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করেন তাদের পূর্বে আর কেউ আইনের মত এত বস্তুনিষ্ঠ, এত বিমূঢ় বিষয় নিয়ে ব্যাপকভাবে আলোচনা করেননি। হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দী থেকেই এর চর্চা শুরু হয়। তখন আইনকে বলা হতো উসূলে ফিক্‌হ।

প্রাচীনকালে আন্তর্জাতিক আইন বলতে যা বুঝান হতো তাতে কোনো আন্তর্জাতিকতা ছিল না। বস্তুতপক্ষে তাকে আইনও বলা যায় না। আসলে সেটা ছিলো রাজনীতিরই একটা অংশ। এটা রাষ্ট্রনায়কদের ইচ্ছা এবং দয়ার উপর নির্ভর করত। তাছাড়া আন্তর্জাতিক আইনের ব্যাপ্তিও ছিল সীমিত। যে সমস্ত রাষ্ট্রে একই ধর্ম বা ভাষার লোকেরা বসবাস করত, কেবলমাত্র সে সমস্ত দেশের মধ্যেই এ আইন কার্যকর ছিল। মুসলমানগণ সর্বপ্রথম আইনকে একটি নির্দিষ্ট বিধি ব্যবস্থার মধ্যে নিয়ে আসেন, এর সাথে জুড়ে দেন দায়িত্ব ও অধিকারের বিষয়টি। পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, ইসলামের ইতিহাসের শুরুতে যে সমস্ত চুক্তিপত্র বা আইন প্রণীত হয়েছে, সেগুলোতেও আন্তর্জাতিক ধারাসমূহ সন্নিবেশিত হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে যায়েদ ইবনে আলী (রা)-এর মাজমুর উল্লেখ করা যেতে পারে। যায়েদ ইবনে আলী ১২০ হিজরী মুতাবিক ৭৩৭ খৃষ্টাব্দে ইন্তিকাল করেন। অতীতকালের যে সমস্ত চুক্তিপত্র আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে সেগুলোর মধ্যে যায়েদ ইবনে আলী (রা)-এর চুক্তিপত্রটি সর্বাধিক প্রাচীন।

প্রসংগক্রমে আরো উল্লেখ্য যে, মুসলমানদের হাতে আন্তর্জাতিক আইন স্বতন্ত্র শাস্ত্র বা বিজ্ঞান হিসেবে বিকাশ লাভ করে। এমন কি ১৫০ হিজরীর পূর্বে প্রণীত বিভিন্ন বিবরণ বা রচনায় এতদসংক্রান্ত বর্ণনা পাওয়া যায়। অবশ্য সে সময়ে আন্তর্জাতিক আইন বলতে স্বতন্ত্র কোনো শিরোনাম ছিল না, ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত সিয়ার শীর্ষক শিরোনামে এ আলোচনায় স্থান পেয়েছে। ইবনে হাজার রচিত "তাওয়ালী আত-তাসীস" গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, আন্তর্জাতিক আইন সম্পর্কে প্রথম একটি গ্রন্থ রচনা করেন হযরত আবু হানীফা (র)। তিনি ছিলেন যায়েদ ইবনে আলীর সমসাময়িক। একক গ্রন্থের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে—

ক. এখানে সমস্ত বিদেশীদের একই পাল্লায় পরিমাপ করা হয়েছে। অর্থাৎ তাদের মধ্যে কোনো রকম তারতম্য বা কারো প্রতি কোনো রকম পক্ষপাতিত্ব করা হয়নি।

খ. মুসলমানদের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক কেমন হবে সে বিষয়ে এখানে কোনো উল্লেখ নেই বরং গোটা বিশ্বের অমুসলিম রাষ্ট্রসমূহ এ গ্রন্থের মুখ্য আলোচ্য বিষয়। বস্তুতপক্ষে ইসলাম নীতিগতভাবে স্থান, বর্ণ, ভাষা নির্বিশেষে সকল মুসলমানকে একটি সূতায় গেঁথে দিয়েছে। সবাইকে নিয়ে গড়ে তুলেছে একটি জাতি। মুসলমানদের গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি অবদান রয়েছে তুলনামূলক কেইস ল-এর ক্ষেত্রে। ইসলামী আইনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও প্রয়োগ পদ্ধতিকে কেন্দ্র করে মুসলমানদের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দেয়। বিশেষ কোনো আইনের ব্যাপারে কেন এ মতপার্থক্য দেখা দেয় অথবা এ জাতীয় মতপার্থক্যের ফলাফল কি হতে পারে তা নির্ধারণ করা জরুরী হয়ে পড়ে। এখান থেকেই তুলনামূলক কেইস ল-এর উদ্ভব ঘটে। এ বিষয়ের উপর দাবসী এবং ইবনে রুশদ রচিত পুস্তকগুলো পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেছে। সাইমুরী তুলনামূলক আইন বিজ্ঞান বা আইন পদ্ধতির উপর পুস্তক রচনা করেন। আরবী পরিভাষায় এ জাতীয় পুস্তককে বলা হয় উসূলে ফিক্‌হ।

মুসলমানরাই সর্বপ্রথম রাষ্ট্রের জন্য লিখিত সংবিধান প্রণয়ন করেন। বস্তুতপক্ষে নবী করীম (স) ছিলেন এ সংবিধানের রচয়িতা। তিনি যখন মদীনায় নগর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন, তখন এ সংবিধানটি প্রণয়ন করেন। ঐতিহাসিক ইবনে হিশাম এবং আবু উবায়েদের বর্ণনার মধ্য দিয়ে এটা আমাদের হাতে পৌছেছে। রাষ্ট্রীয় প্রশাসন, আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, বিচার ব্যবস্থা প্রতিরক্ষা প্রভৃতি সকল বিষয় সংবিধানে সন্নিবেশিত হয়েছে। রাষ্ট্রনায়ক তথা জনগণের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে স্পষ্টভাবে। ৫২টি ধারা সম্বলিত এ সংবিধানটি প্রণয়ন করা হয় ৬২২ খৃস্টাব্দে। ইসলামী আইনকে প্রধানত তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়। (ক) ধর্মীয় আচার-আচরণ, (খ) যাবতীয় চুক্তি সম্পর্কিত বিষয়সমূহ, (গ) শাস্তি সম্পর্কিত বিষয়াদি। আইনকে বিভিন্ন পর্যায়ে বিভক্ত করার এই প্রক্রিয়াটি শুরু হয়েছে হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর শুরু থেকে।

প্রসংগক্রমে উল্লেখ্য যে, ইসলাম মানব জীবনকে দেখে থাকে সামগ্রিক ভাবে। যিনি রাষ্ট্রের প্রধান তিনিই সালাতে ইমামতি করবেন। সে কারণেই রাষ্ট্রীয় নীতি বা সাংবিধানিক আইনকে বিবেচনা করা হয় ধর্মীয় বিধি নিষেধের অংশ হিসেবে। অপরদিকে নবী করীম (স) অর্থনৈতিক ক্রিয়া-কর্মকে ঘোষণা দিয়েছেন ইসলামের একটি স্তম্ভ হিসেবে। সালাত-সিয়াম ও হজ্জের মত যাকাত সমান গুরুত্বপূর্ণ। আর সে কারণেই রাজস্ব এবং অর্থ সংক্রান্ত বিষয়টিও ধর্মীয় আচার আচরণের অন্তর্ভুক্ত। অনুরূপভাবে

আন্তর্জাতিক আইন কানুনগুলো শান্তি সংক্রান্ত বিধি-বিধানসমূহের অংশ হিসেবে পরিগণিত। এখানে লুটতরাজ, ডাকাতি, রাহাজানি, আইন বা চুক্তি ভংগকারীদের শায়েস্তা করাটা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয় যুদ্ধকে।

ইতিহাস ও সমাজ বিদ্যা

ইতিহাস এবং সমাজ বিদ্যায় মুসলমানদের অবদান প্রধানত দুটি ক্ষেত্রে (ক) তথ্য নির্ভর এবং বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশন, (খ) নানান প্রাসঙ্গিক বিষয়ে বিচিত্র ধরনের তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ। ইসলামের ইতিহাস অত্যন্ত পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন। এখানে পৌরানিক কাহিনী বা কল্পলোকের কোনো স্থান নেই। ইসলামের ইতিহাস প্রণয়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের সূক্ষ্ম ও যুক্তিগ্রাহ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। হাজার বছর পরেও যাতে এর সত্যতা ও নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন না ওঠে তা নিশ্চিত করাই এর উদ্দেশ্য। এমন একটি সময় ছিলো যখন প্রত্যক্ষ সাক্ষী ছিল বিচার বিবেচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য। মুসলমানগণ ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে এ বৈশিষ্ট গ্রহণ করেন। প্রতিটি বিবরণের জন্য তাদেরকে নির্ভরযোগ্য প্রমাণ উপস্থাপন করতে হত ।

ঐতিহাসিক সাক্ষী-প্রমাণের বিষয়টি ছিলো এ রকম—কোনো সময়ে হয়ত একটি ঘটনা ঘটে গেলো। সমসাময়িক কালের বিশ্বাসযোগ্য কোনো লোকের নিকট থেকে ঘটনার বিবরণও পাওয়া গেলো। এমতাবস্থায় তার দেয়া বর্ণনাকে যথার্থ বলে ধরে নেয়া যায়। কিন্তু দ্বিতীয় প্রজন্মের সময় এ ঘটনা লিপিবদ্ধ করতে হলে আনুক্রমিকভাবে দুটি সূত্রের উল্লেখ করতে হবে। যেমন আমি 'ক' এর নিকট থেকে শুনেছি। আর 'ক' শুনেছে 'খ' এর কাছে। আর 'গ' হলো ঘটনার সমসাময়িক কালের লোক এবং তার বিবরণও বিস্তৃত ও দীর্ঘ। আর তৃতীয় প্রজন্মের ক্ষেত্রে আনুক্রমিকভাবে তিনটি সূত্রের উল্লেখ করতে হবে। ইতিহাস রচনার এ ধারাটি কেবলমাত্র নবী করীম (স)-এর জীবনী রচনার মধ্যে সীমিত নয়। বরং যুগযুগান্তর ধরে যে সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান আমাদের নিকট পৌছেছে সেগুলোর ক্ষেত্রে এ কৌশলটি প্রয়োগ করা হয়েছে। এমনকি নিছক রস-কৌতুক ও গল্প কাহিনীর ক্ষেত্রেও অনুরূপ আনুপূর্বিক বর্ণনাকারীর বিবরণ পাওয়া যাবে।

মুসলমান রচিত ইতিহাসের একটি বৈশিষ্ট্য হলো সামগ্রিকতা। ইসলাম পূর্ব যুগের ঐতিহাসিকেরা জাতীয় ইতিহাস রচনা করতেন। তদস্থলে মুসলমানরাই সর্বপ্রথম বিশ্বের ইতিহাস রচনার প্রতি মনোনিবেশ করেন।

উদাহরণ হিসেবে তাবারীর কথা বলা যেতে পারে। তিনি ৭৬৯ খৃস্টাব্দে ইন্তেকাল করেন এবং ইসলামের প্রথম কালের একজন ঐতিহাসিক। তাঁর বৃহদাকারের ইতিহাস গ্রন্থের শুরুতেই রয়েছে বিশ্ব জগতের সৃষ্টির বিবরণ। এরপরই এসেছে আদি পিতা হযরত আদম (আ)-এর বৃত্তান্ত। কালের অন্যান্য জাতি ও গোত্রের বিবরণও স্থান পেয়েছে এ গ্রন্থে। বস্তুতপক্ষে তাবারীর উত্তরসূরীগণও ছিলেন একই ধারার অনুসারী। ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে তারাও সামগ্রিকতার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন আল্লামা ইবনে কাছীর, মাসউদী, মিশকাভি, সাইদ আন্দালুসী, রশীদউদ্দীন খান এবং আরো অনেকে। লক্ষণীয় বিষয় এই যে, এ সমস্ত ঐতিহাসিকগণ ইতিহাস রচনার সময় সমসাময়িক কাল সম্পর্কে একটি বিবরণ তুলে ধরেন। বিশেষ করে ইবনে খালদুনের দার্শনিক এবং সমাজতান্ত্রিক আলোচনা ছিল খুবই ব্যাপক ও বিস্তীর্ণ। তাঁর রচিত বিশ্ব ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থের (আল মুকাদ্দমা) ভূমিকায় এ বিষয়টি ফুটে উঠেছে খুবই স্পষ্টভাবে।

ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে মুসলমানদের মধ্যে দুটি ধারা লক্ষ্য করা যায়। একটি ধারাকে বলা যায় পুরোপুরি ইসলামের ইতিহাস, নবী করীম (স) এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের জীবন ও কর্ম-এর প্রধান উপজীব্য। অন্য ধারায় রয়েছে অমুসলিমদের ইতিহাস। ইসলাম পূর্ব যুগের আরব থেকে শুরু করে সমসাময়িক কালের বিশ্ব পরিস্থিতি যেমন—রোম, পারস্য, এসবই ছিলো অমুসলিমদের ইতিহাসের বিষয়বস্তু । বস্তুতপক্ষে হিজরী প্রথম শতাব্দীতেই ইতিহাস রচনার এ দুটি ধারা স্বতন্ত্রভাবে বিকাশ লাভ করে। অবশ্য পরবর্তীতে ইতিহাস রচনার এ দুটি ধারা স্বতন্ত্রভাবে বিরাজ করেনি। বরং এ দুটি ধারা মিলে একটি সামগ্রিক রূপ গ্রহণ করে। ঐতিহাসিক রশীদুদ্দীন খানের রচিত ইতিহাস গ্রন্থই এর স্বাক্ষর বহন করে। এখানে আম্বিয়ায়ে কিরাম, নবী করীম (স) এবং খলীফাদের জীবন ও কর্ম যত ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়েছে, তেমনি স্থান পেয়েছে যাজক সম্প্রদায় তথা রোমান, পারস্য, চীন, ভারত, মঙ্গলীয় শাসকদের জীবন ও কর্ম। গ্রন্থটি একাধারে আরবী ও ফার্সী ভাষায় রচিত হয়েছে। অবশ্য বৃহদাকারের এ গ্রন্থটির বিরাট অংশ এখনো মুদ্রণের অপেক্ষায় আছে।

ভূগোল ও স্থান সম্পর্কে বিবরণ

খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলেই মুসলিম সাম্রাজ্য বহুদূর পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। হজ্জ ও বাণিজ্য উপলক্ষে দূরবর্তী অঞ্চলের সাথে যোগাযোগ

স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। সে আমলে যোগাযোগ ব্যবস্থা যে কত উন্নত ছিল ঐতিহাসিকগণের বর্ণনা থেকেই তার প্রমাণ মেলে। বালাজুরী ও ইবনে জাউজী লিখেছেন যে, "বলতে গেলে প্রায় প্রতিদিনই দেশের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ডাক প্রেরণ করা হতো। এর বিস্তৃতি ছিল সুদূর তুরস্ক থেকে মিসর পর্যন্ত। এমনকি সরকারী ডাকের সাথে সাধারণ নাগরিকরা তাদের ব্যক্তিগত চিঠিপত্র প্রেরণ করতে পারতো। খলীফা হযরত উমরের নির্দেশে তখন থেকেই এ নিয়মটি প্রবর্তন করা হয়। ডাক বিভাগের কর্মকর্তাগণ যোগাযোগ ব্যবস্থার উপর গাইড বা পথ নির্দেশিকা তৈরী করতেন। এ সমস্ত পুস্তিকায় যাত্রাপথের প্রতিটি অঞ্চলের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার বিবরণ থাকত। এগুলো বিন্যস্ত করা হত বর্ণমালা অনুসারে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এ বিবরণ থাকত বিস্তারিত, কোনো কোনো ক্ষেত্রে আবার সংক্ষিপ্ত। এভাবেই রচিত হয় ভূগোল বিষয়ে নানান গ্রন্থ। পরবর্তীতে এগুলোই মুসলমানদেরকে অন্যান্য বিষয়ে গভীর ও বৈজ্ঞানিক চর্চায় অনুপ্রাণিত করে। টলেমির রচিত ভূগোল গ্রন্থ আরবীতে অনূদিত হয়। অনুরূপভাবে অনুবাদ করা হয় সংস্কৃত ভাষায় রচিত ভারতীয় লেখকদের বহু গ্রন্থ। এ সময়ে মুসলমানরা দীর্ঘ সফর ও সমুদ্র যাত্রার বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ করে। সফরনামা ও সমুদ্র যাত্রার কাহিনী প্রতিনিয়ত সাধারণ মানুষের জ্ঞান বাড়িয়ে দেয়। ক্রমান্বয়ে তাদের মধ্যে সবকিছুই হাতে কলমে পরীক্ষা করে দেখার মত একটি মন-মানসিকতার সৃষ্টি হয়।

ভূগোল সম্পর্কে মুসলমানদের যে কত গভীর জ্ঞান ছিল, ইমাম আবু হানীফা (র)-এর একটি উক্তি থেকেই তার স্বাক্ষর মেলে। একবার মুতাজিলা সম্প্রদায়ভুক্ত এক ব্যক্তি ইমাম আবু হানীফা (র)-কে জিজ্ঞেস করেছিলো যে, পৃথিবীর কেন্দ্রবিন্দুটি কোথায় অবস্থিত ? জবাবে তিনি বলেছিলেন যে, তুমি যেখানে বসে আছ ঠিক ওটাই পৃথিবীর কেন্দ্রবিন্দু। বলে রাখা আবশ্যক যে, যদি কারো মধ্যে এ ধারণা থাকে যে, পৃথিবী গোলাকার, কেবলমাত্র তার পক্ষেই এ ধরনের একটা জবাব দেয়া সম্ভব।

মুসলমানরাই সর্বপ্রথম পৃথিবীর মানচিত্র তৈরী করেন। সেখানেও পৃথিবীকে তাঁরা বৃত্তাকারে উপস্থাপন করেন। উদাহরণ হিসেবে এখানে ইবনে হায়কলের অংকিত মানচিত্রের উল্লেখ করা যেতে পারে। মানচিত্রটি এত নিখুঁত যে, সেখানে ভূ-মধ্যসাগরীয় অঞ্চলের নিকট প্রাচ্যের দেশগুলোকে সনাক্ত করতে কোনো বেগ পেতে হয় না। সিসিলির রাজা রজারের (১১০১-৫৪) জন্য একটি ম্যাপ তৈরী করেছিলেন ভূগোলবিদ

ইদ্রিস। এ ম্যাপটিতে খুঁটিনাটি বিষয়গুলো পর্যন্ত এমন নিখুঁতভাবে স্থান পায় যে, তা সবাইকে চমকে দেয়। এমনকি এ মানচিত্রে নীলনদের উৎস মুখটি দেখান হয়েছিলো। স্মরণ রাখতে হবে যে, আরব মুসলমানগণ দক্ষিণকে. চিহ্নিত করেছে উঁচু অঞ্চল আর উত্তরকে নিম্নাঞ্চল হিসেবে।

সমুদ্রপথে চলাচলের সুবিধার্থে দ্রাঘিমা ও অক্ষাংশের চিত্র নির্মাণের প্রয়োজনীতা দেখা দেয়। একই কারণে মুসলমানদের মধ্যে জ্যোতিষ চর্চা এবং নৌ-চর্চা বিদ্যা সম্পর্কিত বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ব্যবহারের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।

স্কানডিনিভিয়া, ফিনল্যাণ্ড, রাশিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে খননকার্য চালিয়ে মুসলমান শাসন আমলের হাজার হাজার মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে। এ ঘটনা থেকে নিশ্চিতভাবে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, মধ্যযুগে মুসলমানদের মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্য ব্যাপক প্রসার লাভ করেছিলো। ব্যবসা উপলক্ষে তারা অনায়াসে দূরদূরান্তে যাতায়াত করতেন।

খ্যাতিমান একজন মুসলিম নাগরিক নাম ইবনে মাজিদ। ভাসকো-ডা-গামার ভারত অভিযাত্রার সময় ইবনে মাজিদ ছিলেন নৌ-বহরের পাইলট বা প্রধান নাবিক। জানা যায় যে, এ অভিযাত্রাকালে ইবনে মাজিদ দিক নির্দেশক যন্ত্র বা কম্পাস ব্যবহার করেছিলেন। বিশেষ করে বসরা থেকে চীন পর্যন্ত মুসলমানদের নৌ-সফর ছিল খুবই বিস্ময়কর। এ ক্ষেত্রে তারা যে নৈপুণ্য ও দুঃসাহসিকতার পরিচয় দেন তা সবাইকে চমকে দেয়।

ইংরেজীতে বহুল ব্যবহৃত কিছু শব্দের মধ্যে রয়েছে আরসোনাল, এডমিরাল, মনসুন, ট্যারিফ ইত্যাদি। এ শব্দগুলো উদ্ভব হয়েছে মূল আরবী ভাষা থেকে। বহুকাল যাবত পাশ্চাত্য সভ্যতার উপর মুসলমানদের যে কত ব্যাপক প্রভাব ছিল, শব্দগুলো থেকে সহজেই তা অনুমান করা যায়।

জ্যোতির্বিদ্যা

জ্যোতির্বিদ্যা চর্চার ক্ষেত্রেও মুসলমানদের অবিস্মরণীয় অবদান রয়েছে। তারা বেশ কিছু জ্যোতির্বিদ্যা আবিষ্কার করেন এবং এগুলোর উপর ব্যাপক গবেষণা পরিচালনা করেন। তারা এ সমস্ত জ্যোতিষ্কের নামকরণ করেন আরবী ভাষায়। মজার ব্যাপার এই যে, পাশ্চাত্য জগতেও এ সমস্ত জ্যোতিষ্ক মুসলমানদের দেয়া আরবী নামেই পরিচিত হয়ে আসছে। বিজ্ঞানী ইবনে রুশদ সূর্যের পৃষ্ঠদেশের দাগকে প্রথম সনাক্ত করেন। ওমর খৈয়াম বর্ষ পঞ্জিকার ব্যাপক সংস্কার করেন। ফলে তা গ্রেগরীয়ান বর্ষ পঞ্জিকা অপেক্ষা বহুগুণে উন্নততর রূপ লাভ করে।

ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বেই বেদুঈন আরবরা ক্ষুদ্র আকারের একটি মান মন্দির নির্মাণ করেছিলো। প্রধানত অন্ধকার রাতে মরু অঞ্চল দিয়ে যাতায়াতের কাজে তা ব্যবহৃত হত। তাছাড়া আবহাওয়া, বৃষ্টি প্রভৃতি বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের কাজেও এটা ছিলো বিশেষ উপকারী। 'কিতাবুল আনওয়া' শিরোনামের গ্রন্থগুলোতে এ বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে।

পরবর্তী সময়ে জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কে সংস্কৃত, গ্রীক এবং অন্যান্য ভাষায় রচিত পুস্তকাবলী আরবী ভাষায় অনুবাদ করা হয়। এ সমস্ত পুস্তকের তথ্য বা বর্ণনার মধ্যে প্রচুর বৈপরিত্য বা পরস্পর বিরোধিতা লক্ষ্য করা যায়। ফলে প্রকৃত সত্য নিরূপণ ও এ সমস্ত তথ্য যাচাই করার জন্য নতুন নতুন পরীক্ষা শুরু হয়। প্রয়োজন পড়ে দীর্ঘমেয়াদী পর্যবেক্ষণের। নির্মিত হয় অসংখ্য পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র। ফলে জ্যোতির্বিদ্যার ব্যাপক প্রসার ঘটে। খলীফা আল-মামুনের শাসনামলেই পৃথিবীর পরিধি পরিমাপ করা হয়। বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, এ পরিমাপটি ছিলো খুবই নিখুঁত। এ সময়ে জোয়ার ভাটা, সকাল-বিকাল-সন্ধ্যা, রংধনু প্রভৃতি বিষয়ে বেশ কিছু গ্রন্থ রচিত হয়। বিশেষ করে সালাত কায়েম এবং সিয়ামের সময়সূচীর সাথে চন্দ্র-সূর্যের নিগূঢ় সম্পর্ক থাকায় মুসলমানদের কাছে এর গুরুত্ব ছিলো বেশী। ফলে চন্দ্র-সূর্যের গতিবিধিকে তারা গভীর মনোযোগের সাথে পর্যবেক্ষণ করে।

প্রাকৃতিক বিজ্ঞান

ইসলামের দৃষ্টিতে বিজ্ঞানে কুসংস্কার বা কল্পকাহিনীর কোনো স্থান নেই। এখানে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের রয়েছে বিশেষ তাৎপর্য এবং এটাই হলো ইসলামী বিজ্ঞানের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। মুসলমানদের প্রাকৃতিক বিজ্ঞান চর্চার পদ্ধতি ছিলো ভারী চমৎকার ও খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। বিজ্ঞান চর্চার শুরুতে অপরিসীম ধৈর্য সহকারে তাঁরা আরবী ভাষায় যতগুলো টেকনিক্যাল শব্দ আছে তার একটি তালিকা তৈরী করেন। টেকনিক্যাল শব্দগুলো সংগ্রহ করতে গিয়ে তারা অসাধারণ ধৈর্য ও সতর্কতার সাথে পদ্যে লেখা কিংবা গদ্যে লেখা নানা ধরনের পুস্তক-পুস্তিকা অধ্যয়ন করেন। শব্দ সংগ্রহের পাশাপাশি তাঁরা এগুলোর অর্থ, ব্যবহার এবং প্রয়োগ কৌশল সম্পর্কে উল্লেখ করেন। শব্দগুলোকে বিন্যস্ত করেন প্রাণীবিদ্যা, এনাটমি, উদ্ভিদ বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিদ্যা প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ানুসারে। তাছাড়া বিভিন্ন সময়ে এগুলো পরিমার্জন ও সংশোধন করেন। শব্দ তালিকার সাথে যোগ করেন নতুন নতুন শব্দ। পরবর্তীকালে বিজ্ঞান গ্রন্থ অনুবাদ করার সময়ে এ শব্দ তালিকা খুবই কার্যকর বলে প্রতীয়মান হয়। অন্য ভাষায় রচিত

গ্রন্থসমূহ আরবীতে অনুবাদ করার সময় বিদেশী শব্দ ব্যবহার করা হয়নি। অনুরূপভাবে আরবী ভাষায় রচিত গ্রন্থসমূহ অন্য ভাষায় রূপান্তর করার সময় আরবী শব্দ দ্বারা অনুবাদ পুস্তকগুলো ভারাক্রান্ত হয়নি।

উদাহরণ হিসেবে উদ্ভিদ বিজ্ঞানের উল্লেখ করা যেতে পারে। উদ্ভিদ বিজ্ঞান সংক্রান্ত গবেষণা ও পুস্তক রচনাকালে তাঁরা প্রতিটি পারিভাষিক শব্দ আরবী ভাষা থেকে গ্রহণ করেন। এ ক্ষেত্রে তাঁরা কোনো বিদেশী শব্দই ব্যবহার করেননি। তবে যে সমস্ত উদ্ভিদ আরব দেশে জন্মায় না, কেবলমাত্র সেগুলোর ক্ষেত্রেই বিদেশী ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। দিনাওয়ারী (মৃ. ৮৯৫ খৃ.) নবম শতাব্দীতে কিতাব আন-নাবাত, ইনসাইক্লোপেডিয়া অব বোটানিকা রচনা করেন। বৃহদাকারের ৬টি খণ্ডে এগুলো সংকলনও করা হয়। অথচ গ্রীক রচিত জীববিদ্যার কোনো বই তখনো অনূদিত হয়নি।

বিজ্ঞানী সিলবারবার্গ মুসলমানদের অবদান সম্পর্কে বলেন, উদ্ভিদ বিদ্যা সম্পর্কে গ্রীকদের বিজ্ঞান চর্চা হাজার বছরের। ডায়সেকোরাইডের এবং থিওফেরাটাস-এর হাতে উদ্ভিদ বিদ্যা উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বিকাশ লাভ করে। এরপরও একথা সত্য যে, মুসলিম উদ্ভিদ বিজ্ঞানী দিনাওয়ারীর একক সফলতা ছিল গ্রীকদের সম্মিলিত সফলতার চেয়ে অনেক বেশী অগ্রসর। তিনি কেবলমাত্র উদ্ভিদের দৃশ্যমান অবস্থা সম্পর্কেই আলোচনা করেননি, বরং চিকিৎসা কাজে উদ্ভিদের ব্যবহারের সম্ভাবনা এবং অন্যান্য গুণাবলীর প্রতিও আলোকপাত করেন। এমনকি বৈশিষ্ট্য অনুসারে উদ্ভিদকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করেন, আলোচনা করেন উদ্ভিদের প্রাপ্তিস্থান এবং অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে।

চিকিৎসা বিজ্ঞান

মুসলমানদের হাতে চিকিৎসা বিজ্ঞানের ব্যাপক উন্নতি ঘটে। বিশেষ করে শল্য চিকিৎসা, ঔষধ বিজ্ঞান, হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা, চিকিৎসক প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে তাদের অবদান ছিল বিস্ময়কর। এমনকি তদানীন্তন কালেই পেশাদার চিকিৎসক হওয়ার জন্য একজন ডাক্তারকে রীতিমত পরীক্ষা দিয়ে সনদপত্র নিতে হত।

স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, রোমান, ভারত, চীন প্রভৃতি দেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে ছিল মুসলিম জাহানের অভিন্ন সীমানা। এ সমস্ত দেশের জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা প্রশাখার সাথে মুসলমান বিজ্ঞানীদের নিবিড় সংযোগ ছিল, ফলে এ সমস্ত দেশে চিকিৎসা বিজ্ঞানের যতটুকু অগ্রগতি

হয়েছিলো, তার সবটুকুরই সমাবেশ ঘটেছিলো মুসলমানদের মধ্যে। এ ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা ছিলো দ্বিবিধ প্রথমত তাঁরা ইতিমধ্যে অর্জিত জ্ঞানের উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান, দ্বিতীয়ত চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিষয়ে তাঁরা আরো মৌলিক অবদান রাখেন। এমনকি শরীরে রক্ত চলাচলের তথ্যাদিও মুসলমানদের আবিষ্কারের ফসল। ইবনে নাফিসের রচনা থেকেই একথা জানা যায়। মুসলিম চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের মধ্যে আল রাজী, ইবনে সিনা ও আবুল কাশেম বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ। তাঁদের রচনা এবং গবেষণাকর্ম বিভিন্ন গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে। কিছুকাল পূর্বেও তাদের গবেষণাকর্মকে পাশ্চাত্যের চিকিৎসা বিজ্ঞান চর্চার ভিত্তি হিসেবে গণ্য করা হত।

আলোক বিজ্ঞান

আলোক বিজ্ঞানের উন্নয়নে মুসলমানদের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখ করার মত। নবম শতাব্দীতে আল-কিন্দির রচিত রশ্মি বিষয়ক গ্রন্থ এখনো মওজুদ রয়েছে। পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, তদানীন্তন গ্রীকদের রচিত বিজ্ঞান গ্রন্থের চেয়ে আল-কিন্দির গ্রন্থ ছিল বহুগুণে অগ্রসর ও উন্নতমানের। হায়সাম ছিলেন আল-কিন্দির একজন সার্থক উত্তরসূরী। তিনিও তাঁর গবেষণাকর্মের জন্য অবিস্মরণীয় হয়ে রয়েছেন।

খনিজ, বল বিজ্ঞান ও অন্যান্য

প্রধানত দুটি কারণে খনিজ বিজ্ঞানের প্রতি বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়। প্রথমত চিকিৎসা বিজ্ঞানের জন্য খনিজ সম্পর্কে জানাটা জরুরী। দ্বিতীয়ত মূল্যবান পাথরের মধ্যকার গুণাগুণ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে খনিজ বিজ্ঞান ছিল খুবই সহায়ক। এ ব্যাপারে রাজা-বাদশাহ ও ধনাঢ্য ব্যক্তিবর্গের উৎসাহ উদ্দীপনা ছিলো বেশী। খনিজ বিজ্ঞানের ওপর আল বেরুনীর গবেষণাকর্ম এখনো বিশেষভাবে ফলপ্রসূ বলে বিবেচিত হচ্ছে।

ইবনে ফিরনাস (মৃ. ৮৮৮) একটা যন্ত্র আবিষ্কার করেছিলেন। এ যন্ত্রের সাহায্যে তিনি বহু দূর পর্যন্ত উড়ে যেতে সমর্থ হয়েছিলেন। এক দুর্ঘটনায় তিনি ইন্তিকাল করেন। কিন্তু তাঁর গবেষণাকর্মকে অব্যাহত বা চূড়ান্তভাবে রূপ দেয়ার জন্য কোনো বিজ্ঞানী এগিয়ে আসেননি। ফলে তাঁর মৃত্যুর সাথে সাথে উড্ডয়ন সম্পর্কিত গবেষণা কর্মের যবনিকাপাত ঘটে। কোনো কোনো বিজ্ঞানী এমন কতকগুলো কলকজা আবিষ্কার করেন যেগুলোর সাহায্যে পানির তলদেশে নিমজ্জিত জাহাজকে অনায়াসেই তোলা যেত। এ যন্ত্রের সাহায্যে বিরাটাকারের বৃক্ষকেও সহজেই উপড়ে ফেলা সম্ভব হতো।

তাছাড়া পানির তলদেশের জগত ছিল মুসলমান বিজ্ঞানীদের জ্ঞান চর্চার একটি অন্যতম ক্ষেত্র। তাঁরা মুক্তা, ঝিনুক ও মৎস চাষের ওপর গভীর গবেষণা করেন। এ বিষয়ে তাঁদের রচিত গবেষণাধর্মী গ্রন্থের সংখ্যাও যথেষ্ট।

প্রাণীবিদ্যা

বন্যপশু ও প্রাণীর প্রতি আরব বেদুইনদের প্রবল আকর্ষণ ছিল। তারা প্রাণীজগতের ধারা সম্পর্কে চর্চা করে প্রচুর আনন্দ পেত। মুসলিম প্রাণী বিজ্ঞানীদের মধ্যে আল-জাহিযের (মৃ. ৮৬৮) স্থান ছিল সবার শীর্ষে। তিনি প্রাণীবিদ্যাকে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করেন। পরবর্তীতে আল-কাযবিনী দামিরী ও মিওকাওয়াই প্রাণী বিজ্ঞানী হিসেবে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। এমনকি তদানীন্তনকালে গৃহপালিত পশু ও বন্য প্রাণীকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিকারের কাজে ব্যবহার করা হত। মুসলমান বিজ্ঞানীগণ এ সমস্ত বিষয়েও অসংখ্য গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

রসায়ন ও পদার্থবিদ্যা

বিশ্বজগতের সৃষ্টি রহস্য সম্পর্কে চিন্তা করার জন্য কুরআনুল করীম মানুষকে তাকীদ দিয়েছে। তাকে আরো অনুপ্রাণিত করেছে আসমান-যমীনকে কিভাবে মানবজাতির অধীনস্থ করা হয়েছে সে সম্পর্কে নিরলস চর্চা করতে। আর সে কারণেই ইসলামে যুক্তি ও বিশ্বাসের মধ্যে কোনো সংঘাত নেই। তাই দেখা যায় যে, ইসলামের প্রাথমিককালেই মুসলমানগণ রসায়ন ও পদার্থবিদ্যা চর্চায় গভীর মনোনিবেশ করেন। খালিদ ইবনে যায়িদ (মৃ. ৭০৪) ইমাম জাফর আস সাদিক (র)-কে বলা হয় মুসলিম বিজ্ঞানীদের পথিকৃত। জাবির ইবনে হাইয়্যান ছিলেন তাঁদেরই একজন কৃতীছাত্র। গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা কর্মের জন্য আজো তিনি অবিস্মরণীয় হয়ে আছেন। তাঁদের গবেষণা কর্মের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁরা অনুমানের পরিবর্তে বস্তুনিষ্ঠ পরীক্ষণের ওপর নির্ভর করতেন। তাঁরা তথ্য সংগ্রহ করতেন পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে। তাঁদের হাতে পড়েই প্রাচীনকালের রসায়ন শাস্ত্রের সাথে নতুন নতুন তথ্য যোগ হয়। তাছাড়া এ তথ্যগুলো ছিলো প্রমাণযোগ্য। এভাবেই রসায়ন শাস্ত্র একটি বিজ্ঞানের মর্যাদা লাভ করে।

জাবির ইবনে হাইয়ান এর হাতে রসায়ন বিদ্যার খুবই প্রসার লাভ করে। সে আমলেই তিনি রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ভস্মীকরণ (Calination) এবং লঘুকরণ (Reduclies) পদ্ধতির কথা জানতে পারেন। তিনি ছিলেন

বাষ্পীকরণ, ঊর্ধপাতন, ঘনীভূতকরণ প্রভৃতি কলাকৌশলের আবিষ্কারক। এটা জানা কথা যে, বিজ্ঞানের এ অগ্রযাত্রার জন্য মুসলমানদেরকে যুগ যুগ ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হয়েছে। পরবর্তী সময়ে মুসলিম বিজ্ঞানীগণের গবেষণাকর্ম ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হয়েছে। পাশ্চাত্য জগতে এ গ্রন্থগুলো দীর্ঘদিন পাঠ্যপুস্তক হিসেবে চালু ছিল। আধুনিক বিজ্ঞান যে মুসলমানদের কাছে কতখানি ঋণী, মুসলমানরা বিজ্ঞান চর্চায় যে কতখানি অগ্রসর ছিলেন এ ঘটনা থেকেই তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

অংক শাস্ত্র

অংক শাস্ত্র উন্নয়নে মুসলমানরা যে অবদান রেখেছেন তা কখনো ম্লান হওয়ার নয়। এলজেব্রা, জিরো, সাইফার প্রভৃতি শব্দগুলোর উৎপত্তি আরবী ভাষা থেকেই। আর মুসলমান অংক বিশারদগণ এগুলোর আবিষ্কারক। মুসলমান অংক বিশারদগণের মধ্যে আল খাওয়ারিজমী, উমর খইয়াম, আল বেরুনী খুবই খ্যাতিমান। এঁদের তুলনা চলে ইউক্লিড-এর সাথে।

সাধারণভাবে অংক চর্চায় গ্রীকদের ব্যাপক খ্যাতি থাকলেও ত্রিকোণমিতি ছিল তাদের কাছে সম্পূর্ণ অজানা বিষয়। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, মুসলমানরাই ছিলেন অংক শাস্ত্রের এ শাখার উদ্ভাবক।

সার-সংক্ষেপ

পূর্বে বাগদাদে ও পশ্চিমে কর্ডোভা-গ্রানাডাকে কেন্দ্র করে মুসলমানদের বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার বিকাশ ঘটে। এক সময়ে অসভ্য বর্বররা বিজ্ঞান চর্চার কেন্দ্রগুলো মুসলমানদের নিকট থেকে ছিনিয়ে নেয়। তখন থেকেই ব্যাহত হয় মুসলমানদের বিজ্ঞান চর্চার ধারা। বস্তুতপক্ষে এটা ছিল বিজ্ঞানের ইতিহাসে সম্ভবত একটা দুর্যোগ ও দুর্ভাগ্য। কারণ, তখনো মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কৃত হয়নি। হাতে লেখা পাণ্ডুলিপিগুলো জমা থাকতো গ্রন্থাগারসমূহে। এর সংখ্যা ছিল শত সহস্র। অসভ্য বর্বররা বিজ্ঞান চর্চার কেন্দ্রগুলো নিজেদের দখলে নেয়ার সাথে সাথে মূল্যবান পাণ্ডুলিপি ও গ্রন্থাগার পুড়িয়ে ফেলে। বিজ্ঞানের আগুয়ান হবার ইতিহাসে এটা ছিলো একটা অবর্ণনীয় ও অপূরণীয় ক্ষতি। এমনকি তাদের নৃশংসতা থেকে বৈজ্ঞানিক ও বুদ্ধিজীবিরা অব্যাহতি পেলেন না। তাঁদেরকেও তারা নির্দয়ভাবে হত্যা করল। বৈজ্ঞানিক তথা বুদ্ধিজীবিগণের শত শত বছরের নিরলস প্রচেষ্টার ফলে যে জ্ঞান সঞ্চিত হয়েছিলো, মাত্র দিন কয়েকের নৃশংসতায় তা নিঃশেষ হয়ে গেলো। এ ধরনের দুর্যোগের কারণে কোনো সভ্যতার ধ্বংস

হলে তা পুনরুদ্ধার করা সত্যিকার অর্থেই দুরূহ ব্যাপার। এর জন্য কয়েক শতাব্দীর প্রয়োজন হয়। প্রয়োজন পড়ে অফুরন্ত সম্পদের। আরো প্রয়োজন অন্যান্য সভ্যতার সম্পর্কে ব্যাপক চর্চার ও পর্যালোচনার। তার চেয়ে বড় কথা এই যে, যখন তখন প্রতিভাবান ব্যক্তি ও মহৎ হৃদয়ের আবির্ভাবের ঘটে না। এ দুটোই আসে আল্লাহর বিশেষ রহমত ও দান হিসেবে।

শিল্পকলা

বিজ্ঞানের বিকাশে কুরআন মজীদের যেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে, তেমনিভাবে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে শিল্পকলার উন্নয়নের ক্ষেত্রে। বস্তুতপক্ষে কুরআন মজীদ মুসলমানদের শিল্পকলার চর্চায় উৎসাহিত করেছে। যেমন সুন্দর সহীহভাবে কুরআন তিলাওয়াত থেকেই সুললিত উচ্চারণের একটি শাখার উদ্ভব হয়েছে। আবার কুরআন সংরক্ষণ প্রচেষ্টা থেকেই ক্যালিগ্রাফি বা সুন্দর হস্তলিখন এবং বাঁধাই শিল্পের সূত্রপাত ঘটেছে। মসজিদ নির্মাণ শৈলী থেকেই সৃষ্টি হয়েছে আর্কিটেকচার বা স্থাপত্য এবং অলংকরণ শিল্পের।

এক সময়ে ধর্মীয় অনুভূতি ও উপলব্ধি থেকে যে শিল্পের উদ্ভব ঘটে পরবর্তী সময়ে ধনাঢ্য ব্যক্তিগণের বিলাসিতা সে শিল্পকলাকে আরো এগিয়ে নিয়ে যায়। তবে ইসলাম আত্মিক ও পার্থিব চাহিদার মধ্যে একটি সামঞ্জস্য বিধান করার নীতি শিক্ষা দেয়। শিক্ষা দেয় সকল বিষয়ে মধ্যপন্থা অবলম্বন করার। অর্থাৎ ইসলামের হুকুম এই যে, মানুষের স্বভাবজাত প্রতিভার অবশ্যই বিকাশ ঘটাতে হবে। তবে তা হবে সঠিক এবং আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশিত পথে। তাকে গড়ে উঠতে হবে পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে।

নবী করীম (স) বলেছেন, "আল্লাহ সুন্দর এবং তিনি সুন্দরকে পসন্দ করেন। (মুসলিম ও মুসনাদ-ই ইবনে হাম্বল)। অন্য একটি হাদীসে উল্লেখ আছে যে, "সবকিছুর মধ্যেই সৌন্দর্য বজায় রাখতে হবে। এমনকি তুমি যদি কাউকে হত্যা কর, তাহলে সে কাজটিও করতে হবে সুন্দর ও রুচিসম্মতভাবে।" কুরআন মজীদে আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন ঃ

اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاۤءَ الدُّنْيَا بِزِيْنَةِ نِ الْكَوَاكِبِ ۝ ـ الصفت : ٦

"আমি নিকটবর্তী আকাশকে সুশোভিত করেছি প্রদীপ মালা দ্বারা।"–সূরা আস-সাফ্‌ফাত ঃ ৬

إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَهَا وَزَيَّنَّهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ ۝

"পৃথিবীর ওপর যা কিছু আছে আমি সেগুলোকে তার শোভা করেছি।"–সূরা ক্বাফ ঃ ৬

এ প্রসংগে নবী করীম (স) একদিন একটি কবরস্থান দেখতে পেলেন। কিন্তু কবরস্থানটি পুরোপুরি সমান ছিল না। তখনি কবরস্থানটি সংস্কার করার নির্দেশ দিলেন এবং বললেন যে, কবরস্থানটি সংস্কার করার সাথে মৃত ব্যক্তির কল্যাণ ও অকল্যাণের কোনো সম্পর্ক নেই। তবে আমাদের চোখে এটা দেখতে ভালো লাগে। আল্লাহ এটা পসন্দ করেন যে, আমরা যখন কোনো কাজ করব, তখন তা অবশ্যই যথাসম্ভব সুন্দরভাবে করব।–ইবনে সা'দ

ললিতকলার প্রতি মানুষের একটি স্বভাবজাত আকর্ষণ রয়েছে। আল্লাহ তাআলার অফুরন্ত প্রাকৃতিক নিয়ামতের মত শিল্পকলা সম্পর্কিত প্রতিভাও একটা নিয়ামত। শিল্পকলা মানুষের জীবনাচরণের মধ্যে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে। এখানে বলে রাখা আবশ্যক যে, ইসলামে কোনো রকম বাড়াবাড়ির অবকাশ নেই। এমনকি সংযমের নামে মাত্রাতিরিক্ত কৃচ্ছ্রসাধন এবং বৈরাগ্য ইসলামে নেই।

নবী করীম (স)-এর জন্য সর্বপ্রথম যে মিম্বরটি তৈরী করা হয়েছিলো তাও দুটি গোলক বা গোলাকার বস্তু দ্বারা সাজান হয়েছিলো। গোলক দুটি ছিল অনেকটা ডালিমের মত। নবী করীম (স)-এর দুই প্রিয় নাতী এ গোলক দুটি দিয়ে বেশ মজা করে খেলতেন। এখান থেকেই কাঠের কারুকাজের সূত্রপাত ঘটে। পরবর্তীকালে কুরআন মজীদের কপিসমূহ নানা রং-এ সুশোভিত করা হয় এবং সেগুলো বাঁধাইয়ে দারুণ যত্ন নেয়া হয়।

সংক্ষেপে শুধু এটুকু বলা যেতে পারে, শিল্পকলার বিকাশ ও প্রসারের ক্ষেত্রে ইসলাম কোনো রকমের প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে না। বিধি-নিষেধ আরোপ করে থাকে শুধুমাত্র প্রাণীর প্রতিকৃতি চিত্রায়ণ বা নির্মাণের ক্ষেত্রে। এর পশ্চাতেও কতগুলো যুক্তিযুক্ত কারণ রয়েছে। কারণগুলো প্রধানত মনোজগৎ, সামাজিক জীববিদ্যা ও আধ্যাত্মিক বিষয় সম্পর্কিত।

ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, মূর্তিমান শিল্পের ব্যাপারে ইসলাম যে বিধি-নিষেধ রয়েছে তা কখনো মুসলমানদের শিল্পচর্চাকে ব্যাহত করতে পারেনি। বরং তাদের হাতে বিমূর্ত শিল্পচর্চার যে বিকাশ ঘটেছে তা খুবই

বিস্ময়কর। কুরআন মজীদে মসজিদ নির্মাণের ক্ষেত্রে সাজ-সজ্জার অনুমোদন রয়েছে। সূরা নূর ৩৬ আয়াত দ্রষ্টব্য

বাস্তব উদাহরণ হিসেবে মদীনার মসজিদে নববী জেরুজালেমের মসজিদ, ইসতাম্বুলের সোলায়মানিয়া মসজিদ, আগ্রার তাজমহল, গ্রানাডার আলহামরা প্রাসাদ এবং এ জাতীয় আরো কতকগুলো কীর্তির উল্লেখ করা যেতে পারে। অন্য যে কোনো সভ্যতার অসামান্য স্থাপত্য কর্ম বা শিল্প সৌকর্যের চেয়ে এগুলোকে খাট করে দেখার অবকাশ নেই।

মুসলমানরা ছবি আঁকার পরিবর্তে ক্যালিগ্রাফিকে গ্রহণ করেছে একটি শিল্পকর্ম হিসেবে। বলতে গেলে এটি তাদের একান্ত নিজস্ব সম্পদ। তারা প্রধানত অংকন, কাপড় ও বিভিন্ন দ্রব্যাদি চিত্রায়ণের কাজে ক্যালিগ্রাফি ব্যবহার করে থাকে। যে সমস্ত ক্যালিগ্রাফি দরদ, যত্ন ও নৈপুণ্যের সাথে প্রণীত হয়েছে, সেগুলোর মান খুবই উন্নত। দেখতেও চমৎকার মনোমুগ্ধকর। এগুলোর সৌন্দর্য সত্যই অবর্ণনীয়।

কুরআন তিলাওয়াত মুসলমানদের শিল্পচর্চার আরেকটি অনন্য বৈশিষ্ট্য। কুরআন তিলাওয়াতে বাদ্যযন্ত্র ব্যবহারের অবকাশ নেই। কুরআনের সকল আয়াতগুলোও সমান ও একই মাত্রার নয়। নবী করীম (স)-এর কাল থেকেই মুসলমানরা পরম আগ্রহের সাথে কুরআন তিলাওয়াত করে আসছেন। কুরআন মজীদের নিজস্ব একটি গতি ও ছন্দ আছে। এর আয়াতগুলো খুবই শ্রুতিমধুর ও মিষ্টি। অন্য যে কোনো ভাষার গতি ও ছন্দের মান যত উন্নত ও চিত্তাকর্ষকই হোক না কেন, তা কখনো কুরআন মজীদের মিষ্টি মধুর ছন্দকে ম্লান করতে পারে না। যারা কারী সাহেবের তিলাওয়াত অথবা প্রতিনিয়ত মুয়াযযিনের কণ্ঠে উচ্চারিত আযানের ধ্বনি শ্রবণ করে, তারা ভালোভাবেই জানে যে, এটি মুসলমানদের একটা অনন্য সম্পদ। এর স্বাদ ও বৈশিষ্ট্যই আলাদা। এর সাথে এমন একটি পরিতৃপ্তি ও আনন্দ মিশে আছে যার সাথে অন্যকোনো কিছুর তুলনা হয় না।

কবিতা সম্পর্কে নবী করীম (স) বলেছেন যে, এমন কিছু কবিতা আছে যেগুলো জ্ঞানের গভীরতায় পরিপূর্ণ। আবার কোনো কোনো বক্তার বক্তব্যের কার্যকারিতা একেবারেই চিত্তাকর্ষক। কুরআনুল করীমে নৈতিকতা বিরোধী কবিতাকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। কুরআনুল করীমের এ বিধানের প্রতি লক্ষ্য রেখেই নবী করীম (স) তদানীন্তন কবিদেরকে সঠিক পথনির্দেশ দিয়েছেন। তাদের জানিয়ে দিয়েছেন, তাদের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে। বলে রাখা আবশ্যক যে, সে আমলের শ্রেষ্ঠতম কবিগণ নিয়মিত

তাঁর দরবারে আসতেন। তাঁরা সহজেই ভালোমন্দের মধ্যকার পার্থক্য নিরূপণ করতে পারতেন। তাঁদের মেধাকেও তাঁরা ব্যবহার করতেন যথাযোগ্যভাবে।

সংক্ষেপে শুধু এটুকুই বলা যায় যে, শিল্পকলার বিকাশের ক্ষেত্রে মুসলমানদের অবদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ । তাঁরা নতুন নতুন এমন অনেক বিষয় উদ্ভাবন করেন যা ছিলো মানুষের চিন্তার বাইরে। অথচ এক্ষেত্রে তারা চমৎকার রুচির পরিচয় দেন এবং ক্ষতিকর বিষয়গুলোকে সযত্নে পরিহার করেন।

এ প্রসঙ্গে দুটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখের দাবী রাখে ঃ

প্রথমত অতি অল্প সময়ের মধ্যে এবং অনায়াসেই মুসলমানরা বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে। এমতাবস্থায় মুসলমানদের যদি নিজস্ব কোনো শিল্প-সংস্কৃতি না থাকত, নবী করীম (স) যদি মুসলমানদের মধ্যে নিজস্ব সংস্কৃতিবোধকে উজ্জীবিত না করতেন, তাহলে সহজেই তারা অমুসলিমদের সংস্কৃতির মধ্যে বিলীন হয়ে যেত। সহযোগিতা না করলেও প্রত্যেকেই মুসলমানদের সাথে সহযোগিতা করত। মুসলমানদের নিকট সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরতো নিজেদের ধ্যান-ধারণা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডকে । ফলে মুসলমানদের কখনো অন্যেরটা গ্রহণ করতে হতো না। বিভিন্ন বিষয়ে তাদের সাথে বৈপরিত্য থাকা সত্ত্বেও মুসলমানরা তাদের সাথে সংযোগ রক্ষা করে চলে এবং তারা এটা করে থাকে বিজ্ঞানের বিকাশ তথা মানবতার বৃহত্তর স্বার্থে।

চতুর্দশ অধ্যায়

ইসলামের সাধারণ ইতিহাস

ইসলামের ইতিহাস বলতে বস্তুতপক্ষে বিগত ১৪ শত বছরের বিশ্বের ইতিহাসকে বুঝায়। এ স্বল্প পরিসরে সে ইতিহাসকে তুলে ধরা সম্ভব নয়। এখানে কেবলমাত্র এই ইতিহাসের প্রধান প্রধান ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছি।

খুলাফায়ে রাশেদীন

৬৩২ খৃস্টাব্দ মুতাবিক ১১ হিজরীতে নবী করীম (স) ইন্তিকাল করেন। ইন্তেকালের পূর্বে সুদীর্ঘ ২৩টি বছর তিনি দীনী দাওয়াত ও ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য নিরলস পরিশ্রম করেছেন। তিনি তাঁর প্রচেষ্টায় পূর্ণ সফলতা অর্জন করেন। তাঁর হাতেই ইসলাম পূর্ণতা লাভ করে। তিনি শূন্য থেকে একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করেন। মদীনা শহরের একটি অংশে ক্ষুদ্র নগর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে এর সূত্রপাত ঘটে এবং মাত্র দশ বছরের মধ্যে সমগ্র আরব উপদ্বীপ এবং ইরাক ও ফিলিস্তীনের দক্ষিণাঞ্চল এর আওতায় চলে আসে। তাছাড়া তিনি এমন একদল অনুসারী রেখে যান যাঁদের সংখ্যা লাখের উপরে। তাঁদের ধর্মীয় বিশ্বাসে কোনো খুঁত ছিলো না। ধর্মের বিধি-নিষেধ ও আচার-অনুষ্ঠানসমূহ প্রতিপালনের ক্ষেত্রেও তাঁরা ছিলেন নিষ্ঠাবান।

নবী করীম (স)-এর পার্থিব সাফল্য দেখে কেউ কেউ এতখানি উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিলো যে, নিজেদেরকে নবী হিসেবে দাবী করার জন্য তৈরী হয়। নবী করীম (স)-এর ইন্তেকালের পরপরই তাদের সাথে আরো কিছু সংখ্যক ভণ্ড নবীর দাবীদারদের আবির্ভাব ঘটে এবং খলীফা হযরত আবু বকর (রা)-কে বেশ কয়েক মাস ভণ্ড নবীদের শায়েস্তা করার কাজে অতিবাহিত করতে হয়।

তাছাড়া যে মুহূর্তে নবী করীম (স)-এর ওফাত ঘটে ঠিক সে সময়ে ইরান এবং রোমকদের সাথে মুসলমানদের যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করছিলো। প্রসংগক্রমে বলে রাখা আবশ্যক যে, নবী করীম (স)-এর একজন মুসলমান দূতকে রোমকরা হত্যা করে। কিন্তু রোমক সম্রাট এ অন্যায় হত্যার ব্যাপারে কোনো রকম প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। নবী করীম (স) তার নিকট কয়েকটি বিকল্প প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন। প্রস্তাবে

বলা হয়েছিলো যে, তুমি ইসলাম গ্রহণ কর নয়ত জিযিয়া প্রদান কর। তা না হলে তোমার প্রজাদের মধ্যে যারা স্বেচ্ছায় ইসলাম কবুল করে তাদের বাধা দিও না। রোমক সম্রাট হিরাক্লিয়াস প্রস্তাবগুলো প্রত্যাখ্যান করে এবং হত্যাকারীর নিরাপত্তার ব্যবস্থা নেয়। এমনকি নবী করীম (স) হত্যাকারীর বিরুদ্ধে যে শাস্তিমূলক অভিযান পাঠিয়েছিলেন, রোমক সম্রাট হিরাক্লিয়াস তাঁর বিরুদ্ধে সমর শক্তি প্রয়োগ করে।

ইরান প্রসংগে বলা যেতে পারে যে, পূর্ব থেকেই আরবে তাদের বেশ কিছু আশ্রিত রাজ্য ছিলো। এ সমস্ত রাজ্যের বেশ কিছু গোত্র ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। বেশ কয়েক বছর যাবত তাঁদের সাথে ইরানীদের রক্তক্ষয়ী খণ্ড যুদ্ধ চলছিলো। ইরানীদের আক্রমণ ও দমননীতি শুধুমাত্র আশ্রিত রাজ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকল না। বরং আশ্রিত রাজ্যের সীমানা পেরিয়ে তা আন্তর্জাতিক গুরুত্ব পেল এবং আরবদের সাথে সংঘাত বেঁধে গেলো। বলে রাখা আবশ্যক যে, সে সময়ে রোমক এবং ইরান ছিলো বিশ্বের দুটি প্রধান শক্তি। সে তুলনায় আরবদের উল্লেখ করার মত কিছুই ছিলো না। মরু অঞ্চলে বসবাসকারী যাযাবররাই ছিলো তাদের একমাত্র অবলম্বন। তাদের না ছিলো সমর শক্তি, না ছিল অর্থনৈতিক প্রাচুর্য।

এমনি সংকটময় মুহূর্তে খলীফা হযরত আবু বকর (রা) অবর্ণনীয় বীরত্ব ও সাহসের পরিচয় দিলেন। একই সময়ে দুটি বৃহৎ শক্তির সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হলেন। প্রথম আঘাতেই মুসলিম বাহিনী সীমান্ত অঞ্চলের বেশ খানিকটা এলাকা দখল করে নেয়। অতপর খলীফা রোমকদের সাথে মুসলমানদের বিবাদের একটি শান্তিপূর্ণ সমাধান খুঁজে বের করার উদ্যোগ নেন। তিনি কনসটান্‌টিনোপলে একটি শান্তি মিশন প্রেরণ করেন। কিন্তু তাঁর সে উদ্যোগ বিফলে গেলো। এদিকে মুসলিম বাহিনীর নিকট রোমক সেনাপতির পরাজয়ের পর সম্রাট খুবই তৎপর হয়ে ওঠেন এবং নতুন সৈন্য সংগ্রহ করে বিশাল বাহিনী গঠনে মনোযোগ দেয়। রোমক সম্রাটের সামরিক তৎপরতার প্রেক্ষিতে খলীফা ইরাক অঞ্চল থেকে একটি বাহিনীকে পাঠিয়ে দিলেন সিরিয়ায়। ৬৩৪ সালে জেরুজালেমের নিকট আজ নাদাইনে মুসলমানদের সাথে রোমক সম্রাটের আবার যুদ্ধ বেঁধে যায়। যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী বিজয় লাভ করে। এরপরেই আসে ফিহল বা পেল্লা বিজয়।এর ফলে ফিলিস্তিন নিশ্চিতভাবেই রোমকদের হাতছাড়া হয়ে যায়।

আজনাদাইনে যখন মুসলমানদের বিজয় ঘটে ঠিক সে সময়ে খলীফা হযরত আবু বকর (রা) ইন্তিকাল করেন। তখন খিলাফতের দায়িত্ব ন্যস্ত

হলো হযরত উমর (রা)-এর ওপর। অবস্থার প্রেক্ষিতে তাঁকেও রোমকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হলো। অল্প সময়ের মধ্যেই মুসলমানদের নিকট উত্তর সিরিয়ার দামেস্ক এবং হিমস অঞ্চলের পতন ঘটে। বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, এতদঞ্চলের জনগণ মুসলমানদের প্রতি কোনো রকম বৈরীভাব দেখায়নি। বরং বিজয়ী মুসলিম বাহিনীকে তারা গ্রহণ করল মুক্তিদূত হিসেবে। হিমস-এর পতনের পর সম্রাট হিরাক্লিয়াস মুসলমানদের সাথে চূড়ান্তভাবে বুঝাপড়া করার জন্য তৈরী হয়। সমস্ত শক্তিকে এক জায়গায় সমবেত করতে শুরু করে। খলীফা হযরত উমর (রা)-ও মুসলিম বাহিনীর অবস্থানকে আরো দৃঢ় ও সুসংগঠিত করার উদ্যোগ নেন। পারিপার্শ্বিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে মুসলিম বাহিনী হিমস এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে সরে আসে। ইতিমধ্যে স্থানীয় অমুসলিমদের নিকট থেকে জিযিয়া কর আদায় করা হয়েছিলো। বিনিময়ে তারা মুসলমানদের নিকট থেকে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা পায়। কিন্তু মুসলিম বাহিনী যখন হিমস থেকে সরে আসে মুসলমানদের পক্ষে তাদের নিরাপত্তা বিধান করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। তখন সেনাপতির নির্দেশে জিযিয়া বাবদ যে অর্থ সংগ্রহ করা হয়েছিল তা ফিরিয়ে দেয়া হয়। সুতরাং এতে বিস্মিত হবার কিছু নেই যে, বিজয়ী বাহিনীকে দেশ থেকে চলে যেতে দেখে বিজিতরা দুঃখে অশ্রু বিসর্জন করবে। ফরাসী ঐতিহাসিক জিওজি একথাগুলো এভাবে তুলে ধরেছেন যে, সিরিয়াবাসীদের সাথে রোমকদের আচার ছিল নিষ্ঠুরতায় ভরা। তাদের সমস্ত ব্যবস্থাই ছিল উৎপীড়নমূলক। কিন্তু বিজয়ী মুসলিম বাহনীর আচার আচরণ ছিল এর ঠিক উল্টো। তাঁদের ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে ফুটে উঠত ভালোবাসা ও আন্তরিকতা। ফলে বিজিত সিরিয়াবাসীরা মন-মানসিকতার দিক থেকে বিজয়ী মুসলিম বাহিনীর দিকে ঝুঁকে পড়ে। ফল এ দাঁড়ায় যে, কৌশলগত কারণে মুসলিম বাহিনী সাময়িকভাবে হিমস থেকে সরে গেলেও অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁরা অধিকতর শক্তি, দৃঢ়তা এবং জনপ্রিয়তা নিয়ে পুনরায় হিম্‌স এ প্রত্যাবর্তন করে।

পারস্য সম্রাটের পরিণতিও এর চেয়ে ভিন্নতর কিছু ছিলো না। আধুনিক ইরাকের যে অঞ্চলটি কুফা বলে খ্যাত, তার নাম হিরা। আকস্মিক আক্রমণ চালিয়ে মুসলিম বাহিনী শুরুতেই হিরা এবং আরো কিছু অঞ্চল দখল করে নেয়। এরপর মুসলিম বাহিনীর একটি অংশকে ইরাক থেকে পাঠিয়ে দিতে হয় সিরিয়ায়। ফলে ইরাক অঞ্চলে মুসলিম বাহনীর সামরিক তৎপরতা সাময়িকভাবে বন্ধ থাকে। কিন্তু মাস কয়েকের মধ্যে পারস্য বাহিনীর সাথে

মুসলিম বাহিনীর পুনরায় সংঘর্ষ বাধে এবং মুসলিম বাহিনী অনায়াসেই রাজধানী মাদায়েন (প্রাচীন নাম সেটিসিফোন) দখল করে নেয়। নিরুপায় হয়ে সম্রাট ইয়াজ্‌দিগিরদ সামরিক সাহায্য চেয়ে চীন, তুর্কীস্থান এবং পার্শ্ববর্তী রাজা-বাদশাহদের নিকট আকুল আবেদন জানায়। কিন্তু বিপুল সাহায্য লাভ করেও তার শেষ রক্ষা হলো না। মুসলিম বাহিনীর মুকাবিলায় সম্মিলিত বাহিনী কোনো রকম সুবিধা করতে পারলো না এবং তাদেরকে বিপুল ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হতে হলো।

খলীফা হযরত উমর (রা) ৬৩৪ সাল থেকে ৬৪৪ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ১০টি বছর খিলাফতের দায়িত্ব পালন করেন। এ সময়ে মুসলমানগণ ত্রিপোলী (লিবিয়া) থেকে সুদূর বল্‌খ (আফগানিস্তান) এবং আর্মেনিয়া থেকে সিন্ধু (পাকিস্তান) ও গুজরাট (ভারত) পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চল শাসন করেন। সিরিয়া, ইরাক, ইরানসহ সমগ্র অঞ্চল ছিল মুসলমানদের দখলে।

হযরত উমর (রা)-এর ইন্তেকালের পর খিলাফতের দায়িত্ব ন্যস্ত হল হযরত উসমান (রা)-এর ওপর। তিনি ৬৪৪ থেকে ৬৫৬ সাল পর্যন্ত শাসনকার্য পরিচালনা করেন। এ সময়ে মুসলমানগণ নুবিয়া থেকে দোসোনা পর্যন্ত শাসনাধীনে আনয়ন করে। খলীফা উসমান (রা)-এর আমলেই স্পেনের আন্দালুসিয়া মুসলমানদের দখলে আসে। পূর্ব দিকে তারা জায়হুন (আক্সাস) নদী অতিক্রম করে চীনের বেশ কিছু অঞ্চল করায়ত্ত করে। সাইপ্রাস দ্বীপপুঞ্জ, রোডস এবং ক্রীট চলে আসে মুসলমানদের শাসনাধীনে। যদিও মুসলমানগণ এ সময়ে রোমকদের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন, তবুও এক সময়ে তারা রাজধানী কনস্টান্টিনোপলের ওপর অভিযান পরিচালনা করেন। বস্তুতপক্ষে কনস্টান্টিনোপলের ওপর এটাই ছিল প্রথম অভিযান।

নবী করীম (স)-এর ইন্তিকালের পর তখনো ১৫ বছর পূর্ণ হয়নি। এরি মধ্যে মুসলিম খিলাফত পূর্বে ও পশ্চিমে আটলান্টিক থেকে সুদূর প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে আর যা ছিল গোটা ইউরোপ মহাদেশের সমান। মুসলমানদের এ বিজয় যত দ্রুতই হোক না কেন বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, খিলাফতের কোনো অঞ্চল থেকে কখনো কোনো অসন্তোষ দেখা দেয়নি। ৬৫৬ সালের পরবর্তী সময়ের ঘটনা প্রবাহ থেকেই এর প্রমাণ মেলে। ৬৫৬ সালের পর মুসলমানদের মধ্যে প্রথম গৃহযুদ্ধ সূচিত হয়। সূচিত হয় অন্তর্দ্বন্দ্বের। তবুও কোথাও কোনো রকম বিদ্রোহ বা আন্দোলন দেখা যায়নি। এমনকি পূর্বে যে সমস্ত অঞ্চল

রোমকদের শাসনাধীনে ছিল সে সমস্ত এলাকার জনগণের নিকট থেকেও রোমক সম্রাট সহযোগিতা পায়নি। বরং মুসলমানদের মধ্যকার এ গৃহযুদ্ধের সময় রোমক সম্রাট নিরপেক্ষ থাকবে—এ শর্তে সিরিয়ার মুসলমান গভর্ণর যে সামান্য অর্থ দেয়ার প্রস্তাব দেয় ততটুকুতেই তাকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়।

মুসলমানদের এই দ্রুত বিস্তারের জন্য কোনো একক কারণ নির্ধারণ করা যায় না। একথা সত্য যে, এ সময়ে রোমক এবং পারস্য শাসকদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব ও কলহ বিরাজ করছিল। ফলে তারা ছিল দুর্বল। কিন্তু সে তুলনায় অস্ত্র, সংগঠন এবং সম্পদের দিক থেকে মুসলমানদের অবস্থা ছিল আরো বেশী নাজুক। মুসলমানদের পক্ষে সুদূর চীন থেকে স্পেন পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে রসদ এবং অভিযান পরিচালনা সম্ভব ছিল না। এমনকি তাদের প্রয়োজনীয় সংখ্যক জনশক্তির যথেষ্ট অভাব ছিল।

আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি যে, পারস্য বা রোমকদের সাথে মুসলমানদের যুদ্ধ ছিল প্রধানত রাজনৈতিক। ইসলামকে জোর করে অপরের ওপর চাপিয়ে দেয়ার ব্যাপারে মুসলমানদের মধ্যে বিন্দুমাত্র ইচ্ছা ছিল না। এমনকি এ ব্যাপারে কুরআন মজীদে বলা হয়েছে, ধর্মে কোনো জবরদস্তি নেই। ইতিহাস সাক্ষ দেয় যে, ইসলামের ইতিহাসে কোনো বিজিত ব্যক্তিকে জোর করে ধর্মান্তরিত করা হয়নি। বস্তুতপক্ষে তারা ইসলামকে দেখত একটি সহজ-সরল এবং যুক্তিনির্ভর ধর্ম হিসেবে। সে সাথে তারা মুসলমানদের ব্যবহারিক জীবনে ইসলামের বাস্তবরূপ দেখতে পায়। সন্দেহ নেই যে, বিজিত জনগোষ্ঠী এ বিষয় দুটির প্রতি ভীষণভাবে আকৃষ্ট হয় এবং তারা স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করে।

বস্তুতপক্ষে মুসলমানদের দ্রুত এবং উপর্যুপরি বিজয়ের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে লুণ্ঠন এবং অর্থনৈতিক সুবিধা আদায়ের কথা বলা একান্তই অবান্তর। কারণ বিজিত জনগোষ্ঠী মুসলমানদের আগমন ও শাসনকে অন্তর থেকে স্বাগত জানিয়েছে। তাদের দৃষ্টিতে এ পরিবর্তন ছিল কল্যাণকর।

সম্প্রতি মিসরে প্যাপাইরাসের ওপর হাতে লেখা কিছু কাগজ পাওয়া গেছে। এগুলো মূলত মুসলিম শাসনামলের প্রশাসনিক দলীল পত্র। এসব দলীল-পত্র থেকে জানা যায় যে, মিসরে মুসলমানদের আগমনের পর জনগণের দেয়া করের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য মাত্রায় হ্রাস পায়। এটা থেকে নিশ্চিতভাবে এ অনুমান করা যায় যে অন্যান্য যে সমস্ত অঞ্চল

মুসলমানদের শাসনাধীনে এসেছে সে সমস্ত অঞ্চলে অনুরূপ সংস্কার সাধন করা হয়েছে। তাছাড়া মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার পর প্রশাসনিক ব্যয়ও বহুলাংশে হ্রাস পায়। এটা যে কেবলমাত্র মুসলমানদের সহজ সরল জীবন প্রণালী ও মিতব্যয়িতার জন্য সম্ভব হয়েছিলো তা নয়। মুসলমান শাসকগণের সততাও ছিল প্রশাসনিক ব্যয় হ্রাস পাওয়ার একটি অন্যতম কারণ।

যুদ্ধলব্ধ সম্পদের ব্যাপারেও ইসলামের একটি স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গী রয়েছে। যুদ্ধের সময়ে যেসব সৈন্য সম্পদ সংগ্রহ করে, এ সম্পদ কেবল তাদেরই প্রাপ্য হয় না। বরং এ সম্পদ জমা হয় সরকারী কোষাগারে। পরবর্তীতে এ সম্পদ অভিযানে অংশগ্রহণকারী সকলের মধ্যে নির্দষ্টহারে বিলি বণ্টন করা হয় এবং কে কি পরিমাণ পাবেন তাও আইনের মাধ্যমে নির্ধারণ করা আছে। ইতিহাস সাক্ষ দেয় যে, সাধারণ সৈন্য এবং অফিসারগণ যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সরকারী কোষাগারে জমা দেয়ার ব্যাপারে খুবই সৎ ও নিষ্ঠাবান ছিলেন। এমনও দেখা গেছে যে বহু মূল্যবান ও দামী পাথর ও বিষয় সামগ্রীও তাঁরা সযত্নে সরকারের হাতে তুলে দিতেন। অথচ এগুলো লুকিয়ে রাখা বা পকেটস্থ করা ছিলো খুবই সাধারণ ব্যাপার। খলীফা হযরত উমর (রা) সৈনিকদের এমন সততা দেখে পরম আনন্দে উৎফুল্ল হতেন।

এ প্রসঙ্গে সমসাময়িককালের একজন খৃস্টান ধর্মযাজকের লেখা একটি পত্রের উল্লেখ করা যেতে পারে। পত্রটি তিনি তাঁর এক বন্ধুকে লিখেছিলেন এবং এখনো তা সযত্নে সংরক্ষিত আছে। (এসেমানি, বাইবেল, ওরিয়েন্ট, ৩ পৃ-২) তিনি লিখেছেন যে, এ সমস্ত আরব গোষ্ঠী যাদেরকে আল্লাহ তাআলা যথেষ্ট ক্ষমতা দিয়েছেন, তারাই এখন আমাদের শাসক। তবু তারা কখনো খৃস্টান ধর্মের সাথে বিবাদ করেনি। বরং তাঁরা আমাদের ধর্মের নিরাপত্তা দিচ্ছে। আমাদের ধর্মযাজক ও ঋষিপুরুষদের সম্মান করে এবং আমাদের গীর্জা ও আশ্রমগুলোতে অনুদান দেয়।

উমাইয়া খেলাফত

৬৫৬ খৃস্টাব্দে তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান (রা)-এর ইন্তিকালের পর খলীফা নির্বাচন নিয়ে মুসলিম বিশ্বে বিবাদের সূত্রপাত ঘটে। পরবর্তী ২০ বছরে বিভিন্ন সময়ে এ বিবাদ গুরুতর আকার ধারণ করে। এ সময়ের মধ্যে কম করে হলেও ৬ জন খলীফা শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। আবার তাঁরা অকালেই ইতিহাসের অন্তরালে হারিয়ে যান।

৬৮৫ সালে খলীফা আবদুল মালিকের শাসন ক্ষমতায় আরোহণের পর খেলাফতে স্থিতিশীলতা ফিরে আসে। মুসলিম সাম্রাজ্য বিস্তারে নতুন মাত্রা যুক্ত হয়। একদিকে মরক্কো এবং স্পেন মুসলমান শাসনাধীনে চলে আসে। অপরদিকে পাক-ভারত মহাদেশের উত্তরাংশে এবং ট্রান্স-অক্সিয়ানা পর্যন্ত মুসলমানদের শাসন বিস্তার লাভ করে। আমরা আরো দেখতে পাই যে, বরডক্স নার্বোন এবং তৌলুস (ফ্রান্স) অঞ্চলে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা লাভ করে। মুসলমানদের রাজধানী মদীনা থেকে দামেশকে স্থানান্তরিত হয়। দামেশক ছিল রোমকদের শাসনাধীন অঞ্চল। পক্ষান্তরের পুণ্যভূমি মদীনা ছিল নবী করীম (স)-এর কর্মস্থল। দামেশকে রাজধানী স্থানান্তরের পর সামগ্রিক কাজকর্মে ধর্মীয় আবহাওয়া হ্রাস পায়। তদস্থলে ধর্মনিরপেক্ষ ভাবধারা সর্বত্র প্রাধান্য লাভ করে। তখন থেকেই মুসলমানদের মধ্যে জৌলুস, সম্পদের অপচয়, অপব্যয় এবং শাসনকাজে পক্ষপাতিত্বের সূত্রপাত ঘটে। ফলে মুসলিম সাম্রাজ্যে বার বার বিদ্রোহ বিপ্লব মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে।

এ সময়ে মুসলমানদের রাজনৈতিক অবস্থা যাই হোক না কেন বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা এবং সামগ্রিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে তাদের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। মুসলমানদের হাতে শিল্প-কারখানায় নতুন গতিসঞ্চার হয়। চিকিৎসা বিজ্ঞান সরকারের বিশেষ অনুপ্রেরণা লাভ করে। গ্রীক এবং অন্যান্য ভাষায় রচিত চিকিৎসা গ্রন্থসমূহ আরবী ভাষায় অনুবাদ করা হয়।

উমাইয়া খলীফা হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীযের শাসনকাল ছিল খুবই স্বল্প সময়ের, মাত্র ৭১৭ থেকে ৭২০ পর্যন্ত। কিন্তু তাঁর শাসনামল ছিল গৌরব উজ্জ্বল। বস্তুতপক্ষে এ সময়ে তিনি একটি নব যুগের সূচনা করেন। হযরত আবু বকর (রা) ও হযরত উমর (রা) যে শাসনব্যবস্থা কায়েম করেছিলেন, উমর ইবনে আবদুল আযীযও যেনো তাঁর মেধা, নিষ্ঠা ও কর্তব্যকর্মের মাধ্যমে সেটাই পুনঃস্থাপন করেন।

ইতিপূর্বে যে সমস্ত সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিলো, তিনি সেগুলো পুনর্বিবেচনায় আনেন এবং আইনসঙ্গত মালিক বা উত্তরাধিকারিগণের নিকট ফিরিয়ে দেন। তিনি অপ্রয়োজনীয় এবং অযৌক্তিক করসমূহ রহিত করেন। নিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তিনি ছিলেন খুবই দৃঢ় এবং সংকল্পচিত্ত, এমন কি একজন নির্যাতিত অমুসলিম যখন কোনো নির্যাতনকারী মুসলিমের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করত তখনো তিনি ন্যায়বিচার করার ব্যাপারে খুবই দৃঢ়চিত্ত ও অবিচল থাকতেন।

রাজ্য শাসনের ব্যাপারে খলীফা উমর বিন আবদুল আযীয এতখানি দৃঢ় ছিলেন যে, মুসলিম বাহিনী অন্যায়ভাবে এবং বিশ্বাসঘাতকতা করে যে সমস্ত অঞ্চল দখল করেছিলেন সে সমস্ত অঞ্চল থেকে মুসলিম বাহিনী প্রত্যাহার করে নেন। এ প্রসঙ্গে সমরখন্দের কথা বলা যেতে পারে। অন্যায়ভাবে দখল করা একখণ্ড জমির ওপর রাজধানীর প্রধান মসজিদের একটি অংশ নির্মাণ করা হয়েছিলো যা তিনি ভেঙে ফেলার নির্দেশ দেন। এসব খলীফা উমর ইবনে আবদুল আযীযের শাসন আমলের কয়েকটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

বস্তুতপক্ষে এ সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করার ফলাফলও হয়েছিলো খুবই বিস্ময়কর। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে যে, উমাইয়া খিলাফতের শুরুতে ইরাকের রাজস্ব আয়ের পরিমাণ হ্রাস পেতে থাকে। উমর ইবনে আবদুল আযীযের শাসনভার গ্রহণের পূর্বে এর পরিমাণ ছিল মাত্র ১৮ মিলিয়ন দিরহাম। কিন্তু তাঁর আমলে এর পরিমাণ ১২০ মিলিয়ন ছাড়িয়ে যায়।

উমর ইবনে আবদুল আযীযের ধর্মীয় অনুরাগ ও নিষ্ঠার সুখ্যাতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। দিনে দিনে অনেকেই তাঁর প্রতি খুবই অনুরক্ত হয়ে ওঠে। এক সময়ে সিন্দু, তুর্কীস্তান এবং বারবার রাজাগণ ইসলাম গ্রহণ করেন। প্রত্যেকেই বিপুল উৎসাহের সাথে ইসলাম সম্পর্কে চর্চা শুরু করেন। এ সময়ে বিদ্বান এবং গুণীজনদের মধ্যে বিজ্ঞান চর্চা ব্যাপক প্রসার লাভ করে। তাঁদের নিরলস সাধনার ফলে মুসলমানগণ বিজ্ঞান চর্চার বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নতির শীর্ষে পৌঁছেন। সর্বোপরি খলীফা উমর ইবনে আবদুল আযীয কঠোর হস্তে দুর্নীতি দমন করেন। ফলে তাঁর প্রশাসন কার্যত খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করে ।

উমাইয়া খিলাফতের সময় স্থাপত্য শিল্প ব্যাপক প্রসার লাভ করে। ৬৯১ সালে নির্মিত জেরুজালেমের শিলা গম্বুজ (ডোম অব দি রক) এখনো দেখতে পাওয়া যাবে। দামেশকে এবং অন্যান্য স্থানে সে আমলের স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন এখনো বিরাজ করছে। এগুলো মূলত স্থাপত্য শিল্পে মুসলমানদের অগ্রগতির স্বাক্ষর বহন করছে।

মুসলিম উম্মার দুটি প্রধান সম্প্রদায়ের একটি শিয়া অপরটি সুন্নী। উমাইয়া খিলাফত কালের একটি রাজনৈতিক প্রশ্নকে কেন্দ্র করে এ সম্প্রদায় দুটির উদ্ভব ঘটে। প্রশ্নটি ছিল এ রকম—নবী করীম (স)-এর উত্তরাধিকার কিভাবে নির্বাচিত হবে ? এটা কি নির্বাচনের মাধ্যমে

নির্ধারিত হবে, নাকি প্রিয়নবী (স)-এর নিকট আত্মীয়দের মধ্যে থেকে কেউ উত্তরাধিকার হিসেবে মনোনয়ন পাবেন ?

বস্তুতপক্ষে শিয়া সম্প্রদায়ের এ প্রশ্নটি খুবই গুরুত্বের সাথে আলোচিত হতে থাকে এবং এটি একটি মতবাদে রূপ নেয়। এ মতবাদ থেকে তাদের মধ্যে মতভেদের সৃষ্টি হয় এবং তারা বিভিন্ন দল উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এমনকি এক সময়ে তারা গৃহযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। এ ধরনের একটি বিদ্রোহ ৭৫০ সালে উমাইয়া খিলাফতের পতন ঘটায়। তাদের স্থলে ক্ষমতার মসনদে অধিষ্ঠিত হল আব্বাসীয়রা। কিন্তু এ পরিবর্তন শীয়াদের কোনো উপকারে আসেনি। বর্তমানে মুসলিম বিশ্বে শীয়াদের সংখ্যা সম্ভবত দশভাগের একভাগ। বলতে গেলে অবশিষ্টরা সবাই সুন্নী। অবশ্য এসময়ে খারেজী নামে আরেকটি সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে। তাদের সংখ্যা ছিল অতি সামান্য।

আব্বাসীয় খেলাফত

৭৫০ সালে আব্বাসীয় খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সাথে সাথে বিশাল মুসলিম সাম্রাজ্য প্রথম দুটি অংশে বিভক্ত হয়। পরে আরো কতকগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ বংশের উদ্ভব ঘটে। খেলাফতের কেন্দ্রবিন্দু দামেশকের পরিবর্তে বাগদাদে স্থানান্তরিত হয়। কর্ডোভাকে কেন্দ্র করে প্রতিষ্ঠিত হলো আরেকটি খেলাফত। বস্তুতপক্ষে এরা আব্বাসীয় খেলাফতের প্রতিপক্ষ। ১৪৯২ সালে তাদের পতনের পূর্ব পর্যন্ত তারা আব্বাসীয়দের সাথে কোনো রকম আপোস রফায় উপনীত হয়নি।

আব্বাসীয় খেলাফত কতকগুলো অঞ্চলে বিভক্ত ছিল। প্রতিটি অঞ্চলের জন্য একজন শাসক ছিলেন। তাঁরা বাগদাদের খেলাফতের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করলেও খলীফার ওপর খুব সামান্যই নির্ভর করতেন। এমনকি পররাষ্ট্র নীতি বা আভ্যন্তরীণ প্রশাসনের ব্যাপারে তাঁরা ছিলেন সম্পূর্ণ স্বাধীন। এ সমস্ত আঞ্চলিক শাসনকর্তা নিজেরাই রাজ্য জয় বা যুদ্ধের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতেন। সে কারণেই আব্বাসীয় শাসনামলে বড় রকমের কোনো সামরিক বিজয় ঘটেনি।

এ সময়ে রোমকদের সাথে মুসলমানদের সম্পর্ক অধিকতর তিক্তরূপ ধারণ করে। নিশ্চিতভাবেই তাদেরকে এশীয়া মাইনর থেকে সরে যেতে হয় এবং বেশ কিছুদিনের জন্য তাদেরকে ইউরোপীয় অঞ্চল নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়।

আব্বাসীয়রা সেনাবাহিনীতে আমূল পরিবর্তন আনে। ইতিপূর্বে বাহিনী গঠিত হতো স্বেচ্ছাসেবী সৈন্যদের নিয়ে। তদস্থলে আব্বাসীয়রা পেশাদার সৈন্যদের দিয়ে বাহিনী গঠন করে। প্রধানত তুর্কী বংশোদ্ভূত সৈন্যদের মধ্য থেকে তাদের নির্বাচন করা হয়। এখান থেকেই জন্ম নেয় সামন্তবাদের। পরবর্তীকালে এগুলোই স্বাধীন প্রাদেশিক সরকারে রূপান্তর লাভ করে। এগুলো শাসিত হতে থাকে কতকগুলো রাজবংশের অধীনে।

মসনদে আরোহণের প্রায় একশত বছর পর আব্বাসীয় খলীফাগণ কেন্দ্রের বন্ধন থেকে সরে আসা আমীর বা প্রাদেশিক সরকারের নিকট ক্ষমতা ডেলিগেট করতে শুরু করেন। আসলে এটা ছিল তাদের ক্ষমতা হারানোর শামিল। এমনকি দেশের সার্বভৌম ক্ষমতাও আমীরের হাতে চলে যায়। আমীরদের মধ্যে যারা শক্তিশালী, তারা রাজ্যের প্রধান প্রধান শহরগুলো পর্যন্ত নিজেদের দখলে নিয়ে নেয়। এভাবেই খলীফাগণের সার্বভৌম ক্ষমতা ক্রমান্বয়ে প্রাসাদের মধ্যে সীমিত হয়ে পড়ে। মূল ক্ষমতা চলে যায় আমীরদের নিয়ন্ত্রণে। মুসলমান আমীর ও খলীফাগণের শাসন ক্ষমতা বন্টনের এ ধারার সাথে খৃস্টান যাজক ও শাসকের ক্ষমতা বন্টনের প্রক্রিয়ার মস্তবড় একটা পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। খৃস্টান ধর্মযাজকগণ কাজ শুরু করেন রাজনৈতিক ক্ষমতা ছাড়া। তারও কয়েক শতাব্দী শেষে বিশেষ করে রোমান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর খৃস্ট যাজকগণ ক্ষমতা লাভ করেন। কিছু দিনের মধ্যে তাঁরা সম্রাটদের চেয়েও বেশী শক্তিশালী হয়ে ওঠেন। অপরদিকে খলীফাগণ শক্তিশালী শাসক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে তাঁরা সুলতান বা আমীরদের মধ্যে ক্ষমতা ভাগাভাগী করে দেন। অবশেষে তারা নামকাওয়াস্তে সরকার প্রধান হিসেবে টিকে থাকেন। নিজেদের প্রভাব প্রতিপত্তি খাটানোর শক্তিটুকু শূন্যের কোঠায় গিয়ে পৌছে।

আব্বাসীয় শাসনামলে সিসিলিতে একবার গৃহযুদ্ধ বাঁধে। আঘলাবী রাজবংশ তখন তিউনিস শাসন করছিল। সিসিলির বিবদমান পক্ষ আঘলাবী শাসককে সিসিলিতে অনুপ্রবেশের আমন্ত্রণ জানায়। তদনুসারে তারা সিসিলি দ্বীপটি দখল করে নেয় এবং মূল ভূখণ্ড দিয়ে অগ্রসর হতে হতে রোমের প্রাচীর পর্যন্ত চলে আসে। তারা ফ্রান্সের দক্ষিণাংশও দখল করে নেয়। সুইজারল্যাণ্ডের উল্লেখযোগ্য অংশও আয়ত্তাধীনে আনে।

আঘলাবীদের হাতে রাজ্যের বিস্তার ঘটলেও পরবর্তীতে ফাতেমীয়দের কাছে তাদের পতন ঘটে। এরা ছিলো শিয়া মতাবলম্বী। তারা কায়রো

শহরে রাজধানী স্থানান্তর করে। কায়রোকে কেন্দ্র করেই আব্বাসীয়দের প্রতিপক্ষ হিসেবে গড়ে তোলে ফাতেমীয় খেলাফত। সাধারণভাবে ফাতেমীয় শাসকরা ছিলেন শিক্ষিত, রুচীশীল ও সংস্কৃতমনা। তাদের মধ্যে একজনে নেহায়েত বোকামী করেই জেরুজালেমে খৃষ্টানদের পবিত্র কবরস্থানগুলোর অসম্মান করে। এর ফলে ইউরোপীয় খৃষ্টানরা ভীষণভাবে ক্রুদ্ধ হয়। এক সময়ে ধর্মযাজকরা ইসলামের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ (ক্রুসেড) ঘোষণা করে। এরপর মুসলমান ও খৃষ্টানদের মধ্যে একের পর এক যুদ্ধ চলতে থাকে। পরবর্তী দু'শত বছরব্যাপী উভয় পক্ষে রক্তক্ষরণ অব্যাহত থাকে। প্রথম ক্রুসেডের সময়ই ফাতেমীয়রা প্যালেস্টাইন থেকে নিজেদের প্রত্যাহার করে নেয়। ফলে শহরের নিরীহ নাগরিকরা আক্রমণকারী খৃষ্টানদের হাতে জীবন দিতে বাধ্য হয়। তারচেয়ে দুঃখজনক ঘটনা এই যে, ফাতেমীয়দের সাথে মুসলিম লিভ্যান্টের অধিবাসীদের (ভূমধ্য সাগরের পূর্বাঞ্চলে) বৈরী সম্পর্ক ছিলো। লিভ্যান্টবাসীদের সাথে যখন খৃষ্টানদের ধর্মযুদ্ধ বেঁধেছে, তখন এ ফাতেমীয়রাই খৃষ্টানদের সহযোগিতা দিয়েছে।

এ সময়ে মুসলিম বিশ্ব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য স্বাধীন রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে পড়েছিলো। তাদের পরস্পরের মধ্যে বিরাজ করছিল যুদ্ধাবস্থা। সেখানে কেন্দ্রীয় শাসন বা সংহতি বলতে কিছুই ছিল না। এ সমস্ত শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে তুর্কী ও কুর্দী শাসকগণের অবস্থান ছিল অধিকতর সুসংহত। খৃষ্টানদের সাথে যুদ্ধে আরব শাসকগণের চেয়ে তাঁরা ছিলেন অনেক অগ্রসর।

দ্বিতীয় ক্রসেডের সময় মুসলমান বীর সেনাপতি গাজী সালাহউদ্দীনের অমিততেজ সবাইকে ছাড়িয়ে গেলো। তিনি যে কেবলমাত্র ইউরোপীয় খৃষ্টানদেরকে সিরিয়া ও প্যালেস্টাইন থেকে বহিষ্কার করলেন তাই নয়। বরং ফাতেমীয়দেরকে পর্যন্ত বিতাড়িত করলেন। সালাহউদ্দীন ও তাঁর পূর্ববর্তী শাসকগণ বাগদাদের আব্বাসীয় খেলাফতের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করলেন। কিন্তু আব্বাসীয়রা তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা পুনরুদ্ধারে সমর্থ হলো না। বরং সাম্রাজ্যের সার্বভৌম ক্ষমতা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেকগুলো রাষ্ট্রের হাতে খণ্ডিতভাবে রয়ে গেল। অবশ্য তাদের মধ্যে অনেকেই রাজ্যের সীমানা বিস্তারে অনেকখানি সফল হন।

আব্বাসীয়রা যখন বাগদাদের খেলাফতে অধিষ্ঠিত ছিলেন তখন রাশিয়ার ভলগা নদীর তীরবর্তী কাজান অঞ্চলকে বলা হত বুলজার। বুলজারের রাজা একজন ধর্ম প্রচারক প্রেরণের জন্য আব্বাসীয় খলীফাকে অনুরোধ

করেন। তদনুসারে ইবনে ফজলকে পাঠান হলো রাশিয়ায়। তাঁর সফর বৃত্তান্তটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ এবং বিশেষভাবে উল্লেখের দাবী রাখে। তিনি লিখেছেন যে, বুলজারের রাজা ইসলাম গ্রহণ করেন এবং সেখানে তিনি একটি ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করেন। অথচ তার আশেপাশে সবগুলো ছিল অমুসলিম রাষ্ট্র। পরবর্তীকালে ককেশাস এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহে ধীরগতিতে ইসলাম প্রসার লাভ করে।

ভারতবর্ষ

আফগানিস্তানের গজনবী রাজবংশ পুনরায় ভারতে অভিযান চালায় এবং রাজ্য দখল করতে শুরু করে। অন্যান্য যে সমস্ত রাজবংশ এতদিন নিজ নিজ রাজ্যসীমা নিয়ে তৃপ্ত ও নীরব ছিল, এবার তারাও তৎপর হয়ে ওঠে। খিলজীরা দক্ষিণ ভারতের দিকে বিজয় অভিযান চালায়। মালিক কাফুর নামের একজন নিগ্রো সেনাপতি ত্বরিত গতিতে অভিযান চালিয়ে কামোরিন প্রণালী পর্যন্ত অগ্রসর হয়। এরপর এতদঞ্চলে মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

ভারতীয় মুসলমানদের ইতিহাসে মুঘলরা একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছে। তারা ১৫২৬ সাল থেকে ১৮৫৮ সাল পর্যন্ত দোর্দণ্ড প্রতাপের সাথে প্রায় উপমহাদেশটি শাসন করে। মুঘলরা বিবেচিত হয় বিশ্বের একটি বৃহৎ শক্তি হিসেবে। বস্তুতপক্ষে অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে মুঘলদের কেন্দ্রীয় ক্ষমতা শিথিল হতে থাকে। তদস্থলে প্রাদেশিক সরকার অধিকতর ক্ষমতা লাভ করে। ১৮৫৮ সালে ইংরেজরা মুঘলদের বিতাড়িত করে। বিশাল মুঘল সাম্রাজ্যের প্রায় পাঁচ ভাগের তিনভাগ ইংরেজরা দখল করে নেয়। অবশিষ্ট অঞ্চলে কতগুলো ছোট ছোট রাষ্ট্র গড়ে ওঠে। এর মধ্যে কিছু কিছু মুসলিম শাসনাধীন রাষ্ট্র। বর্তমানে আমরা এ দেশে যে মুসলিম সংস্কৃতির সন্ধান পাই, তা মূলত মুসলিম শাসনাধীন রাষ্ট্রগুলোর কারণেই সম্ভব হয়েছে।

মুসলিম শাসনাধীন একটি রাষ্ট্রের নাম হায়দরাবাদ। বলা যেতে পারে যে, এটাই হল ভারতের কেন্দ্রস্থল। আয়তনের দিক থেকে হায়দরাবাদ প্রায় ইটালীর সমান। সে সময়ে এর জনসংখ্যা ছিল বিশ লাখের বেশী। ইসলামী শিক্ষার সংস্কারের জন্য হায়দরাবাদ বিশেষ পরিচিতি লাভ করে। পাশ্চাত্যের অনুকরণে এখানে প্রতিষ্ঠিত হয় একটি বিশ্ববিদ্যালয়। এর ফ্যাকাল্টি বা অনুষদ সংখ্যা ছিল প্রায় ডজন খানেক। তন্মধ্যে তত্ত্ব অনুষদ অন্যতম। এখানে সকল বিষয়ে এবং সকল পর্যায়ে শিক্ষা দেয়া হতো।

শিক্ষার মাধ্যম ছিল উর্দু। স্কুল স্তর থেকেই শুরু হত স্পেশিয়ালাইজেশন। এ স্তরে আরবী ভাষা, ফিক্‌হ ও হাদীস অধ্যয়ন ছিল বাধ্যতামূলক। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ছিল ইংরেজী ভাষা, অংক এবং অন্যান্য আধুনিক বিষয়সমূহ। বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের ধর্মতত্ত্বের শিক্ষার্থীকে উচ্চতর ইংরেজী অধ্যয়ন করতে হতো। তাদের আরো পড়তে হতো আরবী এবং ইসলামিক স্টাডিজের বিভিন্ন বিষয়সমূহ। তাছাড়া তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কে অধ্যয়ন করাটা ছিল সাধারণ ব্যাপার। এ বিষয়ের শিক্ষার্থীদের ফিক্‌হ-এর সাথে আধুনিক আইনশাস্ত্র, কালাম শাস্ত্রের পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস, আরবীর সাথে হিব্রু অথবা অন্য কোনো ইউরোপীয় আধুনিক ভাষা, বিশেষ করে ফরাসী বা জার্মান ভাষা শিখতে হত। থিসিস রচনার সময় শিক্ষার্থী দুজন তত্ত্বাবধায়কের তত্ত্বাবধানে কাজ করতেন। তন্মধ্যে একজন থাকতেন ধর্মতত্ত্বের অধ্যাপক, অন্যজন কলা বা আইন বা সংশ্লিষ্ট অন্যকোনো বিষয়ের অধ্যাপক। এর ফলে একজন ছাত্র একটি বিষয়ের ওপর ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে কথা বলতে পারতো। তেমনি পাশ্চাত্যের আধুনিক ভাবধারা ও দৃষ্টিভংগি সম্পর্কে পূর্ণ অবহিত থাকত।

১৯৪৭ সালে ইংরেজরা যখন চিরদিনের জন্য এ দেশ ছেড়ে চলে যায়, তখন মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চল নিয়ে গঠিত হয় পাকিস্তান। আর অমুসলিমদের জন্য গঠিত হয় ভারত বা হিন্দুস্থান। ভারত পার্শ্ববর্তী ছোট রাষ্ট্রগুলোকে নিজের আওতাভুক্ত করেই ক্ষান্ত হলো না। তাদের প্রশাসন ব্যবস্থাকে ভেঙে দিল, ছিন্নভিন্ন করে দিল স্বতন্ত্র সত্ত্বাকে। বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণ অমিল থাকা সত্ত্বেও সেখানে প্রতিষ্ঠা করল ভাষা ভিত্তিক একটি জাতিপুঞ্জ। (১৯৭১ সালে দীর্ঘ ন'মাস পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চল এক রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ কায়েম করলো। বাংলাদেশের ৯০ ভাগ মানুষ মুসলিম।)–সম্পাদক

পূর্বের আলোচনায় ফিরে আসা যাক। আব্বাসীয় সাম্রাজ্যভুক্ত রাষ্ট্র বা প্রদেশগুলোর শাসন ক্ষমতায় যখন তখন পরিবর্তন আসাটা ছিল একটি নৈমিত্তিক ব্যাপার। এ পরিবর্তন আসত বিভিন্নভাবে। অভ্যুত্থানের কারণে শাসক পাল্টাতো। কখনো আবার একাধিক রাষ্ট্র বা প্রদেশ মিলে একটি বৃহৎ রাষ্ট্রে রূপান্তর লাভ করত। আব্বাসীয় খলীফাগণ ছিল দেশের এ রূপান্তর প্রক্রিয়ার নীরব সাক্ষী। এত কিছুর পরও একথা সত্য যে, এ সময়ে অমুসলিম কর্তৃক কোনো মুসলিম শাসিত অঞ্চল গ্রাস করে নেয়ার ঘটনা বড় একটা ঘটেনি।

এখানে সেলজুক মুসলমানদের কথা বিশেষভাবে উল্লেখের দাবি রাখে। একাদশ শতাব্দীতে তারা ক্ষমতায় আসে। অল্প সময়ের মধ্যেই তারা মধ্য এশিয়াকে নিজেদের অধীনতা পাশে আবদ্ধ করে। কেনিয়ায় প্রতিষ্ঠা করে রাজধানী। বেশ কয়েক পুরুষ তারা দোর্দণ্ড প্রতাপের সাথে শাসন অব্যাহত রাখে। অতপর অটোমান তুর্কীরা তাদের স্থলাভিষিক্ত হয়। তুর্কী মুসলমানদের হাতে আরো ব্যাপকভাবে মুসলিম সাম্রাজ্যের বিস্তার ঘটে। তারা বসফরাস অতিক্রম করে এবং ভিয়েনা সীমান্ত পর্যন্ত পৌছে। প্রথমে তারা ব্রুসায় রাজধানী স্থাপন করে। পরবর্তী সময়ে তারা রাজধানীকে কনস্টান্টিনোপলে স্থানান্তর করে। এর আধুনিক নাম ইস্তাম্বুল, আংকারার পাশেই এটা অবস্থিত। তুর্কী মুসলমানদের পশ্চাদপসরণ শুরু হয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে। এক এক করে তারা ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে নিজেদের প্রত্যাহার করে নিতে থাকে।

১৯১৯ সালে প্রথম মহাযুদ্ধে পরাজয়ের পর তাদের এ প্রত্যাহার প্রক্রিয়া চূড়ান্তরূপ লাভ করে। পরবর্তীতে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এমন কিছু ঘটনা ঘটে যা তুর্কীদের জন্য সুসংবাদ বয়ে আনে এবং একটি স্বাধীন প্রজাতন্ত্র হিসেবে পুনরায় তাদের উত্থান ঘটে। শুরুতে এ প্রজাতন্ত্র ছিল ধর্মনিরপেক্ষ এবং প্রচণ্ড রকমের উগ্র। তাছাড়া গণতন্ত্র ছিল এর অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য।

নতুন প্রজাতন্ত্রটি মুসলিম অধ্যুষিত হওয়ায় এর শাসক সম্প্রদায়কে মুসলমানদের আবেগ ও চেতনার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হয় এবং দিনে দিনে তারা ইসলামের দিকে ঝুঁকে পড়ে। ষষ্ঠদশ শতাব্দীতে ইউরোপের অস্ট্রিয়া, উত্তর আফ্রিকার চাঁদ ও আলজেরিয়া, এশিয়ার জর্জিয়া থেকে ইয়েমেন পর্যন্ত সমগ্র ভূখণ্ড ছিল আটোমান তুর্কীদের দখলে। মেসোপটেমিয়া, আরব এবং এশিয়া মাইনর ছিল তাদের সাম্রাজ্যভুক্ত। এতদঞ্চলের ওপর তারা শাসন চালাত স্বাধীনভাবে। পরবর্তীকালে যখন তুর্কী সাম্রাজ্যে ভাঙন ধরে তখন যে সমস্ত অঞ্চলে মুসলমানদের প্রাধান্য ছিল না, সে সমস্ত অঞ্চল তুর্কী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। আর মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হয় কতকগুলো স্বাধীন রাজ্য। অবশিষ্ট অঞ্চলগুলো চলে যায় রাশিয়ার অধিকারে।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর কথা। তাতাররা তখনো ইসলাম গ্রহণ করেনি। হালাকু খানের নেতৃত্বে তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে একটি বিশাল অভিযান চালায়। তারা হাজার হাজার মুসলমানকে নির্মমভাবে হত্যা করে। ১২৫৮ সালে আব্বাসীয় খেলাফতের রাজধানী বাগদাদ নগরী ধ্বংস করে। তাঁর কেটেরিট বাহিনীকে মিসরের মুসলিম সেনাপতি বায়বার্স প্যালেস্টাইন

সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেয়। হালাকু খান আর একটি অভিযান চালানোর চেষ্টা করে, এমন কি ক্রুসেডাদেরকে এক আক্রমণ চুক্তি করার আহবান জানান। কিন্তু তার সে উদ্যোগ ব্যর্থতায় পর্যবশিত হয়।

এরপর থেকেই বিজ্ঞান চর্চায় মুসলমানদের পতন শুরু হয়। তদস্থলে পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান সাধনার শুভ সূচনা ঘটে। প্রসংগক্রমে উল্লেখ্য যে, পরবর্তীতে এই তাতাররাই ধর্ম প্রচারকগণের হাতে হাত রেখে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। তখন তারা যে কেবলমাত্র ইসলামের আদর্শকে উঁচুতে তুলে ধরলেন তাই নয়, বরং তারা স্বদেশ ছেড়ে দেশান্তরে গিয়ে বসতি স্থাপন করলেন। সেখানে গড়ে তুললেন নতুন উপনিবেশ। ফিনল্যাণ্ড লিথুনিয়া, পোল্যান্ড, রাশিয়া প্রভৃতি অঞ্চলের মুসলিম সমাজে তাদের জীবন্ত চিহ্ন আজো আছে।

আন্দালুসীয় খেলাফত

আব্বাসীয় খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর পরই প্রাচ্যের মুসলমানদের সাথে স্পেন তার সম্পর্ক ছিন্ন করে। প্রায় এক হাজার বছর মুসলমানরা সেখানে শাসন কার্য পরিচালনা করে।

১৪৯২ সালে স্পেনের শাসন ক্ষমতা চলে যায় খৃস্টানদের হাতে এবং সে সাথে মুসলিম রাষ্ট্রের শেষ চিহ্নটুকু বিলীন হয়ে যায়। মুসলিম শাসনামলে স্পেন বস্তুগত সমৃদ্ধি ও উন্নতির শীর্ষে পৌছে। মুসলমানদের প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ছিল খুবই খ্যাতি সম্পন্ন। গোটা ইউরোপ থেকেই অমুসলিম শিক্ষার্থীরা এ সমস্ত বিদ্যালয়ে অধ্যয়নের জন্য ভীড় করত। স্থাপত্য শিল্পে তাঁরা চরম উৎকর্ষ লাভ করেন। তাঁদের এ উন্নতি ছিল খুবই বিস্ময়কর। তৎকালীন মুসলিম স্থাপত্যের নিদর্শন থেকে তার স্বাক্ষর মেলে। মুসলমানদের রাজনৈতিক পরাজয় বয়ে আনে কালো অমানিশা। খৃস্টান করার লক্ষে খৃস্টানগণ মুসলমানদের ওপর গণহত্যা চালায়। স্পেনের ওপর দিয়ে বইয়ে দেয় রক্তের বন্যা। দিনে দিনে গড়ে ওঠা লাইব্রেরীগুলো সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে ফেলে। সে আমলে কোনো ছাপাখানা ছিল না। হাতে লেখা পুস্তক ও গবেষণা পত্রসমূহ লাইব্রেরীতে জমা রাখা হত। স্পেনের লাইব্রেরীতে এ ধরনের হাজার হাজার পাণ্ডুলিপি ছিল। খৃস্টানরা এগুলো পুঁতে ফেলে। বস্তুতপক্ষে তাদের এ ধ্বংসকাণ্ডের কারণে শিক্ষার ক্ষেত্রে যে ক্ষতি সাধিত হয়, কোনোকালেও তা আর পূরণ হবার নয়।

পূর্ব এশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া

বর্তমানে চীনের যে অংশটি সিংকিয়াং নামে পরিচিত, এক সময়ে তা তুর্কীর অংশ ছিল। তখন এটা ছিলো তুর্কীস্তানের পূর্বাঞ্চল প্রদেশ। আব্বাসীয় শাসনামলে মুসলমানরা মধ্যএশিয়া থেকে এতদঞ্চলে আসে এবং এখানে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করে। একই সময়ে তারা চীনের দক্ষিণ প্রদেশ ইউন-নানে পৌঁছে। সম্ভবত তারা সেখানে পৌঁছে সমুদ্রপথে। অনায়াসেই তারা স্থানীয় অধিবাসীদেরকে ইসলামের পথে আহ্বান করতে সমর্থ হয়। মুসলমান ধর্ম প্রচারকগণের প্রচার কার্যক্রম এতদঞ্চলে খুবই প্রসার লাভ করে। ধর্ম প্রচারকগণের আচার ব্যবহার এবং শান্তিধর্মী কাজকর্মে মুগ্ধ হয়ে অসংখ্য মানুষ ইসলামের দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং ইসলাম গ্রহণ করে । ফলে এতদঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হয় বেশ কিছু মুসলিম রাষ্ট্র। তবু একথা সত্য যে, চীনাদের একটি বড় অংশ তাওহীদবাদী ইসলামের প্রভাব বলয়ের বাইরে থেকে গেল।

দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার ইতিহাস আবার অন্যরকম। বিগত শতাব্দীগুলোতে দক্ষিণ আরব এবং দক্ষিণ ভারত থেকে বিপুল সংখ্যক ব্যবসায়ী দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া সফর করেন। আল্লাহর হাজার শোকর যে, বাণিজ্যের পাশাপাশি তারা নিঃস্বার্থভাবে ইসলাম প্রচারে মনোযোগ দেন। ফলে শুধুমাত্র মালয় দ্বীপপুঞ্জেই নয় এতদঞ্চলের আরো অসংখ্য দ্বীপে ইসলাম পরিপূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এমনকি ইন্দোনেশিয়া এবং ফিলিপাইনের দক্ষিণাংশের দ্বীপসমূহে ইসলাম খুবই প্রাধান্য লাভ করে। দিনে দিনে এখানে অনেকগুলো ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে। এক সময়ে এতদঞ্চলে ইউরোপীয়দের আগমন ঘটে। ক্রমান্বয়ে গোটা অঞ্চলটি ইউরোপীয়দের বিশেষ করে ইংরেজ ও ওলন্দাজদের দখলে চলে যায়। একটানা কয়েক শতাব্দী ব্যাপী তাদের রাজত্ব অব্যাহত থাকে। অতপর ইন্দোনেশিয়া পুনরায় স্বাধীনতা লাভ করে। সেখানে তখন মুসলমানদের সংখ্যা ছিল প্রায় ৭ কোটি। অপরদিকে মালয় উপদ্বীপ দিনে দিনে পূর্ণ সার্বভৌমত্বের দিকে এগিয়ে যায়। পরবর্তীতে তারা শান্তিপূর্ণ উপায়ে স্বাধীনতা লাভ করে।

আফ্রিকা

সেই গোড়া থেকেই মিসর হতে মরক্কো পর্যন্ত উত্তর আফ্রিকার সমগ্র অঞ্চল ছিল ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্তবর্তী এলাকা। মহাদেশটির অবশিষ্ট অঞ্চলেও বিভিন্নভাবে ও প্রেক্ষাপটে ইসলামের প্রসার লাভ করে। পূর্ব আফ্রিকা আরবের অতি নিকটে অবস্থিত হওয়ার কারণে সর্বপ্রথম সেখানেই

ইসলামের প্রভাব পড়ে। এতদঞ্চলে ইসলাম যে শুধুমাত্র ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করলো তাই নয়, সেখানে কতকগুলো মুসলিম রাষ্ট্রের উদ্ভব হলো এবং এ রাষ্ট্রগুলো ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

পশ্চিম আফ্রিকায় ইসলামের আলো পৌঁছে অনেক পরে। কিছু সংখ্যক মুসলমান রাজা-বাদশাহ ইসলাম প্রচারের জন্য প্রশংসনীয় উদ্যোগ নেন এবং তাঁদের প্রচেষ্টায় ইসলাম প্রসার লাভ করে। দেশজ সংস্কৃতির মধ্যে থেকেই তাঁরা ইসলাম প্রচারের উদ্যোগ নেন। অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁরা বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠীকে ইসলামে দীক্ষিত করতে সমর্থ হলেন। বলে রাখা আবশ্যক যে, এতদঞ্চলে এমন কতকগুলো মুসলিম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা লাভ করে যেগুলো প্রকৃত অর্থেই শত শত বছর টিকে ছিল। আরব ঐতিহাসিকগণের মতে পশ্চিম আফ্রিকার জনগণ সমুদ্র সফরের ব্যাপারে ছিল খুবই দুঃসাহসী ও পারদর্শী। তারাই সর্বপ্রথম আমেরিকা ও ব্রাজিল যাওয়ার পথটি আবিষ্কার করেন। কলম্বাস এবং তাঁর পরবর্তীগণের নেতৃত্বে যে সমস্ত ইউরোপীয়ানরা আমেরিকা বা ব্রাজিল পৌঁছে তারা সেখানে নিগ্রো অধিবাসীদের সাক্ষাত পায়। যদিও ঐতিহাসিক দলিল-পত্র ধ্বংস হয়ে গেছে, তবু এ উক্তির পশ্চাতে যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত কারণ রয়েছে যে, আমেরিকায় কলোনী স্থাপনের ক্ষেত্রে আফ্রিকার কৃষ্ণকায় মুসলমান এবং বারবাররা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এমন কি ব্রাজিলের নামকরণের মধ্যে দিয়েও তার স্বাক্ষর মেলে। কারণ, একটি প্রসিদ্ধ বারবার গোত্রের নাম হল বরজালাহ এবং গোত্রের সকল সদস্যদের সামষ্টিক এবং সংক্ষিপ্ত নাম হলো ব্রাজিল। অনুসন্ধান করলে এ ধরনের আরো বাস্তব উদাহরণ পাওয়া যাবে। যেমন—আটলান্টিক মহাসাগরের একটি দ্বীপের নাম 'পামা'। এর সাবেক নাম ছিল "বেনে হিরো"। বস্তুতপক্ষে দ্বীপটির এমন নামকরণ করা হয়েছিল বনি হুয়ারা নামের একটি বারবার গোত্রের নামানুসারে।

মুসলমান প্রভাবিত পশ্চিম আফ্রিকার সাথে আমেরিকার সম্পর্ক দীর্ঘ দিনের। মুসলিম স্পেনের পতন এবং আমেরিকায় ইউরোপীয় নাবিকদের আগমনের পূর্ব পর্যন্ত এ যোগাযোগ অব্যাহত ছিল। অপরদিকে ইউরোপীয় শক্তির কাছে আফ্রিকার পতনের পর ফরাসী, ইংরেজ, জার্মান, ইতালী, স্পেন, পর্তুগীজ এবং বেলজিয়াম সহ অন্যান্য শক্তি সেখানে নিজ নিজ শাসন কায়েম করল। বস্তুতপক্ষে মহাদেশটির একটি বিরাট অংশ কখনো ইসলামের সান্নিধ্যে আসেনি। এখনো খৃস্টান শক্তি সেখানে তৎপর। তারা ইসলাম প্রচারের ব্যাপারে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখছে এবং নানাভাবে প্রতিবন্ধকতার

সৃষ্টি করছে। এতদসত্ত্বেও বর্তমানে সেখানে ইসলাম ক্রমশ প্রসার লাভ করছে।

সম্প্রতি উপনিবেশবাদের বিলুপ্তির সাথে সাথে বেশীর ভাগ মুসলিম প্রধান অঞ্চল স্বাধীনতা লাভ করছে। এর মধ্যে রয়েছে সুদান, গিনি, নাইজেরিয়া, সোমালিয়া ইত্যাদি। আবার কিছু কিছু অঞ্চলে মুসলমানদের ওপর এখনো অমুসলিম শাসক গোষ্ঠীর উৎপীড়ন চলছে। সেখানে তারা নির্বিঘ্নে চালিয়ে যাচ্ছে নিষ্ঠুর নির্যাতন। অবশ্য অন্যান্য অঞ্চলগুলো ক্রমশ অধিকতর স্বায়ত্বশাসনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

দুনিয়ায় আজ মুসলিম সংখ্যা কতো তা সুনির্দিষ্ট করে বলা দুরূহ। নানা তথ্য প্রমাণাদির মাধ্যমে এটা জানা যায় যে, পৃথিবীর গোটা জনগোষ্ঠীর এক চতুর্থাংশ থেকে এক পঞ্চমাংশ আদম ও হাওয়া (আ)-এর বংশধরেরা প্রতিদিন তাদের মুখ কা'বার দিকে ফিরায়। তাঁরা সোচ্চার কণ্ঠে ঘোষণা করে আল্লাহু আকবার-আল্লাহু আকবার।

❐

পঞ্চদশ অধ্যায়

একজন মুসলমানের দৈনন্দিন জীবন

জন্ম

কোনো ধর্ম যদি বিশেষ কোনো গোত্র বা বর্ণের জন্য নির্দিষ্ট করা না হয় অথবা সীমাবদ্ধ না থাকে কোনো ভৌগলিক সীমারেখার মধ্যে, বরং ধর্মের লক্ষ্য যদি হয় বিশ্বজগতের সমগ্র জনগোষ্ঠী তা হলে দুভাগে সে ধর্ম গ্রহণ করা যেতে পারে। প্রথমত স্বেচ্ছায় ধর্ম গ্রহণ করার মাধ্যমে, দ্বিতীয়ত জন্মগত সূত্রে। এ স্থলে ইচ্ছা অনিচ্ছার প্রশ্নটি গৌণ।

স্বেচ্ছায় ধর্ম গ্রহণের ক্ষেত্রে ব্যক্তি সচেতনভাবে একটি ধর্মকে পরিহার করে আরেকটি ধর্ম গ্রহণ করে। কোনো ধর্ম গ্রহণ বা বর্জন করার বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে তার পসন্দ অপসন্দের ওপর নির্ভর করে। এ প্রসঙ্গে নবী করীম (স) বলেছেন যে, তাকে মুখে ঘোষণা দিতে হবে এবং অন্তরে বিশ্বাস করতে হবে। স্বেচ্ছায় ধর্ম গ্রহণের ক্ষেত্রে ব্যক্তিকে প্রথমে গোসল করাতে হয়। শরীর পাক-সাফ করার জন্য এটা প্রয়োজন। ধরে নেয়া হয় যে, গোসল করার মধ্যে দিয়ে অবিশ্বাস এবং অজ্ঞতার কালিমা দূরীভূত হয়। অতপর সে দু'জন সাক্ষীর উপস্থিতিতে ঘোষণা দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই এবং মুহাম্মাদ (স) তাঁর রাসূল বা প্রেরিত পুরুষ।

হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে যে, কোনো লোক ইসলাম গ্রহণ করলে প্রিয়নবী (স) তাঁর পূর্বনাম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেন। যদি দেখা যেত যে, তার নামের সাথে অনৈসলামিক কোনো ধ্যানধারণা জড়িয়ে আছে, তার নাম যদি কা'বার পূজারী, ভ্রান্ত পথের অনুসারী অথবা এ জাতীয় কোনো অর্থ বহন করে, তাহলে সে নামগুলো পাল্টিয়ে সুবিধাজনক একটি নতুন নাম ঠিক করে দিতেন। বর্তমান সময়ে নওমুসলিমগণ সাধারণত পূর্ব নামের সাথে একটি আরবী নাম যোগ করে থাকেন।

নবী করীম (স)-এর মাতৃভাষা আরবী। তাঁর স্ত্রীগণ উম্মুল মু'মিনীন বা মুসলমানদের মাতা হিসেবে পরিচিত। তাঁরাও আরবী ভাষায় কথা বলতেন। সে হিসেবে প্রতিটি মুসলমানের একটি মাতৃভাষা আরবী। অন্যভাবে বলা যেতে পারে যে, আরবী মুসলমানদের আধ্যাত্মিক জগতের মাতৃভাষা। সে কারণেই আরবী ভাষা শেখা, বিশেষ করে মূল আরবীতে কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করতে পারাটা প্রত্যেক মুসলমানের একটি পবিত্র দায়িত্ব।

মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করার মাধ্যমে একটি শিশু ইসলাম ধর্মাবলম্বী হয়ে থাকে। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরপরই তার ডান কানে আযান এবং বাম কানে ইকামাত দেয়া হয়। অর্থাৎ জন্মগ্রহণ করার পর প্রথমেই সে শুনতে পায় আল্লাহর একত্ববাদের ব্যাপারে সাক্ষ দান এবং আল্লাহর ইবাদাত-বন্দেগী ও নিজের কল্যাণের জন্য আযানের ধ্বনী। আযানের সময় তাকে শোনান হয় যে, আল্লাহ মহান ; আমি শপথ গ্রহণ পূর্বক সাক্ষ দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। আমি আরো সাক্ষ দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (স) আল্লাহর রাসূল। সালাতের জন্য এসো, কল্যাণের জন্য এসো, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। ইকামতের সময় তাকে আযানের সব কথাই শোনানো হয়। তাকে আরো শোনানো হয় যে, ওহে সালাতের সময় সমুপস্থিত।

বাল্য জীবন

শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর প্রথম চুল কেটে সমস্ত চুলের সম পরিমাণ ওজন রুপা বা টাকা গরীব দুঃখীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। যাদের সংগতি আছে তারা ছাগল বা ভেড়া যবেহ করে এবং সে গোশত দিয়ে আত্মীয়-স্বজন ও গরীব-দুঃখীদের আপ্যায়ণ করে থাকে। ইসলামী পরিভাষায় এটাকে বলে 'আকীকা'।

এরপরই আসে পুত্র সন্তানকে খাতনা (মুসলমানী) করানোর প্রসংগ। খাতনা করানোর নির্দিষ্ট কোনো সময় সীমা নির্ধারণ করা নেই। সাধারণত বাল্য বয়সেই খাতনা করানো হয়। অবশ্য কোনো বয়স্ক লোক ইসলাম গ্রহণ করলে তাকে খাতনা করানোর ব্যাপারে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই।

সাধারণত চার বছর পর শিশু লেখাপড়া শুরু করে। এ সময়ে বিশেষ দোয়া-দরূদ ও ভালো খাবারের আয়োজন করা হয়। শিশুকে সে অনুষ্ঠানেই প্রথম পাঠ দেয়া হয়। শুভ সূচনা হিসেবে কুরআনুল করীমের সূরা আল আলাকের প্রথম ৫টি আয়াত তিলাওয়াত করা হয়। শিশু উস্তাদের সাথে সাথে আয়াতগুলো তিলাওয়াত করে। বলে রাখা আবশ্যক যে, হেরা গুহায় নবী করীম (স) সর্বপ্রথম যখন ওহী লাভ করেন, তখন এ আয়াতগুলো নাযিল হয়েছিল।

লেখাপড়ার পাশাপাশি তাকে নামায পড়ার নিয়ম কানুনগুলো শিখতে হয়। তাকে মুখস্থ করতে হয় প্রয়োজনীয় দোয়া-দরূদ ও কুরআনের সূরাসমূহ। সাত বছর বয়সে সে সালাত আদায় করতে শুরু করে।

প্রয়োজনবোধে পিতা-মাতা এ জন্য তাকে শাস্তি দেন। বাল্য বয়স থেকে সালাতে অভ্যস্থ করে তোলার জন্য এটা জরুরী।

একজন শিশু বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার সাথে সাথে তার ওপর সালাত বা নামায পড়ার ন্যায় রোযা রাখা বা সিয়াম আদায় করাটাও ফরয হয়ে পড়ে। অবশ্য মুসলিম পরিবারের শিশুরা বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার পূর্বেই সিয়াম পালনে অভ্যস্থ হয়ে ওঠে। জীবনে প্রথম যেদিন সিয়াম করে সেদিন সে খুবই আনন্দিত ও উৎফুল্ল হয়ে থাকে। এমন কি এটা যেন তার পরিবারে একটা উৎসবে রূপ নেয়। সাধারণত বার বছর বয়সে ছেলেমেয়েরা সিয়াম পালন করতে শুরু করে এবং বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে সে ক্রমান্বয়ে এক মাসব্যাপী সিয়াম পালনের সাথে অভ্যস্থ হয়ে ওঠে।

হজ্জ

সঙ্গতি সম্পন্ন লোকের জন্য জীবনে একবার 'হজ্জ' করা ফরয। জিলহজ্জের দ্বিতীয় সপ্তাহে হজ্জ করা হয়। এ সময়ে হাজীগণ মক্কায় সমবেত হন এবং প্রায় সপ্তাহ ব্যাপী তাঁরা মিনা, আরাফাত, মুযদালিফা এবং আবার মিনায় অবস্থান করেন। এ তিনটি স্থান মক্কার উপকণ্ঠে অবস্থিত। জিলহজ্জ মাস ছাড়াও বছরের যে কোনো সময় কা'বা ঘরে যাওয়া যায়। ইসলামী পরিভাষায় এটাকে বলে 'উমরাহ'।

যিনি হজ্জ করবেন তাকে অবশ্যই নিত্যদিনের পোশাক পরিত্যাগ করতে হবে। এ সময়ে তাকে বিশেষ এক ধরনের পোশাক পরতে হয়, এটাকে বলে ইহরাম। ইহরামে দুই প্রস্থ কাপড় থাকে। কাপড়ে কোনো রকম সেলাই চলে না। এক প্রস্থ কাপড় সে পরিধান করে, অন্য প্রস্থ দিয়ে কাঁধ ও শরীর ঢাকে। কিন্তু সর্বক্ষণের জন্য মাথা উন্মুক্ত রাখে। মহিলারা স্বাভাবিক পোশাক পরে। তবে তা হতে হয় শালীন ও মার্জিত। তাদের হাত এবং পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত সমস্ত শরীর আবৃত রাখতে হয়।

মক্কার আরেক নাম হেরেম শরীফ। হেরেম শরীফে প্রবেশের পূর্বেই ইহরাম পরতে হয়। হেরেম শরীফে প্রবেশের পূর্বে যেখানে থেকে ইহরামের পোশাক পরিধান করতে হয় সে স্থানকে মীকাত বলে। আর মক্কাবাসীদের ইহরাম পরতে হয় হেরেম শরীফ বা মক্কার অভ্যন্তরে থেকে। হেরেম শরীফ থেকে সে চলে যায় মিনায়। ৯ জিলহজ্জ আরাফাতের ময়দানে। ৯ জিলহজ্জ সেখানে অবস্থান করে। সারাটা দিন কাটিয়ে দেয়, ইবাদাত বন্দেগী ও দোয়া-দরূদ পাঠের মধ্য দিয়ে। রাত্রিযাপন করে

মুযদালিফায় এসে উন্মুক্ত প্রান্তরে। ১০, ১১, ১২ তারিখ এ তিন দিন অতিবাহিত করে মিনায়। মিনায় অবস্থানকালে প্রতিদিন সে শয়তানের প্রতীককে লক্ষ করে পাথর ছোড়ে। সুযোগ বুঝে এক সময়ে ১০ কিংবা ১১ তারিখ তাকে মক্কায় যেতে হয়। তখন সে তাওয়াফে সাঈ করে। নির্ধারিত নিয়মে পবিত্র কা'বা ঘর ৭ বার প্রদক্ষিণ করাকে তাওয়াফ বলে। আর সাফা ও মারওয়ার মধ্যে ৭ বার আসা যাওয়াটা হলো সাঈ। অবশ্য একটি পাহাড়ের অবস্থান কা'বা ঘরের অতি নিকটে। কা'বাঘর তাওয়াফ এবং সাঈ করার নির্দিষ্ট কতকগুলো পদ্ধতি ও দোআ রয়েছে। বস্তুতপক্ষে ইহরাম পরিধান করার পর থেকেই ইহরাম ছাড়া পর্যন্ত একজনকে সারাক্ষণ আল্লাহর যিকর করতে হয়। এ সময়ের এ যিকরকে বলে তালবিয়া। তালবিয়ার দোয়া এ রকম ঃ লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইক লা-শারীকা লাকা লাব্বাইক, ইন্নাল হামদা, ওয়ান নি'মাতা লাকা ওয়াল মুলক লা শারীকা লাক্।

উমরা করার জন্য আরাফাত, মিনা বা মুযদালিফায় যেতে হয় না। কিন্তু যথারীতি তাওয়াফ ও সাঈ করতে হয় এবং ইহরামের কাপড় পরিধান করতে হয়। এমন কি মক্কায় বসবাসকারী মুসলমানগণকে উমরা করার জন্য মক্কার বাইরে গিয়ে ইহরাম পরে হেরেম শরীফে প্রবেশ করতে হয়। তাওয়াফ ও সাঈ করার পর মাথা মুণ্ডন করে তারা স্বাভাবিক জীবন যাত্রায় ফিরে আসে।

যাকাত

যাকাত এক ধরনের সাদাকা। সকল প্রকার সঞ্চয়, মওজুদ সম্পদ, উৎপন্ন ফসলের ওপর যাকাত প্রদান করতে হয়। এর মধ্যে রয়েছে, কৃষিপণ্য, বাণিজ্য সামগ্রী, খনিজ সম্পদ, সরকারী চারণ ভূমিতে পালিত মেষ, ছাগল, গরু, উট এবং সঞ্চিত সম্পদ। আজকালকার দিনে মুসলমানগণ সঞ্চিত সম্পদের ওপর প্রদত্ত যাকাত ব্যক্তিগতভাবে প্রদান করে থাকেন। মুসলিম বা অমুসলিম সব রাষ্ট্রেই এ নিয়ম চালু রয়েছে। কিন্তু অন্যান্য কর বা খাজনার পরিমাণ স্থানীয় সরকার নির্ধারণ করেন এবং তা আদায়ও করা হয় সরকারী তত্ত্বাবধানে।

যাকাতের হিসাব এ রকম যে, কারো কাছে যদি সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ বা সমমূল্যের অর্থ এক বছরের বেশী সময় জমা থাকে তাহলে তাকে উক্ত সঞ্চয়ের ওপর ২.৫ হারে যাকাত প্রদান করতে হয়। যাকাতের অর্থ

সরাসরি বিরতণ করা যেতে পারে। অথবা কোনো প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেও তা ব্যয় করা বৈধ। যাকাতের অর্থ ব্যয় করার ৮টি খাত আল্লাহ্ তাআলা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। ব্যক্তি তার ইচ্ছানুযায়ী যাকাতের জন্য নির্ধারিত খাতের অর্থ এক বা একাধিক কাজে ব্যয় করতে পারে।

বছরের দুটি প্রধান উৎসব দুই ঈদে আরেক ধরনের সাদকা প্রদান করতে হয়। রমযান শেষে ঈদুল ফিতরের সময় দিতে হয় ফিত্‌রা। এর পরিমাণ হলো পূর্ণবয়স্ক একজন লোকের সারা দিনের খোরাকের সমান। এ অর্থ একজন নিঃস্ব দরিদ্র লোকের প্রাপ্য। আবার পবিত্র নগরী মক্কায় যখন হজ্জ পালন করা হয় তখন আসে ঈদুল আযহা। এ সময়ে সঙ্গতি সম্পন্ন লোকেরা গরু, ছাগল অথবা মেষ কুরবানী করে থাকেন। কুরবানীর গোশতের একটি অংশ নিজেদের জন্য রেখে বাকী অংশ দুস্থ ও গরীবদের মধ্যে বিতরণ করেন।

অর্থনীতি প্রসঙ্গে একথা স্মরণ রাখতে হবে যে, একজন মুসলমানের পক্ষে কোনো রকম সুদী কারবারে অংশ গ্রহণের অনুমতি নেই। সে জুয়া, লটারী অথবা ফটকাবাজী জাতীয় কোনো কাজে হাত দিতে পারে না।

স্মরণ রাখতে হবে যে, স্বেচ্ছায় কেউ কখনো সুদ দেয় না। ব্যক্তিগত-ভাবে কাউকে ঋণ দিয়ে তার ওপর সুদ আদায়ের প্রবণতাকে সম্পূর্ণরূপে পরিহার করতে হবে। ব্যাংকে জমা রাখা টাকার ওপর যে সুদ আসে সে বিষয়ে চিন্তার যথেষ্ট অবকাশ আছে। এ ক্ষেত্রে ব্যাংকের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ব্যাংকটি যদি সুদী কারবারের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়, তাহলে এর লভ্যাংশও অবৈধ। কিন্তু এমন অনেক দেশ আছে যেখানে সুদী ব্যাংক ছাড়া অন্য কোনো ব্যাংক নেই। তখন তাকে বাধ্য হয়েই সুদী ব্যাংকে টাকা জমা রাখতে হয়। সেক্ষেত্রে কেউ যদি ব্যাংকে তার সঞ্চয়ের উপর যে সুদ আসে তা গ্রহণ না করে, তাহলে ব্যাংক ইচ্ছা করলে অদাবীকৃত সুদের অর্থ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে দান করতে পারে। কখনো কখনো অনুদান প্রাপ্ত এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলো ইসলাম বিরোধী কাজে লিপ্ত থাকে। সে কারণেই ব্যাংকে জমা টাকার ওপর যে সুদ আসে তা ছেড়ে না দিয়ে বরং তা গ্রহণ করা উচিত। অবশ্য এ অর্থ নিজের বা পরিবারের জন্য ব্যয় না করে কোনো জনহিতকর কাজে ব্যয় করতে হবে। প্রখ্যাত মুফতী আল্লামা সারাখশী বলেছেন যে, অবৈধভাবে উপার্জিত সম্পদ থেকে অবশ্যই মুক্তি পেতে হবে এবং এ সম্পদকে কোনো জনহিতকর কাজে ব্যয় করতে হবে।"

কারো কারো মতে সরকারী প্রতিষ্ঠান এবং পারস্পরিক সমঝোতা ও দায় দেনার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সোসাইটির সাথে বীমা করা বিধিসম্মত। কিন্তু পুঁজিবাদী মুনাফালোভী কোনো কোম্পানীর সাথে বীমা করাটা অবৈধ।

বিবাহ

এটা খুবই স্বাভাবিক যে, একজন মুসলমান পুরুষ একজন মুসলমান মহিলাকে বিয়ে করবে। অবস্থার প্রেক্ষিতে খৃস্টান বা ইয়াহুদী ধর্মাবলম্বী নারীকে বিয়ে করাটা বৈধ বলে বিবেচিত। কিন্তু সে কোনো পুতুল পূজারী, নাস্তিক বা বহু ঈশ্বরবাদী মহিলাকে বিয়ে করতে পারে না। আবার একজন মুসলিম মহিলা কোনো অমুসলিমকে বিয়ে করতে বা অমুসলিমকে নিয়ে দাম্পত্য জীবন যাপন করতে পারে না। সে অমুসলিম পুরুষ, ইহুদী, খৃস্টান, নাস্তিক যাই হোক না কেন তাতে কিছু যায় আসে না।

আবার কারো কারো মতে ইয়াহুদী বা খৃস্টান থেকে যায় তাতে দাম্পত্য জীবন অবৈধ হয় না। কিন্তু একটি অমুসলিম পরিবারের স্বামী ইসলাম গ্রহণ করার পর স্ত্রী যদি নাস্তিক, পুতুল পূজারী বা বহু ঈশ্বরবাদী থেকে যায় তাহলে সে বিয়ে তৎক্ষণাৎ ভেঙে যায়। অবশ্য দাম্পত্য জীবন ভেঙে দেয়ার পূর্বে বিষয়টি ভেবে দেখার জন্য স্ত্রীকে পর্যাপ্ত পরিমাণ সময় দিতে হয়।

অনুরূপভাবে কোনো অমুসলিম পরিবারের স্ত্রী যদি ইসলাম গ্রহণ করে, তাহলে স্বামীকে বিষয়টি ভেবে দেখার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ সময় দেয়া হবে। এরপরও স্বামী মুসলমান না হলে দাম্পত্য জীবনের অবসান ঘটবে এবং মুসলমান স্ত্রীকে বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য আইনের আশ্রয় নিতে হবে।

মৃত্যু

মৃত্যু পথযাত্রী একজন মুসলমান শেষ মুহূর্তেও পাঠ করতে চায়— "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।" অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ (স) তাঁর রাসূল। মৃত্যু পথযাত্রীর পাশে যারা থাকে তারাও রোগীকে বার বার একথাগুলো উচ্চারণ করতে সাহায্য করে। ইসলামী পরিভাষায় এটাকে বলে তাল্‌কীন। মৃত ব্যক্তির শরীর শক্ত হয়ে যাওয়ার পূর্বে তার হাত দুটি সালাতের ভঙ্গিমায় হয় বুকের ওপর অথবা শরীরের দুপাশে সোজাভাবে রাখতে হয়। সম্ভব হলে মৃত দেহ কবরস্থ করার পূর্বে ওযু গোসল দিয়ে পবিত্র করা হয়। নিত্যদিনের পোশাকগুলো খুলে তিনখানা সাধারণ কাপড় দিয়ে দেহ আবৃত করা হয়।

মৃতদেহ গোসল করানোর তিনটি পর্যায়ে—মৃতদেহের সমস্ত শরীরে সাবানের পানি ঢালা হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে গায়ে লেগে থাকা সাবানের পানি ভালোভাবে পরিষ্কার করা হয়। তৃতীয় পর্যায়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ কর্পূর মিশ্রিত পানি দিয়ে সারা শরীর ধুয়ে ফেলতে হয়। ক্ষেত্র বিশেষ নেহায়েত অসুবিধার কারণে পানি দিয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা সম্ভব না হলে তায়াম্মুমের সাহায্যে মৃতদেহ পবিত্র করতে হয়।

সাধারণ কাপড় দিয়ে মৃতদেহ আবৃত করার পর জানাযার নামাযের ব্যবস্থা করা হয়। এটা ফরযে কিফায়া। মৃতদেহের অনুপস্থিতিতেও জানাযার যে নামায পড়া হয় তাকে বলে গায়েবানা জানাযা।

যতদূর সম্ভব মক্কার সমান্তরালে উত্তর দক্ষিণে কবর খোদাই করা হয়। কবরের মধ্যে মৃত ব্যক্তির মাথা উত্তরের দিকে রেখে মুখ ডান দিকে সামান্য কাত করে দেয়া হয়। মৃতদেহকে কিবলামুখী করে রাখাই এর উদ্দেশ্য। মৃতদেহ কবরে রাখার সময় বার বার এ দোয়াটি পড়তে হয়– "বিসমিল্লাহ্ ওয়া আলা মিল্লাতি রাসূলিল্লাহ।" মুসলমানগণ বিশ্বাস করেন যে, মৃতদেহ কবরস্থ করার পর দুজন ফেরেশতা কবরের মধ্যে আসেন এবং মৃত ব্যক্তিকে তার বিশ্বাস সম্পর্কে কতকগুলো প্রশ্ন করেন। এ বিশ্বাসের সূত্র ধরেই কবরের পাশে দাঁড়িয়ে দোয়া পাঠ করা হয়। কুরআন মজীদের এ আয়াতও বারবার তিলাওয়াত করা হয় ঃ

يَٰٓأَيَّتُهَا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَئِنَّةُ ۝ ٱرْجِعِىٓ إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ۝ فَٱدْخُلِى فِى عِبَٰدِى ۝ وَٱدْخُلِى جَنَّتِى ۝

"হে প্রশান্ত চিত্ত, তুমি তোমার রব-এর নিকট ফিরে এসো সন্তুষ্ট ও সন্তোষ ভাজন হয়ে। আর আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হও এবং আমার জান্নাতে দাখিল হও।"–সূরা আল ফাজর ২৭-৩০

কবরস্থানকে জাঁকজমকপূর্ণ করে তোলার জন্য যে কোনো রকম বাহুল্য ব্যয় বাঞ্ছনীয় নয়। বরং কবরস্থানকে যথাসম্ভব স্বাভাবিক অবস্থায় রাখা উচিত। বস্তুতপক্ষে মৃত ব্যক্তিকে উপলক্ষ্য করে অভাবী ও গরীবদের মধ্যে বেশী দান খয়রাত করা ভলো। আল্লাহর দরবারে এ মুনাজাত করতে হবে যে, তিনি যেন দান-খয়রাতের সওয়াব মৃত ব্যক্তির রূহের ওপর পৌঁছে দেন। একে সওয়াব রিসানী বলে।

সাধারণ আচরণ

নিয়মিত সালাত আদায় এবং রমযান মাসে রোযা রাখা ছাড়াও বিশেষ বিশেষ আচার-আচরণের ব্যাপারে মুসলমানদেরকে উৎসাহিত করা হয়েছে। তন্মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো নিয়মিত কুরআন মজীদ তেলাওয়াত করা, কুরআনের অর্থ বুঝা এবং এর বিষয়বস্তু সম্পর্কে গভীর মনোযোগ সহকারে চিন্তা করা। বস্তুতপক্ষে কুরআনের বিধি-বিধানগুলো নিজেদের জীবনে রূপায়িত করাই এর উদ্দেশ্য।

প্রতিটি কাজ করার সময় 'বিসমিল্লাহ' বলে শুরু করতে হবে। আবার কাজ শেষ করেই বলতে হবে, 'আলহামদুলিল্লাহ'। ভবিষ্যতে কোনো কাজ করার ইচ্ছা পোষণ করলে অথবা ওয়াদা করলে সাথে সাথে 'ইনশাআল্লাহ' বলতে হবে।

একজন মুসলমানের সাথে আরেকজন মুসলমানের দেখা হলে 'আসসালামু আলাইকুম' বলে অভিবাদন করতে হবে। এর জবাবে অন্যজন বলবে, 'ওয়া আলাইকুমুস সালাম'। দুনিয়াতে অভিবাদন জানানোর যত রীতি ও পদ্ধতি আছে তন্মধ্যে এ বাক্য দুটি খুবই অর্থবহ ও তাৎপর্যপূর্ণ। গুড মরনিং, গুড ইভিনিং (শুভ প্রভাত, শুভ সন্ধ্যা) ইত্যাদি আইয়ামে জাহেলিয়াতেরই অবশিষ্টাংশ।

নিদ্রায় যাওয়ার অথবা নিদ্রা থেকে জাগরণের সময় প্রত্যেক মুসলমানকে মহান আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া জানানোর অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। সুবহানাল্লাহ ইত্যাদি পাঠ করা ভালো। সেই সাথে নবী করীম (স)-এর উপর দরূদ শরীফ পড়তে হবে। এর জন্য সবচেয়ে সহজ পথটি হলো 'আল্লাহুম্মা সাল্লিআলা মুহাম্মাদ ওয়াবারিক ওয়া সাল্লাম' বলা।

নবী করীম (স) ডানদিককে বেশী পসন্দ করতেন। যেমন জুতা-সেণ্ডেল পায়ে দেয়ার সময় প্রথমে ডান পা এবং পরে বাম পায়ের জুতো পরতেন। আবার খোলার সময়ে এর ঠিক উল্টোটি করতেন। অর্থাৎ প্রথমে বাম পা এবং পরে ডান পায়ের জুতো খুলতেন। পিরহান (জামা) গায়ে দেয়ার সময় প্রথমে ডান হাত এবং পরে বাম হাতের আস্তিন গায়ে দিতেন। মাথা আঁচড়ানোর সময় ডান দিকের চুল আঁচড়ানোর পর বাম দিকের চুল আঁচড়াতেন। মসজিদ অথবা ঘরে প্রবেশের সময় প্রথমে ডান পা ফেলতেন। কিন্তু গোসল খানা বা পায়খানায় ঢোকার সময় প্রথমে বাম পা দিতেন, আবার বেরিয়ে আসার সময় প্রথমে ডান পা বাইরে ফেলতেন।

সংগী সাথীদের মধ্যে কোনো কিছু বিতরণের সময় ডান দিক দিয়ে শুরু করতেন এবং বাম দিক দিয়ে শেষ করতেন।

পানাহার

শূকরের মাংস বা চর্বি কোনোভাবেই গ্রহণ করা যাবে না। মদের ব্যাপারে এ একই কথা। ইসলাম উভয়টাকেই হারাম করে দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে একটি ভ্রান্তির অপনোদন হওয়া আবশ্যক। কুরআন মজীদে 'খামর' একটি শব্দ আছে। সাধারণত আঙুর থেকে তৈরী মদকে খামর বলে। কিন্তু নবী করীম (স)-এর যামানায় যে কোনো প্রকার মদকেই খামর বলে চিহ্নিত করা হত। সেখানে মদ কি দিয়ে তৈরী করা হত তা ছিল গৌণ। তাই দেখা যায় যে, খামর সংক্রান্ত আয়াতটি যখন প্রথম নাযিল হয় তখন মদীনার মুসলমানগণ শুধু মদই ফেলে দেয়নি, বরং দেহের উপর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে এ জাতীয় সমস্ত পানিকে তারা নষ্ট করে ফেলে। সে আমলে মদীনায় খেজুর থেকেও এক ধরনের পানীয় তৈরি করা হত। কিন্তু এ পানীয়টি উত্তেজনা সৃষ্টিকারী ছিল বিধায় তাও ফেলে দেয়া হয়।

যে পশু বা পাখী ইসলামী কায়দায় যবেহ করা হয়নি, মুসলমানরা তার গোশত আহার করতে পারে না। এমনকি কোনো অমুসলিম যদি গরু বা ছাগল যবেহ করে তাহলে সে গরু বা ছাগলের গোশত খাওয়া মুসলমানদের জন্য হারাম। আবার একজন মুসলিম যদি রীতিসিদ্ধ ভাবে যবেহ না করে একটি মুরগী ছানাকে গলাটিপে মেরে ফেলে তাও হারাম হয়ে যায়।

পাখী বা পশু যবেহ করার ইসলামী কায়দা এই যে, বিসমিল্লাহ বলে যবেহ করতে হবে। যবেহ করার সময় শ্বাসনালী, খাদ্যনালী ও গলার দুটি রগ কেটে দিতে হবে। কিন্তু পশু পাখির মেরুদণ্ড বা গলার হাড় দ্বিখণ্ডিত করা ঠিক নয়। তাছাড়া প্রাণীটি মরে যাবার পূর্বে দেহ থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন করা বা চামড়া ছাড়ানো নিষেধ।

খাওয়া দাওয়ার জন্য স্বর্ণ বা রৌপ্যের তৈরী থালা বা তৈজস পত্র ব্যবহার করা হারাম। নবী করীম (স) বলেছেন, পুরুষের জন্য স্বর্ণ বা সিল্কের কাপড় ব্যবহার করা হারাম । নারীর জন্য এটা জায়েয। অবশ্য স্থান বিশেষে এর কিছু ব্যতিক্রম রয়েছে। যেমন সামরিক পোশাক হিসেবে সিল্কের ব্যবহারের অনুমোদন রয়েছে। দাঁত বাঁধানোর জন্য স্বর্ণের ব্যবহার করা জায়েয। জানা যায় খলীফা উসমান (রা)-এর দাঁত স্বর্ণ দ্বারা বাঁধান

ছিল। আরফাজা ইবনে আসাদ নামক জনৈক ব্যক্তি বর্ণিত এক তথ্য থেকে জানা যায় যে, একবার এক যুদ্ধে তাঁর নাক কাটা যায় এবং তিনি রূপার তৈরী একটি নকল নাক ব্যবহার করতে শুরু করেন। পরবর্তীতে প্রিয় নবী (স)-এর অনুমতিক্রমে তিনি রূপার তৈরী নাকের পরিবর্তে স্বর্ণের তৈরী নাক ব্যবহার করতে শুরু করেন।

পোশাক ও কেশ বিন্যাস রীতি

মুসলমান পুরুষের স্বাভাবিক রেশম (সিলক) দিয়ে তৈরী পোশাক পরিচ্ছদ ব্যবহার করা হারাম। অনুরূপ নিষেধাজ্ঞা রয়েছে পোশাকে লাল রঙের ব্যবহারের ক্ষেত্রে। নবী করীম (স) দাড়ি রাখতেন। তিনি দাড়ি রাখার জোর তাকিদ দিয়েছেন।

মুসলমানদের পোশাক এমন হতে হবে যাতে সমস্ত শরীর ঢেকে থাকে। পোশাকটি হতে হবে শালীন ও রুচিসম্মত। তারা এমন পোশাক পরিধান করবে না যাতে গলা ও কাঁধ বেরিয়ে থাকে, আবার পোশাকটি এমন পাতলা ও স্বচ্ছ হওয়া উচিত নয়, যাতে শরীরের আব্রু থাকে না অথবা নগ্নতা প্রকাশ পায়। তাছাড়া যে সমস্ত পোশাকের কারণে অন্যরা মেয়েদের প্রতি আকৃষ্ট হয়, তেমন পোশাককে সর্বতোভাবে পরিহার করতে হবে।

অযু ও সালাত

নবী করীম (স) বলেছেন যে, "পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অর্ধেক।" সে কারণে সালাত আদায় করার শুরুতেই একজনকে দৈহিক পরিচ্ছন্নতা অর্জন করতে হবে। তবে সালাত আদায়ের পূর্বে সাধারণভাবে অযু করতে হয়। অযু করার আগে প্রয়োজনে গোসল করতে হবে। আর শুক্রবার জুমআর সালাতের পূর্বে গোসল করার জন্য বিশেষ তাকিদ রয়েছে।

ইসলামে গোসল করারও একটা নিয়ম আছে। প্রথমে তাকে অযু করতে হবে। তারপর সারা শরীরে পানি দিয়ে ভালোভাবে ধৌত করতে হবে। আর কুয়া বা বালতির পানি দিয়ে গোসল করলে মাথা থেকে পা পর্যন্ত কমপক্ষে তিনবার পানি ঢালতে হবে।

অযু করার নিয়মটা এ রকম ঃ প্রথমে পবিত্রতা অর্জনের জন্য একটা মানসিক প্রস্তুতিগ্রহণ করতে হবে। অর্থাৎ নিয়ত করতে হবে ও বিসমিল্লাহ বলতে হবে। এরপর পর্যায়ক্রমে নিম্নোক্ত কাজগুলো করতে হবে। দুহাতের কব্জি পর্যন্ত ধোয়া, পানি দিয়ে কুলি করা, নাক পরিষ্কার করা, কপাল থেকে থুতনি এবং এক কান থেকে অপর কান পর্যন্ত মুখাবয়ব ধোয়া, প্রথমে ডান

হাত এবং পরে বাম হাতের কনুই পর্যন্ত ধোয়া, মাথা মাসেহ করা, সর্বশেষ ডান ও বাম পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত ধোয়া। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি কাজ তিনবার করতে হবে। অবশ্য পানির সংকট থাকলে তিনবারের স্থলে একবার ধৌত করলেও চলে।

আর যদি এরকম হয় যে, কোথাও অযু করার মত পানি পাওয়া যাচ্ছে না, তখন তায়াম্মুমের বিধান রয়েছে। তাছাড়া যে রোগী চিকিৎসাগত কারণে পানি ব্যবহার করতে পারে না, তার জন্যও তায়াম্মুমের অনুমোদন রয়েছে। তায়াম্মুমের বেলায় প্রথমে পবিত্রতা অর্জনের জন্য নিয়ত করতে হবে এবং বিসমিল্লাহ্ বলে শুরু করতে হবে। তারপর সে পরিষ্কার মাটির ওপর হাত রাখবে, এবং দু'হাতের তালু দিয়ে মুখাবয়ব মুছে ফেলবে। সে আবার মাটিতে হাত রাখবে এবং বাম হাতের তালু দিয়ে ডান হাতের কনুই পর্যন্ত মুছে ফেলবে। সে আবার মাটিতে হাত রাখবে এবং বাম হাতের তালু দিয়ে ডান হাতের কনুই পর্যন্ত মুছে ফেলবে। অনুরূপভাবে ডান হাতের তালু দিয়ে বাম হাত মুছে ফেলবে। বস্তুতপক্ষে এটা হলো সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রতি মানুষের বিনয়-নম্র ভাব প্রকাশের একটা নমুনামাত্র।

বিভিন্ন কারণে অযু নষ্ট হতে পারে। যেমন—মুখ ভর্তি বমি করা, ঘুম আসা, পায়খানা-পেশাব করা প্রভৃতি। তখন সালাত আদায় করতে হলে তাকে পুনরায় অযু করতে হবে। অযু ভংগের আরো কারণ আছে, যেগুলো জেনে নিতে হবে।

সালাত আদায় করার শর্ত এই যে, তার কাপড় পাক হতে হবে, জায়গা পাক হতে হবে, তাকে কিবলামুখী হয়ে দাঁড়াতে হবে। আর কিবলা নির্বাচন করাটাও কঠিন কোনো ব্যাপার নয়। বিশ্বের একটি সাধারণ মানচিত্র দেখেও এটা নির্ধারণ করা যায়। কম্পাসের সাহায্যে দিক নির্ণয় করা আরো সহজ। বলে রাখা আবশ্যক যে পৃথিবী গোলাকার। ফলে যে দিকে মুখ করে দাঁড়ালে কা'বা সবচেয়ে কাছাকাছি হয় সালাতে সেদিকে মুখ করে দাঁড়াতে হবে। যেমন যারা নিউইয়র্ক শহরে আছে তারা পূর্ব-দক্ষিণ দিকে মুখ করে দাঁড়ালে কা'বা সবচেয়ে বেশি কাছাকাছি হবে। কিন্তু আল আকসার অধিবাসীকে দাঁড়াতে হবে পশ্চিম মুখী হয়ে। বাংলাদেশীদেরও দাঁড়াতে হবে পশ্চিম মুখী হয়ে।

দিনে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করতে হয়। তন্মধ্যে শুক্রবার যোহরের সালাতের পরিবর্তে বৃহত্তর জুমআর সালাত আদায় করা হয়। তাছাড়া

আরো দুটি বাৎসরিক ব্যবস্থা আছে। একটি রমযান মাসে সিয়াম সাধনার পর ১লা শাওয়াল দিবসে, অপরটি মক্কা নগরীতে হজ্জ উদযাপনের সময়ে ১০ জিলহজ্জে। প্রথমটি ঈদুল ফিতরের সালাত দ্বিতীয়টি ঈদুল আযহার সালাত। এ দুই ঈদে খাদ্য-খাবারের আয়োজন করা হয়। সব সালাতের নিয়ম-রীতি ও ভঙ্গিমা একই ধরনের। পার্থক্য শুধুমাত্র রাকআতের ক্ষেত্রে। দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের মধ্যে প্রথমেই আসে ফজরের সালাত। ফজরে দু' রাকআত ফরয সালাত আদায় করতে হয়। চতুর্থ বা মাগরিব ওয়াক্তে পড়তে হয় তিন রাকআত ফরয, আর যোহর, আছর ও এশার সালাতে ৪ রাকআত করে ফরয আদায় করতে হয়। শুক্রবারে জুমআর সালাত এবং বাৎসরিক সালাতের প্রতিটিতে দু' রাকআত ফরয রয়েছে। কিন্তু বাৎসরিক সালাতে দুটি ওয়াজিব। নবী করীম (স) এর বাইরে এশার সালাতের পর আরো তিন রাকআত সালাত আদায় করার জন্য তাকীদ দিয়েছেন। এটাকে বলে বিতরের সালাত।

দিনে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করা ফরয। নবী করীম (স) প্রতি ওয়াক্তেই ফরযের অতিরিক্ত আরো কিছু সালাত নিয়মিতভাবে আদায় করতেন। ফরযের অতিরিক্ত এ সালাত সুন্নত হিসেবে পরিচিত। ফজরের ফরয দু' রাকআতের পূর্বে দু' রাকআত সুন্নত, দুপুরে যোহরের ফরয সালাতের পূর্বে চার রাকআত সুন্নত এবং পরে দু' রাকআত সুন্নত, সন্ধ্যায় মাগরিবের ফরয সালাতের পর দু' রাকআত সুন্নত, রাতে এশার ফরয সালাতের পর দু' রাকআত সুন্নত এবং তিন রাকআত বিতরের সালাত আদায় করার ব্যাপারে জোর তাকীদ রয়েছে। ফরয এবং সুন্নত সালাত আদায় করা ছাড়াও একজনে ইচ্ছা করলে আরো অনেক সালাত আদায় করতে পারে। কিন্তু সবটাকেই বলা হয় নফল ইবাদাত। সালাত ফরয, সুন্নত বা নফল যাই হোক না কেন, যত আদায় করা যাবে সওয়াবও হবে ততবেশি। তাছাড়া মসজিদে প্রবেশের পর দু' রাকআত সালাত আদায়ের জন্য মুসলমানদেরকে উৎসাহিত করা হয়েছে। এটাকে বলে 'তাহিয়্যাতুল মসিজদ'।

সালাত আদায়ের নিয়মটি এ রকম ঃ প্রথমে অযু করবে, সালাতের জন্য উপযুক্ত স্থান বেছে নিয়ে কিবলামুখী হবে, কান পর্যন্ত দু' হাত উঠিয়ে সালাতের নিয়ত করবে। নিয়তের বাংলা তরজমা এ রকম, আমি অমুক ওয়াক্তের অত রাকাআতের ফরয বা সুন্নত সালাত কিবলামুখী হয়ে একাকী অথবা সম্মিলিতভাবে ইমাম হিসেবে অথবা ইমামের পেছনে দাঁড়িয়ে আদায় করছি। নিয়ত বলার পর আল্লাহু আকবর বলে দুহাত বাঁধতে

হবে। বাম হাতের ওপর ডান হাত থাকবে। হানাফী, শাফেয়ী এবং হাম্বলী মাযহাবের অনুসারীরা এ নিয়ম অনুসরণ করে থাকেন। কিন্তু মালেকী ও শিয়া মাযহাব অনুসারে আল্লাহু আকবার বলার পর দুহাত দু পাশে লম্বালম্বি ঝুলিয়ে রাখতে হয়। তারপর শুরু হয় সালাতের মূল পর্ব। তখন আর কারো সাথে কথা বলা যাবে না। কোনো দিকে তাকানো যাবে না। দৃষ্টি থাকবে সিজদায় গেলে কপাল যেখানে ঠেকবে ঠিক সে স্থানে। উঠা বসা, সিজদা ও রুকূ'তে যাওয়ার সময় প্রতিবারেই তাকে আল্লাহু আকবার বলতে হবে।

'আল্লাহু আকবার' বলে হাত বাঁধার পরই সানা পাঠ করতে হয়। সানা এ রকম 'সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়াতাবারাকাছ্মুকা ওয়া তাআলা জাদ্দুকা ওয়া লাইলাহা গায়রুকা'। এরপর তাকে সূরা ফাতিহার সাথে মিলিয়ে কুরআন শরীফের একটি অংশ তিলাওয়াত করতে হয়। যোহর ও আছর ছাড়া অন্যান্য ওয়াক্তের ফরয সালাতের সময় কুরআনের অংশটুকু ইমাম সাহেব সরবে তেলাওয়াত করতে থাকেন। সালাতের অন্যান্য দোয়া-দরূদ নীরবে পাঠ করতে হয়।

সূরা কিরাত পাঠ করার পর হাঁটুতে হাত রেখে মস্তক অবনত করতে হয় অর্থাৎ রুকূ'তে যেতে হয়। রুকূ'তে তিনবার 'সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম' তাসবীহ পড়তে হয়। অতপর সোজা হয়ে দাঁড়াতে হয়। সোজা হয়ে দাঁড়ানোর সময় বলতে হয় 'সামিআল্লাহুলিমান হামিদাহ'। এ সময়ে দুহাতকে সোজাভাবে শরীরের দুপাশে ঝুলিয়ে রাখতে হয়। এর পরেই আসে সিজদা। সিজদায় কপাল, নাক ও হাতের তালুকে মাটিতে রাখতে হয়। মনে মনে তিনবার বলতে হয় 'সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা'। এরপর বিশিষ্ট ভঙ্গিমায় কিছু সময় বসে আবার সিজদায় যেতে হয় এবং তাসবীহ পাঠ করার পর আবার উঠে দাঁড়াতে হয়। একজন ব্যক্তির এ বিশিষ্ট ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে থাকা, ইহরাম বাঁধা, সূরা কিরআত পড়া, নত হওয়া, পর পর দুবার সিজদায় যাওয়া এসব কিছুর নাম হলো রাকাআত।

দ্বিতীয় রাকআতে প্রথম রাকআতের মত সূরা কিরাত পড়তে হয়, রুকূ' সিজদায় যেতে হয়, তাসবীহ বলতে হয়। শুধু পার্থক্য এই যে, দ্বিতীয় রাকআতে সে সিজদা থেকে উঠে দাঁড়ায় না। বরং নির্দিষ্ট ভঙ্গিমায় বসে আত্তাহিয়াতু পাঠ করতে হয়।

সালাত আদায়ের জন্য যদি কিবলা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া না যায়, তাহলে অনুমানে যে কোনো দিকে মুখ করে সালাত আদায় করা যাবে।

আর আল্লাহ্ তো সর্বত্রই বিরাজমান। তবে সালাত আদায় করতে হবে খুবই ধীরস্থিরভাবে ও মনোযোগ সহকারে। দাঁড়ান অবস্থায় দৃষ্টি থাকতে হবে সিজদার সময় যেখানে কপাল ঠেকবে ঠিক সে স্থানে, আর রুকূ'র সময় দৃষ্টি থাকবে দুপায়ের সম্মুখ ভাগে। ডান, বাম অথবা ওপরের দিকে তাকানো যাবে না। অনুরূপভাবে অহেতুকভাবে নড়াচড়া বা আগ পিছ করা যাবে না। সর্বক্ষণ স্থির থাকতে হবে, রুকূ'-সিজদায় যেতে হবে নির্ধারিত ভঙ্গিমায়।

দৈনন্দিন জীবনে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরযে আইন। পূর্ণ বয়স্ক প্রতিটি মানুষের জন্য এটা ফরয। আর জানাযার সালাত ফরযে কেফায়া। সমাজের কিছু সংখ্যক লোক এ সালাত আদায় করলে অন্যদেরটা আদায় হয়ে যায়। আর কেউ যদি এ সালাত না পড়ে তাহলে সমাজের সবাইকে গুনাহ্গার হতে হয়।

পাঁচ ওয়াক্ত সালাত অপেক্ষা জানাযার সালাত খানিকটা ভিন্নতর। জানাযার সালাতেও অযু করতে হয়, কিবলামুখী হতে হয়, নিয়ত করতে হয়, সূরা কিরআত (বা দোয়া দরূদ) পড়তে হয়। কিন্তু এখানে রুকূ'-সিজদায় যেতে হয় না বা তাশাহ্হুদের ভংগিমায় বসতে হয় না। সালাত আদায় করতে চার তাকবীরে প্রথমে আল্লাহু আকবর বলার পর সানা, সূরা ফাতিহা ও অন্য যে কোনো একটি সূরা তিলাওয়াত করতে হয়। দ্বিতীয় তাকবীরের পর নবী করীম (স)-এর ওপর দরূদ পাঠ ও সমস্ত মু'মিন মুসলমানদের জন্য মুনাজাত করা হয়। তৃতীয় তাকবীরের পর মৃত ব্যক্তির জন্য বিশেষ মুনাজাত করা হয়। চতুর্থ তাকবীরের পর সালাম ফিরিয়ে জানাযার সালাত শেষ করতে হয়।[১] কেউ অসুস্থ ও শয্যাশায়ী হয়ে পড়লে এবং দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতে সমর্থ না হলে সে তার সুবিধা অনুসারে বসে বা শুয়ে সালাত আদায় করবে। শুয়ে সালাত আদায় করার সময় সে নিয়ম মাফিক সূরা কিরআত ও দোয়া-দরূদ পাঠ করবে। আর কল্পনায় রুকূ'-সিজদায় যাবে। তাতেই তার সালাত আদায় হয়ে যাবে।

কেউ যখন সফরে থাকে তখন সে চার রাকআতের পরিবর্তে দুই রাকআত ফরয পড়ে থাকে। আবার বিশেষ পরিস্থিতিতে সময়ের স্বল্পতা বা প্রচণ্ড চাপের মুখে থাকলে দু ওয়াক্তের সালাতকে একত্রে আদায় করতে

---

১. হানাফী ফেকাহ অনুসারে জানাযা নামাযে সূরা ফাতেহা বা অন্য কোনো সূরা পড়তে হয় না বরং প্রথম তাকবীরের পর সানা, দ্বিতীয় তাকবীরের পর দরূদ, তৃতীয় তাকবীরের পর দোয়া মাসূরা পড়তে হয় এবং চতুর্থ তাকবীরের পর সালাম ফিরিয়ে জানাযার নামায শেষ করতে হয়।—অনুবাদক

পারে। যেমন দুপুর থেকে সূর্যাস্তের মধ্যে যে কোনো সময় যোহর ও আছর এবং রাতে মাগরিব ও এশার সালাত একত্রে আদায় করা যায়। এ রকম হজ্জের সময় আরাফাত ও মুজদালিফায় হয়ে থাকে।

ধর্মীয় বিষয়ে

বিভিন্ন মতের মুসলমানদের মধ্যে প্রধানত তিনটি সম্প্রদায় রয়েছে ঃ সুন্নী, শিয়া, খারিজী। প্রধান সম্প্রাদায়ের মধ্যে আবার কতকগুলো দল রয়েছে। যেমন সুন্নীদের মধ্যে রয়েছে ৪টি মাযহাব ঃ হানাফী, শাফেঈ, মালিকী ও হাম্বলী।

ক. নবী করীম (স)-এর বাণী এবং আচার-আচরণের নেতৃস্থানীয় ফকীহ মুজতাহীদ তাদের নিজেদের দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এবং আমল করেছেন। এখান থেকেই ফকীহদের মধ্যে মতপার্থক্যের সূত্রপাত ঘটে। ধর্ম বিশারদগণের অনুসারীদের নিয়ে গড়ে ওঠে একটি মাযহাব। বস্তুতপক্ষে কোনো সম্প্রদায়ই নতুন কোনো ধর্ম বিশ্বাস বা আচরণ পদ্ধতি উদ্ভাবন করেনি। সকল সম্প্রদায়ের ঈমান ও আমলের মূলে রয়েছে কুরআন ও হাদীস। বাংলাদেশের প্রায় সবাই হানাফী মাযহাব ভুক্ত। পৃথিবীতে এ মাযহাব ভুক্ত লোকের সংখ্যা সর্বাধিক।

খ. কখনো কখনো নবী করীম (স) নিজেই বিশেষ কোনো কাজ বা কাজের ধারাকে পাল্টে ফেলতেন। কখনো এ পরিবর্তন সম্পর্কে প্রকাশ্যে ঘোষণা দিতেন। যেমন—গোড়ার দিকে সালাতে রুকূ' করার সময় তিনি দুটি হাত নীচের দিকে সোজা ঝুলিয়ে রাখতেন। কিন্তু পরবর্তীতে হাত দুটি হাঁটুর ওপর রাখতে শুরু করেন। এবং হাত ঝুলিয়ে রাখার বিধান বাতিল বলে ঘোষণা দেন। কখনো আবার এ পরিবর্তন সম্পর্কে নিশ্চুপ থাকতেন। হয়ত কয়েক পুরুষ পর নবী করীম (স)-এর কিছু সুন্নতের ব্যাপারে আলোচনার সূত্রপাত ঘটে। এখান থেকেই ধর্ম বিশারদগণের মধ্যে দেখা দেয় মতপার্থক্য। সৃষ্টি হয় বিভিন্ন দল উপদলের।

এটা স্পষ্ট যে, সুন্নতের বিভিন্নতার সূত্র ধরেই ফকীহগণের মতপার্থক্যের সৃষ্টি হয়েছে। আর সে কারণেই কোনো সম্প্রদায়ের জন্য অন্য সম্প্রদায়ের মতবাদকে উপেক্ষা করার অধিকার নেই।

এখানে বলে রাখা আবশ্যক যে, কোনো একটি কাজ নবী করীম (স) বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে সম্পন্ন করলেও কখন কিভাবে পরিবর্তন করেছেন, তার ধারাবাহিক কোনো বিবরণ নেই। যদি থাকত তাহলে

স্বাভাবিক নিয়মেই পরের নিয়ম দিয়ে পূর্বের নিয়ম বাতিল হয়ে যেত। ফলে নবী করীম (স) একবার যে নিয়মটি পালন করেছেন, যেটার ব্যাপারে তিনি কখনো নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেননি, তার সবটা মিলেই গড়ে উঠেছে উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য নিয়ম-কানুন।

নবী করীম (স)-এর যতগুলো উপাধি আছে তার মধ্যে একটি হল হাবীবুল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহর বন্ধু। কুরআন মজীদে আরো স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে ঃ

فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ـ

"রাসূলুল্লাহের মধ্যে রয়েছে অনুকরণীয় সর্বোত্তম আদর্শ।"

–সূরা আল আহযাব ঃ ২১

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা যেতে পারে, আল্লাহ তা'আলা আশা করেন যে, মুসলমানরা প্রিয় নবী (স)-এর সমস্ত আচার-আচরণের ওপর আমল করবে। এমনকি তিনি অনিয়মিতভাবে যে কাজ করেছেন অর্থাৎ শুরুতে যা করেছেন কিন্তু পরে করেননি, অথবা শুরুতে করেননি, কিন্তু পরে করেছেন তার কোনোটাই বাদ যাবে না। এভাবেই মুসলমানগণ একই কাজ বিভিন্ন ভাবে সম্পন্ন করবে, কিন্তু তাদের কোনোটাই সুন্নতের বাইরে যাবে না। আল্লাহ তাআলা যেন বিভিন্ন সম্প্রদায় বা মাযহাব সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে নবী করীম (স)-এর সমস্ত কাজগুলোকে একটি স্থায়ী রূপ দিয়েছেন। আর সে কারণেই সমস্ত মাযহাবের মধ্যে পারস্পরিক সম্মান ও শ্রদ্ধা থাকতে হবে। কেউ কারো প্রতি অসহিষ্ণু হতে পারে না।

সালাতের আরবীয় ব্যবহার

১. এটা জানা কথা যে, মুসলমানগণ আরবী ভাষায় সালাত আদায় করে থাকে। তাদের দোয়া-দরূদ পাঠ, কুরআন তিলাওয়াত, তাসবীহ-তাহলীল সবকিছুর ভাষা রীতি আরবী। আরব-অনারব এমনকি যে সমস্ত এলাকার মুসলমানরা আরবী জানে না বা বোঝে না, তাদেরও সালাতের ভাষা আরবী। নবী করীম (স)-এর আমলে এ নিয়মটি চালু ছিল। চৌদ্দ শ বছর পর এখনও এ নিয়ম অব্যাহত রয়েছে। কিয়ামত পর্যন্ত চালু থাকবে। জান্নাতের ভাষাও হবে আরবী। সে কোন্ এলাকার মুসলমান, তার ভাষা কি সেটা এখানে বিবেচ্য বিষয় নয়।

২. আপাত দৃষ্টিতে এটাকে খুবই স্বাভাবিক ও যুক্তিসঙ্গত মনে হবে যে, একজন লোক যে ভাষা বুঝে, সে ভাষাতেই আল্লাহ তাআলার দরবারে

আবেদন নিবেদন জানাবেন। আর এটা জানা কথা যে, মাতৃভাষা হল ইবাদাত বন্দেগী করার ও তাসবীহ্র উত্তম মাধ্যম। সুতরাং এটা খুবই স্বাভাবিক ছিল যে, একজন মুসলমান যে ভাষায় কথা বলে সেটাই হবে তার সালাতের ভাষা। কিন্তু বাস্তবতার নিরিখে সাধারণ বিচার বুদ্ধি দিয়ে বিবেচনা করলে এ ধরনের যুক্তির অসারতা স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

৩. প্রথমেই আসে মনস্তাত্ত্বিক বিষয়। কুরআনুল করীমের বর্ণনা অনুসারে নবী করীম (স)-এর পবিত্র স্ত্রীগণকে বলা হয় উম্মুল মু'মিনীন। অর্থাৎ মু'মিনদের মাতা। তাঁদের সবারই মুখের ভাষা ছিল আরবী। সে বিবেচনায় সকল মুসলমানদের মাতৃভাষাও আরবী। সুতরাং মাতৃভাষায় দোয়া-দরূদ তাসবীহ-তাহলীল পাঠ করতে আপত্তি উঠবে কেন ?

৪. কারো কারো জন্য এ যুক্তি পর্যাপ্ত নাও হতে পারে। তাদের জন্য আবশ্যক যে, ইসলামী আকীদা অনুসারে কুরআন হল আল্লাহ্র কালাম। কুরআন তিলাওয়াতের ফযীলত অনেক বেশি। কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে একজন মুসলমান মূলত আল্লাহ্র সান্নিধ্যে পৌঁছে এবং এটাই একজন মানুষের জীবনের পরম লক্ষ। এটা যেন আল্লাহ্র দরবারে পৌঁছার একটি পথ। নফল ইবাদাতের মধ্যে সর্বোত্তম ইবাদাত হচ্ছে কুরআন তিলাওয়াত করা। বৈদ্যুতিক তারের মধ্যে দিয়ে বাল্বে যেভাবে আলো সঞ্চারিত হয় এও যেন ঠিক তাই।

৫. যারা অধিকতর বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চলেন তাদের জন্য বলা আবশ্যক যে, দোয়া হল আল্লাহ্ তাআলার দরবারে আবেদন নিবেদন করার একটা মাধ্যম। এটা একজনের একান্ত নিজস্ব ও ব্যক্তিগত ব্যাপার। যে কোনো ভাষায় বা ভঙ্গিমায় আল্লাহ্র কাছে নিবেদন করা যায়। এমন কি দোয়া বা মুনাজাতে ব্যক্তি যা ইচ্ছা তাই চাইতে পারে। এ ব্যাপারে তার পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে। এখানে বান্দা এককভাবে স্রষ্টার সাথে সংযোগ স্থাপন করে।

আর সালাতের বিষয়টি এর ঠিক উল্টো। এখানে আল্লাহ্ তাআলার হক আদায় করার ব্যাপারটা মুখ্য। এটা আদায় করতে হয় সম্মিলিতভাবে, জামাআত সহকারে। ফলে সালাতে কেউ নিজস্ব পসন্দ অনুসারে চলতে পারে না।

সালাতের নিজস্ব একটি ভঙ্গিমা ও পদ্ধতি রয়েছে। রয়েছে আরকান-আহকাম। জামাআতে ফরয আদায় করা একাকী সালাত আদায় করার চেয়ে অধিক সওয়াবের।

৬. যদি ইসলাম বিশেষ কোনো অঞ্চল, গোত্র বা জাতির জন্য নির্ধারিত হতো, তাহলে মুসলমানরা অবশ্যই আঞ্চলিক, জাতীয় বা গোত্রীয় ভাষায় ধর্ম চর্চা করতে পারত। কিন্তু ইসলাম একটি সার্বজনীন ও চিরন্তন ধর্ম। ইসলামের আবদেন বিশেষ কোনো অঞ্চল, গোত্র বা কালের বন্ধনে আবদ্ধ নয়। বরং মুসলমানরা অসংখ্য ভাষায় কথা বলে। তারা বসবাস করে বিভিন্ন গোত্র ও অঞ্চলে। বর্তমান সময়ে আমাদের জীবন অধিকতর বিশ্বজনীনতা লাভ করেছে। বর্তমান বিশ্বের প্রায় সবগুলো শহরেই মুসলমানদের সাক্ষাত মেলে। তারা সে সমস্ত শহরের স্থায়ী অধিবাসী অথবা সফরকারী যেভাবেই থাক না কেন, তাদের সুবিধা অসুবিধার প্রতি অবশ্যই দৃষ্টি দিতে হবে। ধরে নেই যে, একজন ইংরেজ চীন দেশ সফরে গেলো। চীনা ভাষায় একটি অক্ষরও সে বুঝে না। পথ চলতে হঠাৎ করেই সে শুনতে পেল 'চেন চু চিহ শান'—স্বাভাবিকভাবেই সে এর অর্থ বুঝবে না। এর কারণও জানতে পারবে না। আর এটা যদি "আল্লাহু আকবর" শব্দের আঞ্চলিক পরিভাষা হয় তাহলে হয়ত সে শুক্রবারের জুমআর নামায থেকে বঞ্চিত হবে। অথবা বঞ্চিত হবে অন্য কোনো ওয়াক্তের সালাত থেকে।

প্রসংগক্রমে বলে রাখা আবশ্যক যে, চীন দেশের মসজিদগুলো ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স বা প্রাচ্যের মসজিদগুলোর মত নয়, এমন কি এখানকার মসজিদগুলোর কোনো মীনার নেই। ফলে মসজিদ দেখেও সালাতে হাজির হওয়া সম্ভব নয়। অনুরূপভাবে একজন চীনদেশীয় মুসলমান যদি অন্য কোনো দেশে যায় এবং সে দেশের মুসলমানরা যদি আঞ্চলিক ভাষায় ইবাদাত বন্দেগী করে, তাহলে সেও জামাআত থেকে বঞ্চিত হবে। নিজে মুসলমান হয়েও সেখানকার মুসলমানদের সাথে কোনো মিল খুঁজে পাবে না। আর সে কারণেই যে ধর্ম চিরন্তন, যার আবেদন স্থান, কালভেদে সমগ্র বিশ্ব জুড়ে, তার এমন কতকগুলো সাধারণ বৈশিষ্ট্য থাকবে যা সকল অনুসারীদের মধ্যে স্পষ্টভাবে বিরাজমান। বস্তুত সালাতের জন্য অভিন্ন আযান ধ্বনি এবং সালাতের নিয়ম-কানুনগুলো এমনি বৈশিষ্ট্য।

প্রসংগক্রমে বলা যেতে পারে যে, কখনো কখনো দুটি ভাষার মধ্যে এমন কিছু শব্দ থাকে যেগুলোর শ্রবণের দিক থেকে একই ধরনের। কিন্তু তাদের অন্তর্নিহিত অর্থ সম্পূর্ণরূপে পরস্পর বিরোধী। কখনো কখনো আবার একটি ভাষার একটি সাধারণ শব্দ অন্য ভাষায় খুবই জঘন্য অর্থে ব্যবহৃত হয়। যে ভাষার সাথে আমাদের পরিচিতি যত কম, সে ভাষার ক্ষেত্রে এমনটি হওয়ার সম্ভাবনা তত বেশী। আর আল্লাহ তা'আলার

ইবাদাত-বন্দেগীর ক্ষেত্রে যদি এমন কিছু শব্দ চলে আসে তাহলে সেটা হবে খুবই দুঃখজনক এবং আদবের মস্তবড় খিলাপ। কিন্তু কেউ যদি বাল্য বয়স থেকেই একটি ভাষার সাথে পরিচিত হয়ে ওঠে, তাহলে আনায়াসেই এ জাতীয় অনাকাঙ্খিত পরিস্থিতিকে পরিহার করা যায়। সে ক্ষেত্রে একজন অনারবও যদি আরবী ভাষায় দোয়া-দরূদ, তাসবীহ-তাহলীল পাঠ করে তাতেও কোনো সমস্যা হতে পারে না।

৭. কখনো কখনো এমনসব পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে, যখন একজন ব্যক্তি কোনো ভাষার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠবে। তখন ইংরেজ হয়ত ফরাসী, রাশিয়ান বা অন্য কোনো ভাষায় সালাত আদায় করতে অস্বীকার করবে। রাজনৈতিক এমনকি ব্যক্তিগত কারণেও কারো মধ্যে এ রকম অনাগ্রহ জন্মাতে পারে। কিন্তু আরবী কুরআন-হাদীসের ভাষা। ফলে যে কোনো মুসলমানেরই এ ভাষার প্রতি রয়েছে আন্তরিক শ্রদ্ধা ও একটি স্বভাবজাত আকর্ষণ। এমতাবস্থায় আরবী ভাষাভাষী কারো প্রতি অনাগ্রহ সৃষ্টি হলেও কুরআনের ভাষার প্রতি সবাই থাকে আন্তরিক।

বস্তুতপক্ষে আরব জাতির ভাষা হিসেবে আরবীয় কোনো গুরুত্ব নেই। বরং গুরুত্ব এ কারণে যে, নবী করীম (স)-এ ভাষায় কথা বলতেন। উম্মুল মু'মিনের মুখের ভাষা আরবী। সর্বোপরি আল্লাহ তাআলা তাঁর পবিত্র কালামকে মানুষের নিকট পৌঁছে দেয়ার মাধ্যম হিসেবে আরবী ভাষাকে নির্বাচন করেছেন।

৮. সমধর্মাবলম্বীদের মধ্যকার ঐক্যের গুরত্ব অপরিসীম। তাদের মধ্যে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতিকে জোরদার করার জন্য নতুন নতুন পন্থা ও পদ্ধতি উদ্ভাবন করা আবশ্যক। সেক্ষেত্রে ঐক্য বজায় রাখার জন্য বর্তমান যে ব্যবস্থা বা উপকরণ চালু রয়েছে তাকে উপেক্ষা করার প্রশ্নটি একান্তই অযৌক্তিক।

৯. ব্যবহারিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলেও ইবাদাত বন্দেগীতে একটি সাধারণ ভাষা ব্যবহারে কোনো অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। উদাহরণ হিসেবে আন্তর্জাতিক সভা সম্মেলনের কথা বলা যেতে পারে। জাতিসংঘে দাঁড়িয়ে কেউ তার খেয়ালখুশী ও ইচ্ছামত যে কোনো বক্তব্য রাখতে পারে না। যদি কেউ এমনটি করেও থাকে, তাহলে তার বক্তব্য দুর্বোধ্য হয়ে উঠবে। সভার মূল উদ্দেশ্যই তাতে পণ্ড হয়ে যাবে। আর সে কারণেই তার বক্তব্যকে অবশ্যই সম্মেলন কর্তৃক স্বীকৃত কোনো ভাষায় অনুবাদ করার সুযোগ দিতে হয়। এ ব্যাপারে কেউ কোনো রকম আপত্তি

তুলতে পারে না। অর্থাৎ তার মাতৃভাষা যাই থাক না কেন, তাকে সর্বজন গ্রহণযোগ্য বিশেষ কোনো ভাষার ওপর নির্ভর করতে হয়।

আরো বলা যেতে পারে কোনো অনুবাদই কখনো মূল রচনার সমতুল্য হতে পারে না। তাই দেখা যায় যে, ইতিমধ্যে কুরআনুল করীমের বেশ কিছু ইংরেজী তরজমা প্রকাশিত হলেও এখনো অনেকে নতুনভাবে তরজমা করার উদ্যোগ নিচ্ছেন। নতুনভাবে তরজমা করার উদ্যোগ নেয়ার সময় সবাই বলেন—অতীতের তরজমাগুলোর চেয়ে বর্তমান তরজমাটি ভালো, আরো সাবলীল। অনুবাদের জন্য নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করতে হচ্ছে এ উদ্যোগ কিয়ামাত পর্যন্ত থাকবে। শুধুমাত্র কুরআনুল করীমের ইংরেজী তরজমার ক্ষেত্রে নয়, যে কোনো গ্রন্থের যে কোনো ভাষার তরজমার ক্ষেত্রেই একথা সত্য। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে মূল ভাষা আরবীকে বাদ দিয়ে ত্রুটিপূর্ণ তরজমা দিয়ে সালাত আদায় করা কি ঠিক হবে ?

প্রশ্ন উঠতে পারে যে, অন্যান্য ধর্মে বিভিন্ন ভাষায় ইবাদাত বন্দেগীর সুযোগ থাকলে ইসলাম ধর্মে থাকবে না কেন ? এ প্রসংগে স্মরণ রাখতে হবে যে, দুনিয়ার কোনো ধর্মগ্রন্থই এখন আর মূল ভাষায় অর্থাৎ যে ভাষায় ধর্মগ্রন্থ নাযিল হয়েছিলো সে ভাষায় পাওয়া যায় না। আবার কিছু গ্রন্থ আছে যার অনুবাদ মূলের সাথে সম্পর্কযুক্ত তো নয়ই অধিকাংশ ক্ষেত্রে মস্তিষ্কজাত চিন্তা থেকে সংযোজিত। এগুলো হয় অনূদিত অবস্থায় অথবা মূল গ্রন্থের অংশ বিশেষরূপে আমাদের হাতে পৌছেছে। ইহুদী, খৃস্টান এবং অন্য যে কোনো ধর্মের জন্য একথা সত্য। এর ব্যতিক্রম ঘটেছে একমাত্র কুরআনুল করীমের ক্ষেত্রে। কুরআনুল করীম যে ভাষায় এবং যতটুকু অবতীর্ণ হয়েছিল, এখনো তা মূল ভাষায় এবং অপরিবর্তিত রয়েছে।

সমাপ্ত

আমাদের প্রকাশিত কিছু বই

- **তাফহীমুল কুরআন (১-১৯ খণ্ড)**
  –সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদূদী (র)
- **তাদাব্বুরে কুরআন (১-৯ খণ্ড)**
  –মাওলানা আমীন আহসান ইসলাহী
- **শব্দে শব্দে আল কুরআন (১-১৪ খণ্ড)**
  –মাওলানা মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান
- **শব্দার্থে আল কুরআনুল মজীদ (১-১০ খণ্ড)**
  –মতিউর রহমান খান
- **সহীহ আল বুখারী (১-৬ খণ্ড)**
  –ইমাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী (র)
- **সুনান ইবনে মাজা (১-৪ খণ্ড)**
  –আবু আবদুল্লাহ ইবনে মাজা (র)
- **শারহু-মাআনিল আছার (তাহাবী শরীফ) (১-২ খণ্ড)**
  –ইমাম আবু জাফর আহমদ আত তাহাবী (র)
- **সীরাতে সরওয়ারে আলম (১-২ খণ্ড)**
  –সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদূদী (র)
- **আল কুরআনের শিক্ষা (১-২ খণ্ড)**
  –আল্লামা ইউসুফ ইসলাহী
- **মহিলা ফিক্হ (১-২ খণ্ড)**
  –আল্লামা মুহাম্মদ আতাইয়া খামীস
- **ফিক্হী বিশ্বকোষ (১-৮ খণ্ড)**
  –ড: মুহাম্মদ রাওয়াস কালা'জী
- **বিশ্ব নবীর সাহাবী (১-৬ খণ্ড)**
  –তালিবুল হাশেমী
- **মহানবীর সীরাত কোষ**
  –খান মোসলেহউদ্দীন আহমদ